প্রকাশক :
বি. চট্টোপাধ্যায়
চ্যাটার্জি পাবলিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মূল্য : এগার টাকা মাত্র

লেখকের অন্যান্য পুস্তক :
ত্রিবার্ষিক শ্রেণীর উপযুক্ত

1. ধনবিজ্ঞান (First Paper)
2. অর্থতত্ত্ব (Second Paper)
3. ভারতের অর্থনীতি (Third Paper)
4. Theory of International Trade & Finance
5. Aspects of Indian Economic History, 1750—1950

মুদ্রাকর :
এম. চক্রবর্তী
চ্যাটার্জি প্রিণ্টার্স
২৬, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

ভূমিকা

ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বাংলাভাষায় লেখা ভাল বই-এর অভাব সকলেই অনুভব করেন। শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য কয়েক বৎসর ধরিয়া এই শাস্ত্র অধ্যাপনার কার্যে ব্যাপৃত আছেন এবং প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বই-এর অভাব বিশেষভাবে বোধ করিয়াছেন বলিয়াই এই দুরূহ কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার লেখা বই-এর পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে যে. তাঁহার এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে সফল হইয়াছে। ধনবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বসমূহ ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি তিনি বেশ সহজ ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বিষয়ের ভিত্তিতে এই পুস্তক লেখা হইয়াছে তাহা নহে, উহার পরবর্তী উন্নত ধরনের বহু আলোচনার আভাসও এই বইটিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সর্বরকমে সফল হউক, ইহাই কামনা করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, এম্. এ.,
পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)
উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

প্রধানত তিনটি বিষয় সম্মুখে রাখিয়া এই সংস্করণে বিভিন্ন পরিবর্তন করা হইয়াছে। প্রথমত, আজকাল অনেক ছাত্রই বি. কম্ স্তরে বাণিজ্যে অনার্স পড়িতেছে। তাহাদের অন্যান্য বিষয়ের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই পুস্তকটির মান পূর্বাপেক্ষা আর একটু উন্নত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বিশেষভাবে বাণিজ্য ধারার ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কয়েকটি নূতন বিষয় ইহাতে সংযোজন করিতে হইয়াছে। তৃতীয়ত, বি. কম্ স্তরের পরে ছাত্ররা সি. এ., ইনস্টিটিউট অব্ ব্যাঙ্কারস্, এবং নানা সিভিল সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস পরীক্ষা দেয়। সেই সকল পরীক্ষার স্তরে তাহাদের জ্ঞানকে পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্বও এই পুস্তকটিকে বহন করিতে হইবে। আজকাল এম্. কম্. পরীক্ষায় যে স্তরে অর্থনীতি পঠন-পাঠন চলিতেছে, উহার উপযুক্ত করিয়া ছাত্রদের প্রস্তুতির জন্যও বইখানা উন্নত করা প্রয়োজন ছিল। এই সকল কারণে পুস্তকখানার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে, নূতন বিষয়বস্তু সংযোজিত হইয়াছে।

আশা করা যায়, পুস্তকখানার উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

ভবদীয়

হরশঙ্কর ভট্টাচার্য

মুখবন্ধ

বিদেশী পরিবেশ হইতে উদ্ভূত এবং বিদেশী ভাষায় পরিবেশিত তত্ত্বসমূহ সহজ ও সরল বংলায় লেখা অসম্ভব নহে বরং অনেকক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার তুলনায় বাংলাতে প্রকাশ করা অধিকতর সুবিধাজনক, আশা করি, উহার পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তকের দ্বারা উপকৃত হইবেন এবং যে-বিজ্ঞানকে দুরূহ বলিয়া ভয় করেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহাদেব পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্য-তালিকার উপর নির্ভর করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ব্যাপারে ইহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

বহুক্ষেত্রে আমাকে পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে এবং সে ক্ষেত্রে শব্দার্থ ও ভাবার্থ উভয়েরই সঙ্গতি রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই ব্যাপারে সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি, তাঁহাকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রত্যেক বিজ্ঞানের শব্দ-প্রয়োগ ও ভাব-প্রকাশে বিশেষ ভঙ্গী ও ধরন আছে; ইংরাজীতে বহু আলোচনার ফলে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বালোচনার একটি বিশেষ ভঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছে; ভাব-প্রকাশের এই বিশেষ ভঙ্গী এই বিজ্ঞানেরই নিজস্ব। সেই ভঙ্গী ও ধরন বাংলা ভাষায় প্রবর্তিত করা কখনই অনুবাদের দ্বারা সম্ভব নয়। এই পুস্তক এবং ইহার পরবর্তী আরও অনেক পুস্তক প্রকাশের ফলে বাংলা ভাষার এই ভঙ্গী ও ধরন গড়িয়া উঠিবে। অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বিচার করিবেন, এই ব্যাপারে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি।

এই পুস্তক রচনায় বিদেশী ও দেশী খ্যাতনামা অনেক লেখকেরই সাহায্য পাইয়াছি, পৃথক করিয়া তাঁহাদের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। লেখার সকল-স্তরে উৎসাহ, উপদেশ এবং নির্দেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, এম্, এ. পি-এইচ, ডি, (লণ্ডন); তাঁহার নিকট আমি অশেষভাবে ঋণী। আমার নিজের শিক্ষাকেন্দ্র আশুতোষ কলেজের শিক্ষকবৃন্দকে এবং অন্যতম শিক্ষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী মহাশয়কে এই সুযোগে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাকে পুস্তক লিখিবার কথা যাঁহারা প্রথমে বলিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের সহানুভূতি সর্বদাই আমাকে উৎসাহ দিয়াছে, বর্ধমান রাজ কলেজের শ্রীজগবন্ধু রায় এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরীকে আমার সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বর্ধমান রাজ কলেজ

হরশঙ্কর ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

DUE

নিরপেক্ষভাবে তথ্য বাছাই করিয়া বিষয়গুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করাই ধনবিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু অন্য অনেক ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় সম্ভব হইলেও সমাজ-বিজ্ঞানে ইহা প্রয়োগ করা চলে না।

শুধু আলোক-দায়ী নহে, ফলদায়ীও বটে

ব্যক্তি ও তাহার কাজকর্ম লইয়া যে-বিজ্ঞানের আলোচনা, মানুষ সম্পর্কে দায়িত্বহীন ও উদ্দেশ্যহীন পর্যালোচনা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন দারিদ্র্য ঘটে শুধু তাহা বলিলেই চলিবে না, উহা দূর করার উপায় কি, এবং দূর করিলে মানুষের কি উপকার হইবে একথাও বলিতে হইবে। ধনবিজ্ঞান শুধু আলোক-দায়ী নহে, ফলদায়ীও বটে। মানুষের কার্যাবলীর গতি-প্রকৃতির নিয়মগুলি বাহির করিয়া সেই নিয়মগুলিকে মানুষের কল্যাণে কি ভাবে ব্যবহার করা যায় তাহার কথা ধনবিজ্ঞান চিন্তা করিবে, ইহাকে কল্যাণধর্মী ধনবিজ্ঞান (Welfare Economics) হইতে হইবে। ইহা যেরূপ শুদ্ধ বিজ্ঞান, সেরূপ ফলিত বিজ্ঞানও বটে।

ইহাকে বিজ্ঞান বলা চলে কি? (Is Economics a Science?)

কোন বিষয় সম্বন্ধে কেবল কিছু তথ্য সংগৃহীত হইলেই তাহাকে বিজ্ঞান বলা চলে না। কিন্তু যদি সেই তথ্য হইতে বাছাই করিয়া, শ্রেণীবিভাগ করিয়া উহাদের একের সহিত অপরের কার্যকারণ-সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া নিয়মের আকারের সাধারণ সূত্রাবলী গঠন করিয়া তাহাদের প্রকাশ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমরা তাহাকে বিজ্ঞান বলিতে পারি।

বিজ্ঞান কাহাকে বলে

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল দুষ্প্রাপ্য উপকরণের সাহায্যে অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে মানুষের বিভিন্ন প্রকার অর্থ নৈতিক কাজকর্ম। বহু পর্যবেক্ষণের পর ইহাদের সম্পর্কে বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়া ধনবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন নিয়মও গঠন করিয়াছেন। সেই নিয়মের প্রয়োগ বহুক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছে। বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া গৃহীত নিয়মগুলির ভিত্তিতে, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর রূপ নিরূপণ সম্ভব হইয়াছে। এমতাবস্থায় ইহা যে বিজ্ঞান নহে একথা বলা চলে না।

কেন ইহা বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত

অবশ্য ইহা ঠিকই ধনবিজ্ঞানের নিয়মগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলির

মত নিখুঁত নয়। কারণ মানুষের কাজকর্ম যাহার বিষয়বস্তু, মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীন সত্তাকে সেই বিজ্ঞান অস্বীকার করিতে পারে না। ধনবিজ্ঞানী মানুষের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, সে ইচ্ছা অসংখ্য কার্যকারণের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিফলন। নিষ্প্রাণ পদার্থ হইলে তাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী অনেকখানি সঠিক হয়, কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে তাহার কাজকর্মসংক্রান্ত নিয়মাবলীর মধ্যে ব্যতিক্রম বেশি পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু তবুও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী ও বিশেষ পরিবেশে মানুষ ঠিক কি ধরনের কার্য করে বা আচরণ করে, উহার সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে সঠিক নিয়ম গঠন করা চলে।

অপরাপর বিজ্ঞানের সহিত ইহার পার্থক্য

অনেকে বলেন যে, ধনবিজ্ঞান কখনই বিজ্ঞান নহে, কারণ ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য খুব বেশি। উটন (Barbara Wooton) ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন যে, ছয়জন বিজ্ঞানী একসঙ্গে থাকিলে সাতটি মত দেখা দেয়। ধনবিজ্ঞানীদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, কোনমতে ইহাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উঠাইতে তাঁহারা বড়ই উৎসুক।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, সকল বিজ্ঞানেই সকল বিষয় লইয়া মতবিরোধের সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি এখনও হয় নাই এবং তবুও তাহাদের বিজ্ঞান বলিতে কোন বাধা হয় না। আর ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য সাধারণত বিজ্ঞানের মৌলিক নিয়ম সংক্রান্ত নহে, বাস্তব জগতের সমস্যা মিটাইবার পথ নির্ণয়ের ব্যাপারে। কোন্ বিজ্ঞানী কোন্ উপায় গ্রহণের সুপারিশ করিবেন, তাহা তাঁহার নৈতিক রাজনৈতিক, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর অনেকাংশ নির্ভরশীল। ইহাও মনে রাখা দরকার যে মতপার্থক্য থাকিলেই তাহাকে বিজ্ঞান বলা চলে না ইহা ঠিক নহে; কারণ মতপার্থক্যের মধ্য দিয়াই সত্যানুসন্ধান চলে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়।

মতপার্থক্য থাকিলেও তাহা বিজ্ঞান

ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ : ইহাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and characteristics of the Laws of Economic Science)

কোন বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে, কোন একটির প্রভাবের ফলে অপর কোনটি

ঘটিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের বিবরণকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বলা হয়। প্রথমে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাহার পরে সেই সকল তথ্যাদির বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করা হয়। কেন একটি ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিরূপে ঘটে, প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন নিয়ম গঠন করা হয় এবং সেই সকল নিয়মের গতি-প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়। যেমন মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, মেঘ ও বৃষ্টির এই কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি নিয়ম (Law)।

নিয়ম কাহাকে বলে ?

মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিভিন্ন কারণ কি, আবার এই কাজকর্মগুলিই বা কোন্ ঘটনার কারণ, এই সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞানীরা বহু নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং এই সকল নিয়ম ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহাদের প্রয়োগ লইয়া ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। একটি নির্দিষ্ট অবস্থার তাগিদে মানুষ কি ভাবে কাজ করিবে, কিরূপ আচরণ করিবে; এই অবস্থায় কোন পরিবর্তনে তাহার কার্য কিরূপভাবে পরিবর্তিত হইবে ইহাই এই সকল নিয়মের উপজীব্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম লইয়া গঠিত।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলির সহিত ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের এক ক্ষেত্রে মিল আছে: এই সকল নিয়মের কোনটিই মানুষের অধীন নহে। মানুষ চাহিতে পারে বা না চাহিতে পারে পছন্দ বা অপছন্দ করিতে পারে, কিন্তু এই সকল নিয়মের কার্য-কারিতা সর্বদা চলিতে থাকে। কোন দ্রব্য উপরে ছুঁড়িয়া দিলে আবার নিচে পড়িবে, ইহা যেমন মানুষের বিনা-ইচ্ছাতেই ঘটিয়া থাকে, তেমনি কোন একটি নির্দিষ্ট জমিখণ্ডে বারবার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে উহা হইতে প্রতিদান ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়িতে থাকে, ইহাও মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। মানুষ এই নিয়ম সৃষ্টি করে না, সে ইহা বদলাইতে পারে না, যদিও মানুষ এই নিয়মেরই প্রভাবাধীন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলির মধ্যে সাদৃশ্য

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ধনবিজ্ঞানের ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলির মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও দেখা যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মসমূহ যতটা নিখুঁত-

ভাবে কার্যকরী হয়, ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের কার্যকারিতা ততটা নিখুঁত নহে। যেমন মনে করা যাউক, চাহিদার নিয়ম। দাম কমিয়া গেলে সেই দ্রব্যের জন্য ব্যক্তির চাহিদা বাড়ে, ইহা নিয়ম হইলেও কোন ব্যক্তি দামের দ্রব্য ক্রয় করা অসম্মানজনক মনে করিলে দাম কমা সত্ত্বেও উহার ক্রয় কমাইয়া দিতে পারে। সুতরাং ধনবিজ্ঞানের সকল নিয়ম একেবারে সর্বদাই নিখুঁত, এমন বলা চলে না। মানুষের ইচ্ছা ও কাজকর্ম লইয়া গঠিত নিয়মাবলীর এই ত্রুটি থাকিবেই, কারণ মানুষের ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন, তাহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ন্যায় ইচ্ছাশক্তিহীন বা বুদ্ধি বিবেচনাহীন জড় বস্তু নহে।

ধনবিজ্ঞানের নিয়ম সম্পূর্ণ সঠিক না-ও হইতে পারে; ইহা প্রধানত ঘটনার ঝোঁক প্রকাশ করে

ধনবিজ্ঞানের ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মসমূহের মধ্যে আরও পার্থক্য আছে। সকল বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি নিয়মই একটি নির্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোর মধ্যে (given set of ciacumstances) কার্যকরী হয়। বাহিরের কোন শক্তি ওই সময় সেই অবস্থাকে বদল করিতেছে না ইহা ধরিয়া লইতে হয়, নতুবা ঠিক কোন্ কারণের ফলে কার্যটি ঘটিতেছে তাহা পৃথক করিয়া আলোচনা করা সম্ভব নহে। যে সকল বিষয় সাময়িকভাবে স্থির আছে ধরিয়া লইয়া নিয়মটির ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাদিগকে স্বীকার্য বিষয় (assumptions) বলে। তাই ধনবিজ্ঞানের সকল নিয়মেই "অন্যান্য সকল কিছু সমান থাকিলে" নিয়মটি কার্যকরী হইবে ইহা বলা হয়। অবশ্য সকল বিজ্ঞানের নিয়মগুলিই কম বা বেশি পরিমাণে 'স্বীকার্য বিষয়' ধরিয়া লয়। যেমন, একটি দ্রব্য উপরে ছুঁড়িয়া দিলে নিচে নামিয়া আসিবে—এই নিয়মটি বর্ণনার সময় ধরিয়া লওয়া হয় ওই দ্রব্যটি বাতাস হইতে ভারী (তাহা না হইলে উহা বেলুনের মত উপরে উঠিয়া যাইবে)। তবে অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহে এইরূপ 'স্বীকার্য বিষয়'-এর পরিমাণ বেশি।

স্বীকার্য বিষয়কে অধিক পরিমাণে লইতে হয়

ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ

* বস্তুবিশ্বের তুলনায় অগণিত জীবিত মানুষের কাজকর্ম লইয়া গঠিত অর্থ নৈতিক জগৎ অধিক পরিমাণে পরিবর্তনশীল।

† বলা চলে যে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়সংক্রান্ত নূতন নিয়মের পরিবর্তনের দরুনই সমাজ-দেহে রূপান্তর আসে, সমাজের প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর রূপ পরিবর্তিত হয়। অনেকে বলেন যে,

সমাজদেহের (Social Fabric) সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজ-দেহে পরিবর্তন হইলে পুরানো নিয়মসমূহের বদলে নূতন নিয়মের কার্যকারিতা শুরু হয়। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের নিয়মগুলি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কার্যকরী ছিল না এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম বিশ্লেষণের জন্য নূতন নিয়ম বর্ণনা করিতে হয়। উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সহিত সংযুক্ত বিষয়গুলির কার্যকারণ সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে।*

ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের সহিত ধনবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation with other Social sciences)

ধনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Economics and Ethics)

মানুষের ন্যায়-অন্যায়বোধ নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু, কিন্তু ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে মানুষের কার্যাবলী। নীতিবোধ মানুষকে যে-কাজ করিতে বলে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সে হয়তো অন্য কাজ করিতে বাধ্য হয়। তাহা ছাড়া, নীতিবোধের দিক হইতে কোন বিষয় খারাপ হইলেও (যেমন মদ উৎপাদন) অর্থনৈতিক কারণে (যেমন বেকারি দূর করিতে) তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞান মানুষের সমস্যা লইয়াই আলোচনা করে এবং মানুষের কল্যাণই, বিশেষ করিয়া কল্যাণধর্মী ধনবিজ্ঞানের (Welfare Economics) লক্ষ্য। সুতরাং নীতিশাস্ত্র এড়াইয়া, অর্থাৎ ন্যায় অন্যায় ও ভাল মন্দ বাদ দিয়া সে কাজ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম তাহার নীতিবোধের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়। যদিও রবিন্‌স্‌-এর মতে ইহা নীতিবোধ নিরপেক্ষ শুদ্ধ বিজ্ঞান মাত্র, তবুও বাস্তবে নীতিশাস্ত্রের সহিত ধনবিজ্ঞান জড়িত। মার্শাল ইহাকে নীতিশাস্ত্রের সহায়ক বলিয়াই মনে করিতেন।

ইহা নীতিশাস্ত্রের সহায়ক

---

*ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল সমাজের উৎপাদনী শক্তির ক্রমবৃদ্ধির কোন এক স্তরে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়সংক্রান্ত নিয়মাবলীর বিশ্লেষণ। তাহাদের মতে, সমাজদেহ-নিরপেক্ষ স্বয়ংস্বাধীন কোন অর্থনৈতিক নিয়ম থাকিতে পারে না।

ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Economics and Politics)

এই দুই বিজ্ঞানের পরস্পরের সম্পর্ক এত নিবিড় যে. 'প্রাচীনকালে এই শাস্ত্রকে 'রাজনৈতিক ধনবিজ্ঞান' (Political Fconomy) বলা হইত। দেশের রাজনৈতিক কাজকর্ম সর্বদাই অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক কারণে বা যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থের দরকার হইলে কর বসাইবার ফলে অর্থনৈতিক জীবনেও কাজকর্মের রূপ বদলাইয়া যায়। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক রূপ অথবা পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে থাকায় উভয়ের সংযোগ অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে। কল্যাণরাষ্ট্রের আদর্শ ব্যাপকভাবে গ্রহণের ফলে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক কালের প্রধান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ ধনতন্ত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রভাবে বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, অর্থ নৈতিক প্রয়োজনেও রাজনৈতিক রূপান্তরণ সাধিত হয়। রাষ্ট্রের রূপ ও কাঠামো বহুলাংশে অর্থ নৈতিক অবস্থার ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠে।

উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ

ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Economics and History)

অতীতকালীন সমাজের ক্রমপরিবর্তনকে ইতিহাস বলে। অতীতকালের অর্থ নৈতিক ঘটনাবলী হইতে ধনবিজ্ঞান বহু নূতন তথ্য পায় ও তাহা হইতে ইহার বহু তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। ইতিহাস হইতে নিজের প্রয়োজনীয় মালমসলা লইয়া ধনবিজ্ঞান সর্বদাই উপকৃত হইয়াছে।

কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সমাজের অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে পরিবর্তনই সমাজ-পরিবর্তনের গতি নির্ণয় করে, অর্থাৎ ইতিহাস সৃষ্টি করে। বর্তমানেও সমাজের যে পরিবর্তন ইতিহাসের সামগ্রী হইতেছে সেই পরিবর্তনের পিছনে অর্থ নৈতিক কারণগুলি কাজ করিতেছে। প্রভাবশালী এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ্ আছেন যাঁহারা ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা (Economic Interpretation of History) করেন এবং সমাজের সকল বিবর্তন মুখ্যত অর্থ নৈতিক কারণে ঘটে (Economic determinism) বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন।

সমাজের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদে পরিবর্তনই সকল ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে

ধনবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব (Economics and Psychology)

মানুষের সকল আচরণের কারণ অনুসন্ধান করা মনস্তত্ত্বের কাজ। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ তাঁহাদের বহু নিয়ম মনস্তত্ত্বের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন (যেমন, ক্রমহ্রাসমান মানসিক অনুভূতির নিয়ম হইতে প্রথমে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম গৃহীত হইয়াছিল)।

তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, ব্যক্তি সর্বদা চুলচেরা বিচার-বিবেচনা করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করে, তাহার সকল অর্থনৈতিক প্রয়াস যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল মানুষই সুখ খোঁজে, যে-কাজে তাহার সর্বাধিক সুখের সম্ভাবনা সে তাহাই করে, দুঃখের সম্ভাবনা এড়াইয়া যায়। এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদকে হেডনবাদ (Hedonism) বলে।

এখনও ধনবিজ্ঞানিগণ মানুষের কাজকর্মের পিছনে বহু মনস্তাত্ত্বিক কারণ দর্শাইবার চেষ্টা করেন। বস্তুত আধুনিক তত্ত্বগুলির অধিকাংশই প্রায় মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষের আবেগ, অনুকরণের ইচ্ছা, অহংকার, আসক্তি, পছন্দ ও ঝোঁক সকল কিছুই আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা ভোগতত্ত্ব, দামতত্ত্ব সকল কিছুই প্রধানত দল-মনের (Group-mind) গতিবিধি বা দল-মনস্তত্ত্বের (Group Psychology) সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিতেছেন। কেইন্‌স বলেন যে, সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, মোট আয়, মোট কর্মনিয়োগ সবকিছু, প্রধানত মানুষের তিনটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে: ভোগপ্রবণতা, নগদ-পছন্দ এবং ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থা। সুতরাং ধনবিজ্ঞান বহু বিষয়ে আজ মনস্তত্ত্বের নিকট ঋণী।

ক্লাসিকাল বা আধুনিক ধনবিজ্ঞান উভয়েই মনস্তত্ত্বের নিকট ঋণী

ধনবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা (Need for Economic Studies)

উনবিংশ শতাব্দীর কার্লাইল, রাসকিন প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌গণ ধনবিজ্ঞান পাঠের বিরোধিতা করিতেন। ইহাকে তাঁহারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর শাস্ত্র বলিতেন, কারণ, তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ইহা অর্থ-পূজা ছাড়া আর কিছু জানে না। স্থূল স্বার্থচিন্তা যে-বিজ্ঞানের আদর্শ সেই 'কুবের-লিখিত সুসমাচার' মানুষের প্রকৃত জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক নহে, ইহা তাঁহাদের বক্তব্য ছিল। কিন্তু

আজকাল আর ধনবিজ্ঞান সেই স্তরে নাই, সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা-বিজ্ঞানরূপে উহা আজ বিদ্বৎসমাজে গৃহীত হইয়াছে।

চিন্তাশীল নাগরিক মাত্রেই আজকাল সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। কিন্তু সেই সকল সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিন্তা করার মত মানসিক শৃঙ্খলা থাকা দরকার। কেহ হয়তো এই সকল সমস্যা চিন্তার সময় গোঁড়ামি করিয়া বসেন, অথবা একের পর এক যুক্তিগুলিকে মনের মধ্যে পর পর সাজাইতে পারেন না। ধনবিজ্ঞানের পাঠ মানুষকে যুক্তিবাদী করিয়া তোলে, তাহার গোঁড়ামি দূর করে। কোন বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগ কি-ভাবে করিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দেয়। অনেকে আছেন, যাঁহারা আবেগপ্রবণ রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বহু প্রকার মন্তব্য করেন, কিন্তু প্রত্যেকটি মন্তব্যকে পরিপূর্ণভাবে শেষ পর্যন্ত বিচার করেন না; ফলে দেশের জনমত অযৌক্তিক ধারায় প্রবাহিত হয়। ধনবিজ্ঞানের অনুশীলন তাহাদের গভীরভাবে চিন্তা করিতে এবং দায়িত্বশীল ধারণা গঠন করিতে সাহায্য করিবে। ঠিক কিভাবে এই অর্থ নৈতিক কাঠামো চালু আছে, এই কাঠামোর বিভিন্ন অংশ কিভাবে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন, তাহা জানিতে হইলেও ধনবিজ্ঞানের পাঠ প্রয়োজন।

মানসিক শৃঙ্খলা যুক্তিবাদী মন তৈরী করা, সমস্যার মূল তাৎপর্য অনুধাবন করা, বর্তমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা বুঝিতে পারা এই সকল ইহা পাঠের উপযোগিতা

সকল ব্যবসায়ীর পক্ষেই ধনবিজ্ঞান অবশ্য-পাঠ্য, কারণ তাহাদের সমস্যা ধনবিজ্ঞানের আলোচনার একটি প্রধান অংশ। প্রত্যেক ব্যবসায়ীই কিছু না কিছু ধনবিজ্ঞানী, কারণ অর্থ আয় করার বাস্তব পদ্ধতিগুলি তাঁহার জানা আছে। ধনবিজ্ঞান পাঠে তাঁহার সেই জ্ঞান আরও বাড়িবে।

ব্যবসায়ীর পক্ষে

বর্তমান পৃথিবীতে ধনবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। এ যুগের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, নৈরাশ্য, বেদনা ও সংগ্রামের মূলে অর্থ নৈতিক কারণ বর্তমান। আধুনিক সমাজে, বিশেষভাবে সচেতন নাগরিকের পক্ষে বর্তমান পৃথিবী ও তাহার গতিবিধির প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ধনবিজ্ঞান অবশ্য পাঠ্য। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন যে-বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহার অনুশীলন ব্যাপক সমাজবোধ ও গভীর চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে।

নাগরিকদের পক্ষে

ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Methods of Analysis)

সাধারণভাবে সকল বিজ্ঞানই বিশ্লেষণের ব্যাপারে দুইটি প্রচলিত পদ্ধতির যে-কোন একটি গ্রহণ করে, একটি হইল অবরোহ (Deduction), আর একটি আরোহ (Induction)। কোন সিদ্ধান্ত পূর্বে স্থির করিয়া উহার পরে তথ্যের সাহায্যে সেই পূর্ব চিহ্নিত সূত্রের সত্যতা প্রমাণ করার পদ্ধতির নাম হইল অবরোহী পদ্ধতি (Deductive Method)। আর সকল তথ্যকে সাজাইয়া উহাদের মধ্য হইতে বৈজ্ঞানিক নিয়ম গঠন করা এবং এইরূপে সিদ্ধান্তে পৌছাইয়া অপর তথ্যের সাহায্যে তাহা যাচাই করা ; ইহার নাম আরোহী (Inductive method)।

অ্যাডাম্ স্মিথ্, রিকার্ডো, ম্যালথাস্ প্রমুখ ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ প্রধানত অবরোহী পদ্ধতির উপর নির্ভর করিতেন। কতকগুলি মূল মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে সত্য ধরিয়া তাঁহারা উহাদের ব্যাখ্যা করিতেন। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে ছিল জার্মান ধনবিজ্ঞানীদের ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical method); তাঁহারা প্রধানত তথ্য হইতে ধনবিজ্ঞানের নিয়মগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন যে, ধনবিজ্ঞানের নিয়মগুলি সমাজের একটি বিশেষ ধরনের অবস্থা হইতে উদ্ভূত, অবস্থার পরিবর্তনে ওই নিয়মগুলি কার্যকরী হয় না, কোন তত্ত্বই অবস্থা নিরপেক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং আগে অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব।

ক্লাসিকাল পদ্ধতি ও জার্মান পদ্ধতি

নয়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানী মার্শাল আসিয়া উভয় মতকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন যে, যেমন হাঁটিতে গেলে মানুষের দুইটি পা দরকার, সেইরূপ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে উভয় পদ্ধতিই সমান প্রয়োজনীয়। যে ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণের সাহায্যে শীঘ্র সত্যে পৌছানো যায়, তাহাই সে-ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

উভয় পদ্ধতিই প্রয়োজনীয়

অঙ্কশাস্ত্র ও পরিসংখ্যানশাস্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতি আজকাল ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা হয় এবং ইহাদের প্রয়োগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় অঙ্কশাস্ত্র ও পরিসংখ্যানশাস্ত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে—গাণিতিক ধনবিজ্ঞান (Mathematical Economics) বা ধনগণিত (Econometrics) এবং পরিসংখ্যানভিত্তিক ধনবিজ্ঞান-এর (Statistical Economics) প্রচলন হইয়াছে।

তাহা ছাড়া, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আজকাল ব্যবহৃত হইতেছে : একটি হইল আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ (Partial equilibrium analysis) এবং অপরটি সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ (General equilibrium analysis)। আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে কেবল একটি বিষয়ের ভারসাম্যের সমস্যা লইয়া আলোচনা হয় (যেমন, একটি ফার্ম, একটি দ্রব্যের দাম, যে কোন একটি শিল্প ইত্যাদি)। সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে সকল বিষয়ের নিজের ভারসাম্য এবং প্রত্যেক বিষয়ের সহিত অপরটির অর্থাৎ পারস্পরিক ভারসাম্যের আলোচনা হয়। যেমন দামস্তর, মোট উৎপাদন, মোট কর্মনিয়োগ, মোট আয়, এই প্রকার বিষয়সমূহ সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের পদ্ধতির দ্বারা আলোচিত হয়। পৃথক করিয়া কোন একটি বিষয়ের বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে এককালোচনা-পদ্ধতি (micro-analysis) বলে, এবং একসঙ্গে সকল বিষয়ের সামগ্রিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে সমগ্রালোচনা-পদ্ধতি (Macro-analysis) বলা হয়।

আংশিক ভারসাম্য ও সামগ্রিক ভারসাম্য এবং এককালোচনা ও সমগ্রালোচনা

ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আরও দুই প্রকার হইতে পারে—স্থিতিশীল (Static) ও গতিশীল (Dynamic)। যে-সকল বিষয় পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সামগ্রিক ভারসাম্য (General equilibrium) সৃষ্টি করিতেছে, তাহারা স্থির ও অপরিবর্তনশীল ইহা ধরিয়া লইয়া যে আলোচনা তাহাই স্থিতিশীল বিশ্লেষণ পদ্ধতি। আসল জগৎ কিন্তু এই ভারসাম্য বজায় রাখিতে দেয় না, অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের কিছু না-কিছু (জনসংখ্যা, মূলধনের পরিমাণ, শিল্প বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি) সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে, স্থিতিশীল বিশ্লেষণে তাই সামগ্রিক ভারসাম্যের রূপ ধরা যায় না। তাই এই সকল বিষয়ের সম্ভাব্য সকল প্রকার পরিবর্তনকে পূর্বেই হিসাবের মধ্যে ধরিয়া লইয়া গতিশীল বিশ্লেষণ পদ্ধতি সামগ্রিক ভারসাম্যের অবস্থা আলোচনার চেষ্টা করে।

স্থিতিশীল এবং গতিশীল

অনুশীলনী

1. "Economics is a social science studying how people attempt to accomodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange." (Cairncross)—Elucidate.

2. Discuss the statement the Economics studies the part played by money in human affairs.

3. "Economics is the study of the influence of scarcity on human conduct in circumstances where men have freedom of choice in allocating resources between competing wants." (Cairncross)—Explain.

4. "Economics studies the part played by money in human affairs." Critically examine this statement.

5. What are the types of problems to which economists attempt to find answer ? Explain the value of Economics studies.
1957)

6. "Economics is what the economics do." What do the economists really discuss ?

7. "Economics is essentially a study of human behaviour." Discuss. Examine in this connection the nature of Economic Laws.

2

কয়েকটি প্রাথমিক ধারণা

Few concepts

সম্পদ (Wealth)

যে সকল দ্রব্যের ও কার্যের দাম টাকার অঙ্কে হিসাব করা সম্ভব, অর্থাৎ যাহাদের আর্থিক মূল্য আছে (Money-Value), ধনবিজ্ঞানে তাহাদের সম্পদ বলে। কোন বিষয়ের আর্থিক মূল্য থাকিতে হইলে উহার কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। প্রথমত, দ্রব্যটির উপযোগিতা থাকিতে হইবে। এইরূপ উপযোগিতা বা অভাব মিটাইবার ক্ষমতা না থাকিলে কেহ তাহার জন্য কোন মূল্য দিতে রাজি হয় না। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যটির অপর্যাপ্ত যোগান থাকিলে তাহার আর্থিক মূল্য থাকে না। চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহ কম হইলে তবেই উহা পাইবার জন্য লোকে টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত থাকে, অর্থাৎ উহার জন্য অর্থ প্রদান করে। তৃতীয়ত, সম্পদ হইতে হইলে দ্রব্যটি বিক্রয়যোগ্য ও বিনিময়যোগ্য (Marketable or Exchangeable) হওয়া প্রয়োজন। যদি দ্রব্যটি বিনিময়-যোগ্য না হয়, তাহা হইলে উহার জন্য কেহ টাকা দিতে রাজি থাকিবে না, কারণ উহাকে কেহ নিজস্ব ভোগের বা ব্যবহারের জন্য অন্যের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া আসিতে পারে না। কোন জিনিস বিনিময়যোগ্য হইতে হইলে উহার মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য হওয়া চাই (Transferable)। সুতরাং সম্পদ হইল লোকের অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে উৎপাদিত দ্রব্যাদি, যাহা অর্থের বিনিময়ে লোকে ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারে।

উপযোগিতা, অপ্রাচুর্য ও বিনিময়-যোগ্যতা

(ক) উপযোগিতা (Utility): উপযোগিতা বলিলে বুঝা যায় একটি দ্রব্য পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা (desiredness)। সেই দ্রব্যটি ব্যক্তির নিকট উপকারী বা অপকারী, আবশ্যক বা অনাবশ্যক, যাহা কিছু হইতে পারে ; কিন্তু ব্যক্তি তাহা পাইতে চাহে এবং দ্রব্যটির জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা আছে এইরূপ হইলেই সেই ব্যক্তির নিকট দ্রব্যটির উপযোগিতা আছে বুঝিতে হইবে।

(খ) অপ্রাচুর্য (Scarcity) : চাহিদার তুলনায় যদি দ্রব্যটির যোগান প্রচুর না হয় তবে উহার অপ্রাচুর্য আছে বলা যাইতে পারে। তুলনায় যোগান বেশি হইলে কেহ উহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে রাজি হইবে না, বাজারে তাহার জন্য কোন মূল্য সৃষ্টি হইবে না, সুতরাং তাহা সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

(গ) বিক্রয় যোগ্যতা (Exchangeability) : দ্রব্যটি বিক্রয়-যোগ্য না হইলে তাহা কখনই সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে না। বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীই সম্পদ। ব্যক্তির মানসিক গুণাবলী, চরিত্র, রুচি প্রভৃতি তাহার মনের সম্পদ হইলেও ধনবিজ্ঞানে উহাদের আর্থিক মূল্য নাই বলিয়া কখনই আমরা সম্পদের পর্যায়ে ফেলিতে পারি না। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মনন ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বিষয় দেশে সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য করে বটে, কিন্তু উহারা নিজেরা সম্পদ নহে। কেবলমাত্র সমাজে যখন দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তখন এই সকল বিষয়ের আর্থিক মূল্য বাজারে স্থির হইত, ইহাদের সম্পদ বলা হইত।

বিক্রয়যোগ্যতা থাকিলেই চলে

মনে রাখা দরকার যে, কোন দ্রব্যের বা কার্যের বিক্রয়-যোগ্যতা থাকিলেই উহাকে সম্পদ বলা চলিবে, উহা সত্য সত্যই বাজারে আসিল কি না বা বিক্রয় হইল কি না তাহার প্রয়োজন নাই। যেমন, রাস্তা-ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এই সকল যদিও বিক্রয় হইতেছে না এবং কেহ ইহাদের বিক্রয়-মূল্য হিসাবও করে না, তবুও ইহা সমষ্টিগত সম্পদ। কয়েক প্রকার সম্পদ আছে, যেমন, রেলপথ, যাহার মুনাফাকে বাৎসরিক সুদ হিসাবে ধরিয়া, বাজারে সুদের হারের সহিত তুলনা করিয়া মূলধনে রূপান্তরণের দ্বারা তাহাদের মূলধনীকৃত মূল্য (capitalised value) আমরা জানিতে পারি। কিন্তু যাহা হইতে মুনাফা হয় না (যেমন রাস্তাঘাট ইত্যাদি) তাহাদের ক্ষেত্রেও উৎপাদনের ব্যয় হিসাব করিয়া আর্থিক মূল্য নিরূপণ করা যায়। সুতরাং বাজারে বিক্রয়ের জন্য না আসিলেও যে-সকল দ্রব্যের অর্থ-মূল্য আছে বা থাকিতে পারে তাহাকেই আমরা সম্পদ বলিব।

প্রাচীন ধারণাসমূহ

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ এইভাবে সম্পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করেন। ধনবিজ্ঞানের শুরুতে কিন্তু সম্পদের সংজ্ঞা ভিন্নরূপ ছিল। সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহিত সম্পদের রূপান্তর হইয়াছে, ফলে তাহার সংজ্ঞারও পরিবর্তন হইয়াছে। ফরাসী দেশের ফিজিয়োক্রাট্‌গণ শুধু কৃষিজাত শস্যদ্রব্যকেই সম্পদ বলিতেন; ইংলণ্ডের মার্কেন্টাইলিস্টগণ শুধু

সোনারূপা. হীরা-জহরৎ ও মূল্যবান প্রস্তরাদিকেই সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন। ধনবিজ্ঞানী অ্যাডাম স্মিথের অভিমতে শুধু ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, স্থানান্তরিত করা যায় এরূপ বস্তুজাত দ্রব্য (Meterial goods) ছিল সম্পদ। আধুনিক কালে সম্পদ বলিতে বস্তুজাত দ্রব্য বা অবাস্তব কার্য (Non-material goods or Services) সকলকেই বুঝা যাইবে ; আর্থিক মূল্য আছে এইরূপ যে কোন দ্রব্য বা কার্য (Services) বর্তমান কালের সমাজে সম্পদ বলিয়া গণ্য।

সম্পদ : ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ (Wealth : Individual and Social standpoints) :

যে-সকল সম্পদের উপর কোন ব্যক্তির মালিকানা থাকে, তাহাদের সেই ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ বলা হয় ; উহারা ব্যক্তিগত সম্পদ (individual wealth)। আবার যে-সকল সম্পদের উপর সমগ্র সমাজের মালিকানা থাকে এবং সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রের মালিকানা থাকে, তাহাকে সমষ্টিগত সম্পদ বলা চলে। যেমন রাস্তাঘাট, রেলপথ, পার্ক, সরকারী স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি।

ব্যক্তি-স্বার্থে ও সমাজ-স্বার্থে বিরোধ

ব্যক্তির নিকট যাহা সম্পদ, সমাজের দিক হইতে তাহা সম্পদ না-ও হইতে পারে। অনেক মুনাফালোভী ব্যবসায়ী কালোবাজারে ব্যবসায় করিয়া তাহার ব্যবসায়ী বন্ধুদের নিকট তাহার দোকানের ব্যবসায়-পরিচিতির (good-will) আর্থিক মূল্য বাড়াইয়া তুলিতে পারে। ইহাতে তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পাইলেও সমাজের সমগ্র সম্পদ-ভাণ্ডারের তিলমাত্র বৃদ্ধি হয় না। এইরূপ বহু ব্যবসায় রহিয়াছে, যাহা উঠিয়া গেলে সমাজের সম্পদ কোনরূপ হ্রাস পায় না। অনেক অসাধু ঔষধ ব্যবসায়ী সমাজের অমঙ্গল সাধন করিয়াই ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে। গ্রামের নিকটে একটি কয়লার খনি স্থাপিত হইলে দেশের উপকার বৃদ্ধির তুলনায় অধিক অপকার সাধিত হইতে পারে তাহা হইলে দেখা যায় যে, কোন ব্যবসায়ের বা উৎপাদনের ব্যক্তিগত মূল্য তাহার সামাজিক মূল্য হইতে কম বা অধিক হইতে পারে।

এইরূপে দেখিতে গেলে, সম্পদের ব্যক্তিগত মূল্য উহার সামাজিক মূল্য হইতে কমও হইতে পারে। যদি রেলপথ খারাপ হইয়া যায় তবে রেল কোম্পানির নিজস্ব ক্ষতির তুলনায় অন্যান্য সকল ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও সংগঠনের

মিলিত ক্ষতির পরিমাণ অধিক হওয়া সম্ভব। পোস্ট অফিস, বিদ্যুৎ কোম্পানির ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সম্পদকে ব্যক্তি ও সমাজ উভয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থে বিরোধ থাকা সম্ভব।

সম্পদ ও কল্যাণ (Wealth & Welfare)

অর্থমূল্যবিশিষ্ট দ্রব্য ও কার্যের নাম সম্পদ। অপরদিকে কল্যাণ হইল কোন ব্যক্তির মানসিক ও চিন্তা জগতের ধারণা। সুতরাং সম্পদ ও কল্যাণ এক জিনিষ নহে, ইহারা ঠিক একই বিষয় বুঝায় না, যদিও সম্পদ থাকিলেই মানুষের কল্যাণ হয়। কারণ মানুষের অভাব মোচনের জন্য সম্পদের প্রয়োজন, কিন্তু সম্পদ ও কল্যাণ কথনই এক নহে।

সম্পদ হইতে কল্যাণ বা সুখ বৃদ্ধি হইবে এমন বলা চলে না। যে-ব্যক্তি 500 টাকা আয় করে তাহার তুলনায় 1000 টাকা আয়কারী দ্বিগুণ সুখী, ইহাও বলা যায় না। মদের উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু ইহাতে সামগ্রিক ভাবে কল্যাণ বাড়ে কি না সন্দেহ। উপরন্তু, দেশে প্রচুর সম্পদ উৎপাদন হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইলে, আমদানীকারী দেশের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ জমিয়া উঠিতে থাকে বটে, কিন্তু তাহা সমাজ-দেহের (Social fabric) পক্ষে শুভকর কি না, অর্থাৎ কল্যাণ বৃদ্ধি করে কি না তাহা চিন্তার বিষয়।

অধ্যাপক পিগু দুই ধরনের কল্যাণের কথা বলিয়াছেন :—অর্থ নৈতিক কল্যাণ (Economic welfare) এবং অর্থব্যতিরেকী কল্যাণ (Non-economic welfare)। অর্থবৃদ্ধির দরুন কল্যাণের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহাকে অর্থ নৈতিক কল্যাণ বলা চলে এবং ইহা ব্যতীত অপরাপর ধরনের কল্যাণকে (যেমন, দৈহিক বা চারিত্রিক কল্যাণ প্রভৃতিকে) অর্থ-ব্যতিরেকী কল্যাণ বলে। ইহারা অবশ্য পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ; মোটামুটিভাবে একের সহিত অন্যের সম্পর্ক আছে। যেমন, পিগু বলিয়াছেন, সাধারণ কল্যাণ নির্ভর করে কি-ভাবে অর্থ আয় হইতেছে (কত ঘণ্টা খাটিয়া বা কিরূপ পরিবেশে, সৎ কিংবা অসৎ উপায়ে), এবং কিভাবে অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহার উপর, যেমন 110 টাকা দিয়া এক ব্যক্তি বই কিনিতে পারে বা মদ কিনিতে পারে ; উভয়ক্ষেত্রে সে একই পরিমাণ উপযোগিতা লাভ করিলেও একটি মঙ্গল-বৃদ্ধিকারক অপরটি মঙ্গল-হ্রাসকারক। সুতরাং দেখা

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

যাইতেছে, ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি হইলেও অনেক সময় সামগ্রিকভাবে কল্যাণ বা মঙ্গল কমিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু অধ্যাপক পিগুর অভিমতে, এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক নহে এবং সচরাচর সম্পদের বৃদ্ধি হইলে মোট কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। কেয়ার্নক্রসের ভাষায় বলা যায়, ধনবিজ্ঞানীরা এই ধারণা লইয়াই অগ্রসর হইবেন যে, (কোন কোন ক্ষেত্রে না হইলেও) সাধারণভাবে, সম্পদের বৃদ্ধি মানুষের পক্ষে কল্যাণকর এবং সম্পদের হ্রাস সামাজিক-ভাবে অকল্যাণজনক।

আয় (Income)

ধনবিজ্ঞানে আয় বলিতে দুই প্রকার ধারণা প্রচলিত আছে: আর্থিক আয় (Money income) এবং আসল বা প্রকৃত আয় (Real income)। কোন উপাদানের মালিকানা হইতে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা ব্যক্তির আর্থিক আয়, অর্থের পরিমাণের দ্বারা তাহার হিসাব করা হয় (যেমন 50 টাকা, 5000 টাকা, 500 টাকা ইত্যাদি।) কিন্তু ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিদের মতে অর্থ হইল পর্দা মাত্র; উহার পিছনেই প্রকৃত বা আসল সামাজিক শক্তিগুলির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। সুতরাং তাঁহারা আয় বলিতে বুঝিতেন, সেই ব্যক্তি পরিশ্রমের ফলে কিরূপ দ্রব্যসামগ্রী উপভোগ করিতে পারিতেছে তাহার কিরূপ তৃপ্তি ঘটিতেছে। দ্রব্যের ভোগ, মানসিক স্বস্তি, শান্তি ও সুখ, অভাবমোচন—দ্রব্য ও কার্যাদি উপভোগের দ্বারা এই সকল পাওয়া, ইহাই ব্যক্তির আসল আয় (Real Income)।

আর্থিক আয় ও আসল আয়

এইভাবে আয়কে ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায়, আর্থিক আয় হইল কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত কিছু পরিমাণ অর্থ; আর প্রকৃত আয় হইল কিছুটা সময় ব্যাপিয়া ব্যক্তি সেই অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী হইতে কিরূপ ভোগ ও তৃপ্তি লাভ করিল। ভোগ ও তৃপ্তির প্রবহমান অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারা—দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারের দ্বারা ব্যক্তি যাহা অবিরাম লাভ করে, তাহাকেই আসল আয় বলে।

সম্পদের সহিত আয়ের পার্থক্য করা দরকার। মানুষের অভাব মিটাইবার উপযোগী মজুত করা সুযোগ-সুবিধাকে সম্পদ বলা হয়। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদ হইতে অভাবমোচন ও পরিতৃপ্তির যে ধারা অনেকদিন ধরিয়া চলে, তাহা হইল আয়। মূলধনরূপে ব্যবহৃত হইলে সম্পদ হইতে আয় সৃষ্টি হয়।

দ্রব্য-কার্যাদির প্রবহমান স্রোতধারা

মূলধন ও আয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক নহে। যে সম্পদ হইতে আয় সৃষ্টি হয় তাহাকে মূলধন বলে (যেমন একটি যন্ত্র হইতে অধিক দ্রব্যোৎপাদনের ফলে যন্ত্রের মালিকের আয় সৃষ্টি হইতেছে)। আবার সেই আয়সৃষ্টিকারী মূলধনের দাম উহার আয়ের পরিমাণ দ্বারা হিসাব করা হয়। যেমন, বাজারে সুদের হার হইল বার্ষিক 5 টাকা এবং কোন যন্ত্র হইতে বৎসরে 10 টাকা আয় হইতেছে। তাহা হইলে ওই যন্ত্রের দাম হইবে 200 টাকা। এইভাবে প্রচলিত সুদের হারের সহিত তুলনা করিয়া আয়কে মূলধনে রূপান্তরিত করা যায়, মূলধনী দ্রব্যের দাম বুঝা যায়। ইহাকে মূলধনীকৃত মূল্য (capitalised value) বলে।

প্রতিযোগিতা—ইহার সুফল ও কুফল (Competition—its merits and demerits)

উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া নূতন ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজের পত্তন হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সর্বোচ্চে অধিষ্ঠিত ছিলেন রাজা। তিনি দেশের প্রধান ভূম্যধিকারী। সৈন্য, ফসলের অংশ ও বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে দেশের জমি তিনি সামন্ত প্রভুদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। সামন্তগণ আবার তাঁহাদের অধীনস্থ উপসামন্তদের মধ্যে জমিদারী ভাগ করিয়া সৈন্য, ফসল ও বশ্যতা আদায় করিত। সর্বনিম্নে থাকেন প্রকৃত চাষীরা—তাঁহাদের ভূমিদাস বলিয়া অভিহিত করা হইত।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

পিরামিডের আকারে গঠিত এইরূপ সমাজে ব্যক্তির কাজকর্ম, দেনা-পাওনা, দ্রব্যাদির দাম, শ্রমের পারিশ্রমিক সবকিছুই সামাজিক বা রাজকীয় রীতিনীতি প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন প্রভৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট থাকিত। গ্রাম, জিলা বা জমিদারীগুলি মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ইউনিট ছিল, তখনও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব হয় নাই, ব্যক্তিভিত্তিক সমাজ গঠিত হয় নাই। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিপ্রাধান্য এবং ব্যক্তিদের পারস্পারিক প্রতিযোগিতার দ্বারা অর্থ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের পথ উন্মুক্ত করা শিল্পবিপ্লবের প্রধান সামাজিক

ব্যক্তির স্থান

ফল। এই যুগ ও পরিবেশ ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের তত্ত্বসমূহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল; তাঁহারা তাঁহাদের লেখায় এই নূতন পরিবেশের কল্যাণকর দিকের কথা মনে রাখিয়া অবাধ প্রতিযোগিতার জয়গান করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতা-মূলক সমাজে দ্রব্যের দাম, শ্রমের দাম, মুনাফা ও সুদ প্রভৃতি বংশমর্যাদা ও চিরাচরিত প্রথার দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না—একের সহিত অপরের কঠিন প্রতি-যোগিতার ফলে এইগুলি নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে অস্তিত্বরক্ষার যে সংগ্রাম (struggle for existence) অবিরাম চলিতেছে প্রতিযোগিতা হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উহারই নামান্তর।

প্রতিযোগিতামূলক সমাজের উদ্ভব

প্রতিযোগিতার প্রধান সুফল হইল ইহার ফলে ব্যক্তির দক্ষতা, নৈপুণ্য প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। সকল ব্যক্তি অধিক আয়ের উদ্দেশ্যে সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকে, প্রত্যেকেই নিজের গুণাবলী বাড়াইবার জন্য সযত্নে প্রত্যেক চেষ্টা করিতে থাকে। উৎপাদক তাহার উৎপন্ন দ্রব্যকে আরও উন্নত করিয়া ভোগকারীদের মনোরঞ্জন ও আকর্ষণের চেষ্টা করে। ইহার ফলে দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক বিক্রেতা নিজের মুনাফা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সর্বাধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি ও যন্ত্রের প্রচলনের দ্বারা ব্যয়-হ্রাসের চেষ্টা করে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করে, উৎপাদন-সমূহকে সর্বশ্রেষ্ঠভাবে নিয়োগ করার দিকে লক্ষ্য রাখে।

প্রতিযোগিতার সুফল

এইরূপে ব্যক্তির উন্নতির ফলে সমষ্টির উন্নতি হয়—সমাজের অগ্রগতি সম্ভব-পর হয়। প্রতিযোগিতার দ্বারা অন্যকে অপসারণ করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলে, নূতনতর দ্রব্যসামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও চিন্তা-ধারায় সমগ্র সমাজের সভ্যতা ও কৃষ্টি উন্নত হইয়া ওঠে।

প্রাণিজগতের বিবর্তনের ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এইরূপ অবিরাম সংগ্রামের ফলে যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the Fittest) এবং অযোগ্যের বিলুপ্তি (Elimination of the unfit) ঘটিতেছে। ব্যবসায় জগতেও সেইরূপ অযোগ্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ হার মানিয়া উৎপাদন-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়; যোগ্য, উপযুক্ত, দক্ষ ব্যবসায়ী বা ফার্ম তাহার ফলে আরও বৃহৎ বাজার লাভ করিয়া যোগ্যতর হইয়া উঠে। প্রাকৃতিক এই নিয়ম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং ইহাই অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির মূল কারণ বা প্রধান চালিকাশক্তি বলিয়া গৃহীত হয়।

প্রতিযোগিতার ফলে ক্রেতাদেরও সর্বাধিক সুবিধা হয়। ক্রেতাগণ দর-কষাকষি দ্বারা দামে উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তাহারা দাম দিতে চাহে বলিয়া উৎপাদকগণ তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের পছন্দ মিটানো উৎপাদকের প্রধান কাজ হইয়া উঠে। প্রতিযোগিতামূলক সমাজে তাই ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব (consumer's sovereignty) বজায় থাকে।

রাষ্ট্র কর্তৃক দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে প্রতিযোগিতাজনিত এই সকল সুবিধা পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় শিল্পের পরিচালককে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় উৎপাদন বা বিক্রয় করিতে হয় না বা প্রতিযোগিতার চাবুকে ছুটিতে হয় না বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে অকর্মণ্যতা বৃদ্ধি পায়, দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা দেখা যায় না. রাষ্ট্র কর্তৃক কোন উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে না। দীর্ঘসূত্রতা, অপব্যয়, অযোগ্য পরিচালনা সকল কিছুই প্রতিযোগিতাহীন সমাজের অগ্রগতি রোধ করে।

রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের কুফল

কিন্তু মনে রাখা দরকার, প্রাণিজগতে যাহাই হউক না কেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এইরূপ অবাধ প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্পূর্ণ শুভ নহে। একে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতার দ্বারা দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে বলিয়া তাহাদের বহু অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করিতে হয়, যাহা সমাজের পক্ষে নিছক অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে (যেমন বিজ্ঞাপনজনিত অর্থ ও জনশক্তির ব্যয়)।

অবাধ প্রতিযোগিতার কুফল

প্রতিযোগিতার ফলে দুর্বলদের কষ্টের সীমা থাকে না। বিশেষ করিয়া যদি প্রতিযোগিগণ সমান শক্তির অধিকারী না হন, তাহা হইলে অধিকতর সম্পদ বা সম্পত্তির মালিকেরা কম বিত্তবান বা কম শক্তিমানদের তুলনায় বেশি সুবিধা পাইবে এবং তাহার ফলে প্রতিযোগিতায় জয়ের সম্ভাবনা তাহাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বেশি হইবে।

অবাধ প্রতিযোগিতা এইরূপে দুর্বল বা কম শক্তিশালীদের নিশ্চিহ্ন করিয়া সবলের একাধিপত্য বা একচেটিয়া ব্যবসার সৃষ্টি করে। পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ফার্মটি

দাম কমাইয়া অন্য ফার্মগুলির লোকসান ঘটাইয়া তাহাদের বাজার হইতে সরাইয়া দেয় এবং নিজে একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপন করে। একচেটিয়ার প্রভাবে সমাজে মোট উৎপাদন কম হয়, দাম বেশি হয়, সর্বোন্নত এবং দক্ষতম (optimum) অবস্থায় উৎপাদন না-ও হইতে পারে।

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তরণ (Change in the Competitive Economic System)

বর্তমানকালের ধনতন্ত্র পুরাতনকালের ধনতন্ত্র হইতে বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। যে অবাধ প্রতিযোগিতা উনবিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থার রূপ নির্ধারণ করিয়াছিল আধুনিককালে সেই প্রতিযোগিতা বাস্তবক্ষেত্রে না থাকায় সমাজ-দেহে এবং অর্থনৈতিক কাঠামোতে অনেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরণ দেখা যাইতেছে।

আধুনিক কালের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিযোগিতার অবলুপ্তি। বর্তমানে উন্নত দেশসমূহে কোন শিল্পে অধিক সংখ্যক বিক্রেতা আর নাই, বিভিন্ন শিল্পে কয়েকটি ফার্ম মিলিয়া উৎপাদন ও বিক্রয়ের কার্য চালাইতেছে।

অলিগোপলির উদ্ভব

যেমন দ্রব্যের বাজারে সেইরূপ শ্রমের বাজারেও উহার বিক্রয় চলিতেছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি শ্রমিক সংঘ দ্বারা। এইরূপে কয়েকটি বৃহৎ ফার্ম সমস্ত বাজার নিজের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া উৎপাদন ও বিক্রয়কার্য চালাইতেছে, ইহাই বাস্তব অবস্থা।

অবশ্য, আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রতিযোগিতার নিজস্ব গতিশক্তি ও অন্তর্নিহিত যুক্তিতেই এইরূপ এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যখন প্রতিযোগিতা আর নাই বলিলেই চলে, উহা নিজেই নিজের মৃত্যু ঘটাইয়াছে। উৎপাদনকারী ফার্ম বৃহৎ ও সম্পদশালী হইলে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে—প্রতিযোগিতায় সাফল্যের এই প্রয়োজনেই প্রতিযোগী ফার্মগুলি বৃহদাকার হইয়া উঠিয়া অবশেষে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়াছে।

এই অবস্থার কয়েকটি বিশেষ ফলাফল আলোচনা করিতে পারা যায়। (১) পূর্বে অসংখ্য বিক্রেতা থাকায় কেহই দ্রব্যের দামকে নিজের চেষ্টায় নির্ধারিত করিতে পারিত না: কিন্তু বর্তমানে কয়েকটি বিক্রেতা ফার্ম মিলিয়া দ্রব্যের যোগান ও দাম উভয়ই বহুলাংশে স্থির করিতেছে। ফলে, পূর্বের ন্যায় 'স্বাভাবিক মুনাফা' লইয়া উৎপাদন করা আর নাই, নিজের মুনাফার পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো অনেকখানি নিজেরই ক্ষমতার মধ্যে আসিয়াছে। বাজারে যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যের দাম আর আপনা-আপনি স্থির হইয়া যায় না. সচেতন ভাবে দ্রব্যের দাম কম বা বেশি পরিমাণে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। (২) কয়েকটি শক্তিশালী ফার্ম লইয়া গঠিত প্রত্যেকটি শিল্পের এইরূপ সংঘবদ্ধতার মধ্যে অসমতা (unevenness) দেখা দিয়াছে। যেমন, দেশের সকল শিল্পের এইরূপ সাংগঠনিক সংঘবদ্ধতা (organisational concentration) সমান তালে অগ্রসর হয় নাই, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও উহার গভীরতায় পার্থক্য আছে। (৩) প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইয়া সংঘবদ্ধতার পথে অগ্রসর হইবার সময় সমাজে বিভিন্ন অংশের শক্তিসাম্যে পরিবর্তন আসিতে থাকে ; কৃষির তুলনায় মূলধনের শক্তি বৃদ্ধি হয়, কৃষিপ্রধান অঞ্চল ও দেশসমূহ ক্রমে শিল্পপ্রধান অঞ্চল ও দেশসমূহ কর্তৃক শোষিত হইতে থাকে, দেশের ভিতরে ও বাহিরে নূতন ধরনের ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। (৪) যখন দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনে বহুসংখ্যক উৎপাদনকারী ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে এবং এইরূপ অলিগোপলির (বাজার দখলকারী কয়েকটি ফার্মের অবস্থান) সৃষ্টি হয়, তখন সাধারণত দেখা যায় অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাষ্ট্রের ভূমিকা পরিবর্তিত হইয়াছে। অবাধ প্রতিযোগিতা না-থাকায় রাষ্ট্র নিজেই ক্রমে অর্থনৈতিক কাজকর্মের অংশীদার হইয়া উঠিতেছে। প্রতিযোগিতার অভাবে সমাজে অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্যস্থাপনকারী যন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে, সুতরাং রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়, বাজারের অবাধ খেলার উপর তাহাকে আর ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। এইরূপ অবস্থায় আধুনিক সমাজ-দেহে দ্রব্যের দাম, উৎপাদনের পরিমাণ, বিক্রয়ের জন্য বাজার, মুনাফার হার, কাঁচামাল প্রভৃতি প্রায় সকল কিছুই

অলিগোপলির ফলাফল ১। দামের উপর প্রভাব বিস্তার, ২। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসমতা ৩। শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন, ৪। রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের উদ্ভব ৫। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের গুরুত্ব হ্রাস, ৬। নূতন পরিচালক শ্রেণীর উদ্ভব ৭। সমাজের সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব গ্রহণ

রাষ্ট্র নিজে নির্ধারণ করিতে থাকে এবং অনেক সময় কোন বিশেষ শিল্প নিজের মালিকানায় তুলিয়া লয়। সংঘবদ্ধতার (concentration) ধারা চলিতে থাকিলে যখন অবশেষে প্রায়-একচেটিয়া অবস্থা আসিয়া পড়ে তখন এইরূপ জাতীয়করণ অনেক ক্ষেত্রে দরকার হইয়া পড়ে। অথবা, সমাজের অন্যান্য দিকে সংঘবদ্ধতা ঘটিয়াছে, অথচ কোন বিশেষ শিল্পে ইহা ঘটে নাই এইরূপ হইলেও শিল্পে জাতীয়করণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। (৫) প্রতিযোগিতার অবলুপ্তি ও অলিগোপলির উদ্ভবের দরুণ সমাজের মূলধন সঞ্চয় এখন আর ব্যক্তির সংযমের বা চরিত্রগত দৃঢ়তার ফল নহে, বৃহৎ ফার্মগুলি নিজেরাই বহু বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও বিভিন্নরূপে মূলধন সঞ্চয় করে। ফার্মগুলি সাধারণত নিজেরা সঞ্চয় করে বা অপরাপর বৃহৎ ফার্ম হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে। ব্যক্তি কর্তৃক মূলধন-সঞ্চয় আজিকার দিনে ক্রমশ গুরুত্বহীন হইয়া উঠিয়াছে। (৬) পরিচালনা ও মালিকানার কার্য পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এক নূতন পরিচালক শ্রেণী তাহার স্থান করিয়া লইয়াছে। মূলধনের মালিকানা বিভিন্ন শিল্পে ক্রমে ছড়াইয়া পড়ায় সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে কতিপয় ব্যক্তির শক্তিপ্রসারের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

(৭) অল্পসংখ্যক কয়েকটি ফার্মের হাতে উৎপাদন ও বিক্রয় সংঘবদ্ধ হওয়ায় সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্ম উৎপাদন প্রভৃতি অনেকাংশে সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবের (Statistical measurement) আওতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে দেশের সকল অর্থনৈতিক বিষয়ের পরিমাণগত পরিমাপ করা সম্ভব হইতেছে। যাহা হিসাব করা যায়, তাহাকে মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভবপর। জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস, সমাজের এক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের লেনদেন প্রভৃতি সমস্ত কিছুর হিসাব জানা যাইতেছে; সুতরাং রাষ্ট্র বা সরকার, নিজস্বার্থে উহাদের উপর সহজেই পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ধনবিজ্ঞানীদের কৃতিত্বের ফলে এই সামাজিক হিসাব গ্রহণ (Social Accounting) সম্ভব হইয়াছে, তাহা মনে করার কোন কারণ নাই; বরং অর্থনৈতিক দেহে অসংখ্য ইউনিটের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার বিলোপ এবং কতিপয় বৃহৎ ফার্মের উদ্ভবের ফলেই ইহা ঘটিয়াছে।

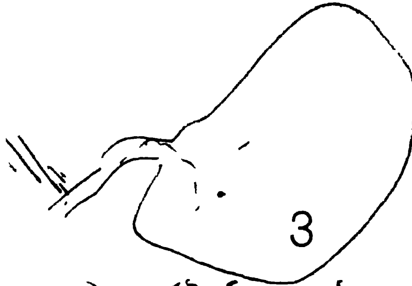
অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে একটি বিশেষ দিক মনে রাখা দরকার। বর্তমানের উন্নত দেশগুলিতে শিল্পবিপ্লবের শুরুতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজদেহের সংযোজক সূত্রগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া অসংখ্য বিক্রেতা ও ক্রেতার

উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে সেই নূতন সমাজ দেহের অর্থনৈতিক কাজকর্মে এক ধরণের স্বচ্ছন্দ গতির সঞ্চার হইয়াছিল। বর্তমান যুগে সেই প্রতিযোগিতার বিলুপ্তি ঘটিবার দরুন সমাজ-দেহে পূর্বের সেই নমনীয়তা আর নাই, উহার সাবলীল গতিচ্ছন্দ লোপ পাইয়াছে; এক ধরনের সাংগঠনিক কাঠিন্য (organisational rigidities) অর্থনৈতিক দেহে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনকার অনুন্নত দেশগুলি এইরূপ অবাধ প্রতিযোগিতাপূর্ণ স্তরের মধ্য দিয়া পার হয় নাই, প্রতিযোগিতার দরুন সমাজ সংগঠনের রূপান্তরণ এই সকল দেশে কখনও ঘটে নাই, এখনও বিশেষ ঘটিতেছে না। ইহাদের ক্ষেত্রে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ সংগঠন ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ না ভাঙ্গিয়া উহার উপর এইরূপ নূতন ধরনের প্রতিযোগিতাহীন রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র (state-capitalism) চাপিয়া বসিয়াছে। এই সকল দেশে অবাধ প্রতিযোগিতা পূর্বেও ছিল না, ধনতন্ত্রের শেষ যুগে, উহার পরিবর্তিত অবস্থায় শিল্পায়ন শুরু হওয়ায় এখনও থাকিবে না।

অনুন্নত দেশে অবাধ প্রতিযোগিতার উদ্ভব না হওয়ায় উহার সুবিধাগুলি পাওয়া সম্ভব হয় নাই

অনুশীলনী

1. Define Wealth.
2. What is the relation between wealth and welfare ?
3. Discuss the merits and demerits of Competition in economic sphere.
4. Discuss the nature of modern Capitalism and the changes brought about in the competitive economic system in our times.



জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামো ও জাতীয় আয়

National Economic Structure and National Income

জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক রূপ (A total picture of the National Economy)

সামগ্রিক গতিশীল চিত্র

সমাজের সামগ্রিক রূপ কল্পনা করিলে আমরা দেশের মোট অর্থ নৈতিক গতিধারার আভাস পাইতে পারি। বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী যেমন সমুদ্রে প্রবাহিত হয় এবং আবার মেঘের আকারে নূতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়া সমুদ্রের সহিত মেশে, মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মও সেইপ্রকারে ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করিয়া সামগ্রিকভাবে জাতীয় আয় সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত আয় হইতেই সমাজে মোট ভোগ ও চাহিদার সৃষ্টি হয়—পুনরায় উৎপাদন চলিতে থাকে—জাতীয় আয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্রের ন্যায় সঞ্চরণশীল উৎপাদন—আয়সৃষ্টি—ব্যয়—ভোগ ও সঞ্চয় – পুনরুৎপাদন, ইহাই সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের চলমান প্রতিচ্ছবি।

স্রোতধারা

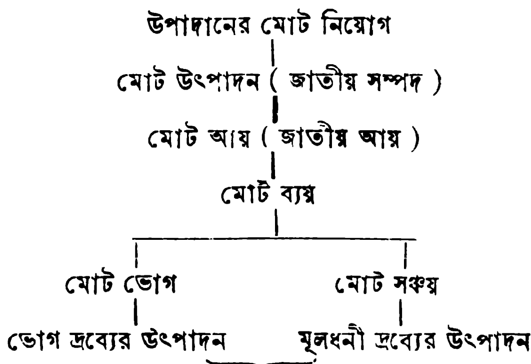
সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন উপাদান হিসাবে সম্পদ উৎপাদনের কাজে (দ্রব্যাদি বা কার্যাদি) নিযুক্ত আছে। দেশে উৎপাদনের সকল উপাদান বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদি (goods & services) উৎপন্ন করে। এই সকল দ্রব্য ও কার্য (goods and services) অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় অথবা তাহাদের অর্থমূল্য হিসাব করিতে পারা যায়। উহাদের বিক্রয়মূল্য হইতেই সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত আয়; উহাদের মোট বিক্রয় মূল্যই উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদান সমূহের মোট আয় (অর্থাৎ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) সৃষ্টি করে। দেশের সকল উপাদানের আয় যোগ করিয়া আমরা জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে পারি।

* এই আলোচনায় বহু জটিলতা বাদ দেওয়া হইয়াছে, ইহা প্রাথমিক ধরনের আলোচনা মাত্র। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আয় ও কর্ম সংস্থান-তত্ত্ব পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে।

এই জাতীয় আয়ই সমাজের মোট দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় হইয়া যায়; *ইহা মোট ব্যয়ের সমান। †

মোট ব্যয়ের কিছু অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়; যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত হয়। এইরূপে ভোগ্য দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা দেখা যায়। ফলে, সমাজে ভোগ্য দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন শুরু হয়; সমাজের ব্যক্তিবৃন্দ উপাদান হিসাবে বিভিন্ন প্রকার কর্মে নিযুক্ত হইয়া যায়। পুনরায় তাহাদের আয় সৃষ্টি হয়, আবার ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইতে থাকে। এইরূপে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থনৈতিক গতিধারার স্রোত বহিয়া চলে।

ইহাদের সাজাইলে দেখা যায়:



মোট উপাদানের নিয়োগ

জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি

এই ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বোঝা যায়। দেশে যদি উপযুক্ত পরিমাণে উপাদান না থাকে বা তাহার দক্ষতাবিহীন ও অনুন্নত হয় তাহা হইলে মোট দ্রব্যসামগ্রী বা মোট সম্পদের উৎপাদন কম হইবে। সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে উহার বিক্রয় মূল্যও কম হইবে, লোকের আয়ও কমিয়া যাইবে। ফলে ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয় কম হইবে, এবং কম সঞ্চয়ের দরুন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনও কমিয়া যাইবে। দেশে জীবনযাত্রার

* রাষ্ট্র যাহা কর হিসাবে আয় হইতে তুলিয়া লয়, উহা ব্যক্তির ব্যয় না হইলেও রাষ্ট্র ব্যয় করে সুতরাং ইহা সমাজের মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

† দুই দিক হইতে ইহা দেখা যায়। এক ব্যক্তির আয় নিশ্চয় অন্য ব্যক্তির ব্যয়, সুতরাং মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান। আবার, মোট আয়ের কিছুটা ভোগ্যদ্রব্যে সরাসরি ব্যয়িত হইবে, কিছুটা

মান, মোট আয়, ব্যয়, ভোগ-পরিমাণ এবং মোট মূলধন-গঠন (capital-formation) সবই হ্রাস পাইবে।

দেশে কর্মনিয়োগের পরিমাণ মোট ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল

আরও জানা যায়, মোট ব্যয় যদি বাড়ানো হয় তাহা হইলেই উপাদানসমূহের অধিক নিয়োগ সম্ভবপর হয় এবং তাহার ফলে দেশে অধিক আয় সৃষ্টি হইতে পারে। রাষ্ট্র যদি সমাজের মোট ব্যয় বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদানগুলি বেকার থাকিবে না, সমাজে সম্পদের উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে এবং আয়ের স্তরও বৃদ্ধি পাইবে।

দেশের লোকের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে যে-সকল দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হয় তাহাই লোকে ভোগ করে এবং নূতন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্য দ্রব্যসামগ্রী বা বিনিয়োগের জন্য মূলধনী দ্রব্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এইভাবে মোট উৎপাদন বা জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

জাতীয় আয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণের গুরুত্ব

এই সকল কারণে জাতীয় আয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সমাজের কত পরিমাণ উপকরণ কোন্ অংশে (কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদিতে) কিরূপভাবে সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তাহা জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায়। এই সম্পদ কোন্ কোন্ দ্রব্য লইয়া গঠিত ; কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ উৎপন্ন হইল ; কোন্ শ্রেণীর হাতে জাতীয় আয়ের কত অংশ চলিয়া যাইতেছে ; দেশে মোট ভোগ্য দ্রব্য কোন্ শ্রেণীর মধ্যে কিরূপ ভাবে বণ্টিত হওয়া আছে, সকলই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ইহার দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমগ্রভাবে দেখা যায় এবং কি কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের (component parts) পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর অর্থনৈতিক কাজকর্ম আপন গতিতে প্রবর্তিত হইতেছে তাহা বোঝা যায়, দেশের অর্থনৈতিক ব্রহ্মাণ্ডের রূপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ভাগীরথী যেরূপ মহাদেবের জটা হইতে নামিয়া আবার মহাদেবের জটাতেই ফিরিয়া আসে—মানুষের সকল দৈনন্দিন কাজকর্মের স্রোতধারাও জাতীয় আয় হইতে উদ্ভূত হইয়া জাতীয় আয়কেই পুনরায় পুষ্ট করিয়া তোলে।

সঞ্চিত হইবে। সেই সঞ্চয় মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয় হইবে। অথবা কিছুতেই ব্যয় না হইলে মোট আয় কমাইয়া দিবে, কারণ, উহা ব্যয় না হওয়ায় অন্যের আয় সৃষ্টি হইতে পারিবে না।

জাতীয় আয় (National Income)

"কোন দেশের শ্রম ও মূলধন, প্রকৃতির উপকরণের দ্বারা এক বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তুজাত দ্রব্য বা বিভিন্ন কার্যাদির নীট সমষ্টি (net aggregate) উৎপন্ন করে"—মার্শাল তাহাকে জাতীয় উৎপন্ন বলিয়াছেন।*

জাতীয় আয়

সমাজের বিভিন্ন দিকে উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উপাদান যে-পরিমাণ সম্পদ এক বৎসরের মধ্যে সৃষ্টি করে তাহাকে স্থূল জাতীয় উৎপন্ন (gross national product বা G. N. P.) বলে। এই স্থূল জাতীয় আয় হইতে সেই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে-ক্ষয়ক্ষতি হইল তাহা পূরণের জন্য কিছু সম্পদ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় উৎপন্ন (net national product বা N. N. P.) বা বিভাজ্য জাতীয় উৎপন্ন (national dividend)। এই জাতীয় উৎপন্ন বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক উপাদানের আয় সৃষ্টি করে। সকল উপাদান এই বিভাজ্য জাতীয় উৎপন্ন হইতে নিজস্ব আয় পায় বলিয়া ইহাকে বিভাজ্য আয় (dividend) বলে।

এই জাতীয় উৎপন্ন কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার (fund) নহে, ইহা স্রোতশীল ধারা। প্রতি বৎসর সকল উপাদানের কার্যের ফলে এই সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং সকল উপাদানের মধ্যে তাহা বণ্টিত হয়। উপাদানসমূহের মিলিত কার্যের ফলে উৎপন্ন এই সম্পদ তাহাদের আয়ের উৎসও বটে। এই জাতীয় আয় চারি প্রকার আয়ে বিভক্ত হইয়া (খাজনা, সুদ, মজুরি ও মুনাফা) দেশের সমগ্র জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করে।

জাতীয় উৎপন্ন বলিতে মার্শাল এক বৎসর উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির পরিমাণকে বুঝিয়াছেন। দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির এই পরিমাণকে বাস্তবক্ষেত্রে

---

*অধ্যাপক ফিশার বলেন যে, জাতীয় সম্পদ বলিলে সারা বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্য ও কার্যাদির পরিমাণ বোঝা ঠিক নয়। তাঁহার মতে প্রধানত জীবনযাত্রার মান আলোচনার জন্যই জাতীয় আয়ের ধারণা দরকার এবং উহার পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি সারা বৎসর মোট ভোগের পরিমাপকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন। যেমন 1959 সালে 60 হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ি তৈয়ারী হইল। মার্শালের মতে উহাকে সেই বৎসরের জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করিতে হইবে। কিন্তু ব্যক্তি ওই বাড়িটিকে (ধরা যাউক) 30 বছর ধরিয়া ভোগ করিবে, প্রতি বৎসর উহার $\frac{1}{30}$ অংশ ভোগ করা হইতেছে। তাই বছরে 2 হাজার টাকার বেশি যোগ করা উচিত নহে, ইহাই ফিশারের অভিমত। কিন্তু এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হয় নাই, উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে জাতীয় আয়কে গণনা করার নীতি গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে। কারণ জাতীয় আয়ের উৎপাদনে উঠানামাই দেশের কর্মসংস্থান ও আয়স্তরের উঠানামা প্রকাশ করে।

হিসাব করা হয় এবং তাহার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নহে। কারণ দেশের সকল প্রান্তে কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইল তাহার ঠিকানা নাই। তাহা ছাড়া একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ আছে (যেমন বহু প্রকারের আম, কুমড়ো, চা, জুতা ইত্যাদি)। একই মানদণ্ডের মাধ্যম ব্যতীত ইহাদের হিসাব করিতে হইলে বিরাট তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। আরও অসুবিধা হয় 'আসল' ধারণা (real concept) অনুযায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের হিসাবের ক্ষেত্রে। 1000 পেন্সিল হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কত পেন্সিল বাদ দিয়া রাখিতে হইবে? আর যাহা বাদ দেওয়া হইল (ধরা যাক্ 200টি) তাহা কি ব্যবহৃত হইয়া দেশের সম্পদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না? তাই জাতীয় আয়কে 'আসল' আয় হিসাবে গণনা করার পথে বহু বাস্তব অসুবিধা আছে।

দ্রব্য ও কার্যাদির হিসাবে জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে পিগু জাতীয় আয়কে হিসাব

* কিন্তু এই ভাবে অর্থমূল্যের সাহায্যে হিসাব করারও অনেক ত্রুটি আছে। বহু দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদক নিজেই ব্যবহার করে (যেমন চাষী নিজের উৎপন্ন ধান ভোগ করে, বা তাঁতী নিজের উৎপন্ন কাপড় ব্যবহার করে, শিক্ষক নিজের ছেলেমেয়েদের পড়ায়, হোটেলওয়ালা নিজের হোটেলেই খাদ্যাদি গ্রহণ করে)। এই সকল দ্রব্যের মূল্যকে অর্থের হিসাবে পরিমাপ করা চলে না, ইহারা অর্থমূল্য সৃষ্টি করে না, অথচ ইহাদের বাদ দিলে জাতীয় আয়ের প্রকৃত পরিমাণ বোঝা যায় না। কোন ব্যক্তি তাহার টাইপিষ্টকে বিবাহ করিয়া যদি তাহাকে মাহিনা না দিয়া পূর্বের ন্যায় টাইপের কাজ করাইয়া লয়, তাহা হইলে বর্তমানে সেই কাজের অর্থমূল্য সৃষ্টি না হওয়ায় অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় কমিয়া যায়। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও পরিমাণগত পরিমাপ করার সুবিধা থাকার দরুন অধ্যাপক পিগুর সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অর্থমূল্যের হিসাবেই জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে।

অর্থমূল্যের সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আরও দুইটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, অর্থের নিজের মূল্যেরই পরিবর্তন হইতে পারে। ইহার ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণে পরিবর্তন দেখা দেয়, কিন্তু তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হয় না। যেমন দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে (অর্থাৎ অর্থের নিজস্ব মূল্য কমিয়া গেলে) অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু দেশের সম্পদ বাড়িল না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অর্থের নিজস্ব মূল্য স্থির ধরিয়া লইয়া, অর্থাৎ দামস্তর স্থির ধরিয়া জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যকার্যাদির অর্থমূল্যের, অর্থাৎ দামের কোন পরিবর্তন হইল না, অথচ দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি হইল বা হ্রাস পাইল, তাহা ঘটিতে পারে। ইহার ফলে জীবনযাত্রার মানে বাস্তব পরিবর্তন আসিবে, কিন্তু জাতীয় আয় পরিমাণগতভাবে সমানই থাকিয়া যাইবে। যেমন, পূর্বের 4 টাকা ভিজিটের ডাক্তারের তুলনায় এখনকার একই দামের ডাক্তারের কার্য অনেক উন্নত ধরনের।

করিয়াছেন অর্থের মাধ্যমে ; এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির অর্থমূল্যের মোট পরিমাণ হিসাব করিয়া। এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির দাম যোগ করিয়া মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায় এবং ওই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উহা হইতে বাদ দিয়া নীট জাতীয় আয় হিসাব করা হয়।

পিণ্ড ; মোট উৎপন্নের অর্থমূল্য

জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও দুইটি বিষয় বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের সম্পদের উপর বিদেশীদের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতে বাদ দিতে হয়। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় লোকের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করিতে হয়। আমদানি-রপ্তানি হইতে দেশের নীট পাওনাকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করা হয় অথবা নীট দেনাকে বিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ কর ধার্য করার ফলে সকল উপাদানের আয় হইতেই সেই কর আদায় করা হয়। নীট জাতীয় আয় হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সকল ব্যক্তির ব্যয়োপযুক্ত আয়ের সমান (Disposable Income)। রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপন্নের মধ্যে যোগ করা দরকার। সরকারী কর্মচারীদের মাহিনাকে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করা প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন কার্যাদির পারিশ্রমিক হিসাবেই সেই আয়ের সৃষ্টি হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রাষ্ট্রের কার্যকলাপ

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income)

জাতীয় আয় হইল (ক) এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির মোট দাম ; (খ) সকল উপাদানের আয় সৃষ্টি হইবার উৎস ও ভাণ্ডার, এবং (গ) সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল। সুতরাং উহার পরিমাপ তিন ভাবে হইতে পারে। প্রথমত, সেই বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর ও কার্যাদির দাম যোগ করিয়া ; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কার্যে সহায়তার দরুন উপাদানসমূহের সকল পাওনা (payments) যোগ করিয়া, এবং তৃতীয়ত, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয় যোগ করিয়া। এই তিনটি হিসাব স্বভাবতই সমান হইবে, কারণ মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আয় সৃষ্টি হয় ; মোট উৎপন্নের দাম সকল উপাদানের পাওনা

লইয়াই গঠিত হয়; এবং সমাজের মোট আয় সকলের হাতে ভোগব্যয় ও সঞ্চয়রূপে ছড়াইয়া থাকে। প্রথমটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ উৎপন্নের সমষ্টি (Final products total); দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Factor-payments total); এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ভোগসঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Savings total)। প্রথম পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্য ও কার্যাদির (goods & services) দাম যোগ করিয়া, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সকল উপাদানের পাওনা বা আয় যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ সম্ভব। রাশিবিজ্ঞানিগণ (Satisticians) সাধারণত প্রথম দুইটি গ্রহণ করেন, কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে সুবিধা (যেমন, শিল্প, কৃষি, খনি ইত্যাদি); আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সুবিধাজনক (যেমন ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা ইত্যাদি) পরিমাপের পক্ষে তৃতীয় পদ্ধতি বিশেষ অসুবিধাজনক।

পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি

(ক) উৎপাদন-সুমারি পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Census of Production Method or the Final Products Total)

এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্য ও কার্যাদির অর্থমূল্য যোগ করিলে আমরা স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) পাইতে পারি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবলমাত্র দিতে হইবে। যে সকল দ্রব্য অর্ধ-উৎপন্ন অথবা উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (Intermediate stages) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না। যেমন আসবাব প্রস্তুতকারী যে-কাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম যোগ দেওয়া হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছায় নাই। কিন্তু যদি পুড়িবার জন্য কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সেই কাঠের দাম হিসাব করিতে হইবে, কারণ তাহা সম্পূর্ণ দ্রব্য (Final Product) হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এইভাবে হিসাব করিলে ডবল-গণনার (double counting) হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানি হয়। রপ্তানি ও আমদানির মূল্যের পার্থক্য মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময় যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। যদি তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাহা হইলে বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহা হইলে যোগ হইবে।

এইভাবে স্থুল জাতীয় আয় হিসাব করিয়া মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কিছু অর্থ বাদ দিয়া জাতীয় আয় পরিমাপ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেশের সকলে মিলিয়া যে-সকল ভোগ্যদ্রব্য ও কার্যাদি ক্রয় করিয়াছে তাহাদের দাম, দেশের সরকার যাহা ক্রয় করিল তাহার দাম এবং নূতন মূলধনী দ্রব্যের দাম, এই সকল যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

(গ) আয়-সুমারী পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Census of Income Method or The Factor Payments Total)

এক বৎসরে দেশের, (ক) সকল মজুরি, মাহিনা, (খ) সকল ফার্ম বা ব্যবসার নীট আয় (মজুরি মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহা অন্যত্র ('ক'-তে) হিসাব করা হইয়াছে); (গ) সকল ঋণ হইতে নীট সুদ, (ঘ) সকল নীট খাজনা, এই সকল যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা চলে।

এইরূপে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

(ক) হস্তান্তর-পাওনাসমূহ (Transfer Payments) বাদ দিতে হইবে। যেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওনা জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আসিবে না; কারণ তাহা কোন নূতন আয় নহে, কোন নূতন উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর অর্থমূল্য নহে। ভিক্ষুকের আয় বা কোন দান গ্রহণও গণনার মধ্যে আসে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ধারায় কার্য করিবার দরুন সৃষ্টি হয় না। কোন দ্রব্যোৎপাদন বা কোন কার্যাদির দরুন যে-আয় তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে।

(খ) মালিকের নিজের যে-সকল উপাদান (যেমন নিজের বাড়ি, জমি, পরিচালন ক্ষমতা বা মূলধন) উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজার-দরের হিসাবে অর্থমূল্যে রূপান্তরিত করিয়া গণনার মধ্যে আনা প্রয়োজন।

(গ) বিনা দামে যে সকল দ্রব্য বা কার্যাদি পাওয়া যাইতেছে (যেমন বাড়িতে স্ত্রীলোকের কার্য বা নিজের বাগানের তরিতরকারী) তাহাদের কোন আয় বা অর্থমূল্য সৃষ্টি না হওয়ায় জাতীয় আয় গণনার মধ্যে আনা হইবে না।

(ঘ) ফার্মের মোট মুনাফার যে-অংশ মজুত-তহবিলে (Reserve Fund) জমাইয়া রাখা হইয়াছে, (অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার-ক্রেতাদের আয়

সৃষ্টি করে নাই) তাহাও যোগ দিতে হইবে। কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না গেলেও ওই মূল্য দেশে সৃষ্টি হইয়াছে।

ভোগসঞ্চয় পদ্ধতি বা ভোগসঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Savings Method or the Consumption Savings Total)

সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং অপর অংশ সঞ্চয় হয়। তাই এক বৎসরে সমাজে মোট ভোগ-ব্যয় ও মোট সঞ্চয় যোগ করিতে পারিলে নীট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়।

সাধারণত ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, তাই এই পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুবিধা নাই।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties in the Measurement of National Income)

জাতীয় আয়ের পরিমাপ সকল দেশেই বহু বাস্তব অসুবিধার মধ্য দিয়া করিতে হয় ; বিশেষত অনুন্নত দেশসমূহে অসুবিধার পরিমাণ বেশি। প্রথমত, যে-সকল দ্রব্য বা কার্যাদি বিক্রয় হয় না এবং বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে না, তাহাদের ক্ষেত্রে বাজার-দাম কি হইতে পারিত ইহা ধরিয়া লইয়া জাতীয়-আয়ের মধ্যে যোগ করিতে হয়। ইহা অসুবিধাজনক তো বটেই, হিসাবও নির্ভুল না হইবার সম্ভাবনা। অনুন্নত দেশসমূহে সমাজের উৎপন্নের একটি বৃহৎ অংশ উৎপাদকগণ নিজেরা ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন কম ; পণ্য-বিনিময় (Barter) চালু আছে। এই সকল দেশে অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় পরিমাপের বিশেষ অসুবিধা। দ্বিতীয়ত, একক মালিকানা ব্যবসা-সংগঠন অধিক চালু থাকায় এবং অনুন্নত দেশে সাধারণভাবে ব্যবসায়ের হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিকভাবে না রাখায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার সুবিধা কম। তৃতীয়ত, এই সকল দেশে উপাদান-সমূহের বিশেষায়ণ (Specialisation) অধিক প্রসার লাভ করে নাই। যেমন, একই ব্যক্তি চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, বস্ত্রাদি উৎপাদন করিয়া এবং দোকান চালাইয়া আয় করে। জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (Classification of sectors), অর্থাৎ, কোন্ ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহা সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না।

অনুন্নত দেশ, যেমন ভারতবর্ষে, পরিমাপের বাস্তব অসুবিধা

কি বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে (Factors determining the size of the National Income)

জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপাদন এবং বিদেশ হইতে নীট আয়ের উপর। এই দুইটি বিষয় লইয়াই জাতীয় আয় গঠিত।

দেশের নীট উৎপাদন কিসের উপর নির্ভর করে? প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইলে দেশের মোট উৎপাদন নির্ভর করে কর্মনিয়োগের পরিমাণ এবং শ্রমিকদের গড় উৎপাদন-ক্ষমতার উপর। দেশে কর্মনিয়োগের মোট পরিমাণ নির্ভর করে দ্রব্যসামগ্রীর কার্যকরী চাহিদার (Effective Demand) উপর। কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ হইবে। অনুন্নত দেশে জীবনযাত্রা ও আয়ের স্তর এত নিম্নে যে কার্যকরী চাহিদা কম; তাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কম।

কাযকরী-চাহিদা, মূলধন নিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য

শ্রমিকদের গড় উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে প্রধানত শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের পরিমাণের উপর। শ্রমিক-পিছু মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের গড় উৎপাদন ক্ষমতা তত বাড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং মূলধন ও তাহার নিয়োগের পরিমাণের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করিবে। বিদেশ হইতে নীট আয় নির্ভর করে—দেশ কত কম আমদানি করিয়া চালাইতে পারে এবং কত বেশি রপ্তানি করিতে পারে তাহার উপর। এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে।

মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা (Maintaining Capital Intact)

উৎপাদন-ধারায় মূলধনী দ্রব্য বিনিয়োগের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিয়া মূলধনের মূল্য পূর্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ রাখা—ইহাকে মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা বা মূলধন বজায় রাখা বলে।

যদি একটি যন্ত্রের দাম 500 টাকা হয় এবং ওই যন্ত্রটির আয়ু 10 বৎসর ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উহার 10 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 50 টাকা

ক্ষতিপূরণ কিভাবে পরিমাপ করা হয়

ক্ষয় হইতেছে মনে করা চলে। ওই যন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে এই পরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ 50 টাকা) প্রতি বৎসর সরাইয়া রাখিলে 10 বৎসর পরে ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলেও উহার পরিবর্তে নতন যন্ত্র ক্রয় করিবার মত অর্থ সঞ্চিত

হইবে এবং উৎপাদন-ধারা অব্যাহত থাকিবে। যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত পূরণ না হইলে 10 বছর পর যন্ত্র সচল থাকিবে না এবং ইহার ফলে ফার্মের আয় কমিয়া যাইবে।

'মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখার' এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিতভাবে পূরণ হইলে দেশের মোট মূলধন সমান থাকিবে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ একই থাকিলে অর্থ-নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (Economic growth) সম্ভাবনা থাকে না, সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো একই স্তরে আবর্তন করিয়া থাকে।

মূলধন গঠন ও অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি

সুতরাং মোট জাতীয় আয় হইতে শুধু ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্যই নহে, দেশে আরও মূলধন এবং আরও যন্ত্র-পাতি প্রসারের জন্য ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বৎসর জাতীয় আয় হইতে আগের বৎসরের তুলনায় অধিকতর অর্থ মূলধন-গঠনের উদ্দেশ্যে সরাইয়া লইলে দেশে ক্রম বর্ধনশীল হারে মূলধন-গঠন সম্ভব হয় এবং ক্রমেই সেই মূলধন প্রয়োগের দ্বারা শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য : সামাজিক হিসাব গ্রহণ (Significance of National Income analysis : Social Accounting)

জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমনভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যে, তাহা হইতেই আমরা জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (Component-parts) বুঝিতে পারি। যেমন, ব্যবসাদি হইতে কি পরিমাণ মুনাফা, জমির মালিকানা হইতে কি-পরিমাণ খাজনা, চাকুরি ইত্যাদি হইতে কি-পরিমাণ মাহিনা, ঋণ প্রদান হইতে কি-পরিমাণ সুদ এবং পরিশ্রমের দরুণ কি-পরিমাণ মজুরি দেশের লোকে পাইতেছে-এই সকল আমরা জানিতে পারি জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের সাহায্যে। জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামো, ইহার সামগ্রিক রূপ, এক অংশের সহিত অপর অংশের সম্পর্ক, ইহার গতি-প্রকৃতি, সকল কিছু আমরা জাতীয় আয় গঠনকারী অংশসমূহের বিভাগ হইতে বুঝিতে

জাতির অর্থ নৈতিক কাঠামো ও গতি-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়

পারি। আয় ব্যয়ের ধরন (pattern of Income and Expenditure), জাতীয় উৎপাদনের কোন্ অংশে মূলধন ও শ্রম কি-পরিমাণ নিযুক্ত, মূলধনের কোন্ অংশে শ্রমিক দক্ষতা কিরূপ, কোন্ অংশ হইতে মূলধন সরাইয়া আনিয়া কোন্ অংশে নিয়োগ করা দরকার—সবই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে

জানিতে পারা যায়। কতটুকু আয় সরাইয়া লইলে (কর, ঋণ ইত্যাদির সাহায্যে) মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়, তাহাও জানা যায়। জাতীয় আয়ের উঠানামা (Fluctuations in National Income) রোধ করিতে হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশের উপকরণ-সমূহের সর্বাধিক ও সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার ব্যাপারেও জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির অনুমান করা চলে। এক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত অপর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয়ের ধারণা খুবই সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। একটি দেশের জাতীয় আয়ে উঠানামা অপর দেশের জাতীয় আয়কে কিরূপে প্রভাবান্বিত করে তাহার পর্যালোচনা জাতীয় স্বার্থে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রগতির হার (rate of economic growth or progress) পরিমাপ করার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্যকরী। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈয়ারী করার সময়েও ইহা বিশেষ উপযোগী। কোন্ ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়া কোন্ ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইবে তাহা এই বিশ্লেষণ হইতেই জানা যায়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় তাই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

অনুশীলনী

1. Discuss the circular flow of a National Economy. Or Give a total picture of the National Economy.

2. Define National Income and discuss how to measure it. (C.U. B.A. 1956)

3. 'Most of the major problems in economics involve the conception of the National Income and an understanding of the factors governing it.' Examine this statement. (C.U. B. Com. 1953)

4. How would you define and measure the national income of a country? (C.U. B. Com. 1959)

5. Discuss the need and importance of National Income Calculation or Social Accounting.

6. Write short notes on Social Accounting. (C.U. B. Com. 1957)

উৎপাদন ও উপাদান

Production and the Factors

উৎপাদন (Production)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, প্রধানত অ্যাডাম স্মিথের অভিমতে, উৎপাদন হইল পদার্থমূলক দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা বা পদার্থগত দ্রব্য সৃষ্টি করা (creation of materials goods)। শুধু পদার্থগত দ্রব্য উৎপাদন করে এইরূপ শ্রমই উৎপাদক শ্রম (productive labour), সমাজের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কার্যাদি (Services) অনুৎপাদক শ্রম বলিয়া গণ্য হইত। উৎপাদনের এই সংজ্ঞা আধুনিক কালে আর গ্রহণ করা হয় না, কারণ এ যুগের ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা মানুষ পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে না ; সে বস্তুকে বা পদার্থকে উহার নিজস্ব অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায়, মানুষের অভাব মিটাইবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী করিয়া রূপান্তরিত করে মাত্র। আজকাল তাই মানুষের অভাব মিটানোর ক্ষমতা সৃষ্টির বা উপযোগিতা সৃষ্টির কাজকে উৎপাদন বলা হয়।

উপযোগিতা সৃষ্টি

উৎপাদকেরা তিন ধরণের উপযোগিতা সৃষ্টি করে : (ক) আকারগত উপযোগিতা (form utility), অর্থাৎ দ্রব্যটির আকার পরিবর্তন করিয়া, যেমন কোন কাঁচামালকে সম্পূর্ণ দ্রব্য রূপান্তরিত করিয়া ; (খ) স্থানগত উপযোগিতা (place utility) অর্থাৎ চাহিদা বেশি এমন স্থানে দ্রব্যটিকে সরাইয়া আনিয়া ; এবং (গ) কালগত উপযোগিতা (time utility) অর্থাৎ যখন চাহিদা হইবে সেই সময়ের জন্য দ্রব্যটিকে রক্ষা করিয়া। এই জন্যই বলা হইয়াছে "Things are not fully produced until they are in the form in which they are wanted, at the place at which they are wanted and at the time when they are wanted," আজকাল তাই যে-শ্রম উপযোগিতা উৎপাদন করে তাহাকেই উৎপাদক শ্রম বলা হয় এবং উপযোগিতা সৃষ্টি করিতে না পারিলে তাহাকে অনুৎপাদক (Unproductive) শ্রম বলে।

আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীরা (যেমন কেয়ার্নক্রস) উৎপাদনের এই সংজ্ঞাকে আরও সংকীর্ণ করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে কেবলমাত্র উপ-

যোগিতা সৃষ্টি হইলেই উৎপাদন হইল না, ওই দ্রব্যের মূল্য (Value) থাকিতে হইবে। মূল্য সৃষ্টি করাই উৎপাদন। মূল্য নাই, অথচ উপযোগিতা আছে, এরূপ দ্রব্য তৈয়ার করা যায় বটে, কিন্তু ধনবিজ্ঞানীরা উহাকে উৎপাদন বলিবে না। উপযোগিতা সৃষ্টি করাই উৎপাদনের উদ্দেশ্য নয়। দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য সৃষ্টিই উৎপাদনের প্রধান কথা। অর্থাৎ, তাহাদের মতে, একমাত্র "বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য তৈয়ারী করা বা অর্থের বিনিময়ে কাজ করা"-কেই উৎপাদন বলা যাইতে পারে। সমাজে প্রচলিত অর্থের (Money) দ্বারা যে-সব কাজের হিসাব লওয়া সম্ভব নয়, অথবা যে সকল কাজের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য সমাজের বিনিময়-ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে না, তাহাকে উৎপাদন বলা চলে না। চাষীর নিজের ব্যবহারের জন্য ধান উৎপাদন, শিক্ষক কর্তৃক নিজের পুত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষা দান—নিজের ব্যবহারের জন্য তাঁতীর বস্ত্র বয়ন এই ধরনের কাজকে আজকাল ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন বলে না, (জাতীয় আয় পরিমাপের সময়েও সময়েও তাহা গণনায় আসে না)। কারণ সমাজের বিস্তৃত বিনিময়-কাঠামোর মধ্যে ইহারা সরাসরি প্রবেশ করে না এবং অর্থের হিসাবে ইহাদের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

দ্রব্য-কার্যাদির আর্থিক মূল্য-সৃষ্টি করা

উৎপাদনের উপাদান (Factors of Production)

যে-সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদি উৎপাদন-ধারায় ব্যবহৃত হয়, ধনবিজ্ঞানীরা উহাদের চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীকে এক একটি উপাদান বলিয়া থাকেন। সাধারণভাবে চলিত প্রথা অনুযায়ী উৎপাদনে ব্যবহৃত দ্রব্য ও কার্যাদিকে জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন, এই চারিটি উপাদানে বিভক্ত করা হইয়াছে।

উৎপাদন-ধারায় ব্যবহৃত, প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত, সকল কিছুকে জমি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; যেমন, ভূপৃষ্ঠ, উর্বরতা, বাতাস ও জলের গুণ, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি। শ্রম বলিতে বোঝা যায় মানুষের সকল প্রকার পরিশ্রম শারীরিক বা মানসিক, যাহা অর্থের বিনিময়ে করা হয়। জমি ও শ্রম—ইহারাই আদি উপাদান, ইহাদের হইতে প্রাপ্ত তৃতীয় উপাদান হইবে মূলধন। মানুষের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া যে-সকল দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে ভোগকার্যে ব্যবহৃত না হইয়া উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাদের মূলধন বলা হয়, যেমন

যাহারা আর্থিক মূল্য সৃষ্টিতে নিযুক্ত হয় তাহারাই উপাদান

যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, আধা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী, যাহা অতীতকালের জমি ও শ্রমের মিলিত ফল হিসাবে বর্তমানে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছে (physical embodiment of past land and past labour)। জমি, শ্রম ও মূলধনকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে একত্রিত করিয়া উহাদের সাহায্যে উৎপাদনের কাজকর্ম করানো, তাহাকে সংগঠন বলে।

সমাজের সকল উপাদানের উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ কিন্তু বাস্তব জগতে উৎপাদক-উপাদানসমূহের সম্মিলনের জটিল প্রকৃতি প্রকৃতভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। কোন একটি উপাদানের সমস্ত ইউনিট এক ধরনের হয় না, ইহাদের মধ্যে সর্বসমতা নাই। ইউনিটগুলির কাজের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন যে জমির উপর গৃহ নির্মাণ হয় এবং যে-জমি হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয় ইহারা সকলে ঠিক একই ধরনের কাজ করে না; ইহাদের উৎপাদন-ধারায় সাহায্য করিবার প্রকৃতি ও পরিমাণে পার্থক্য আছে। সকল চাষের জমির উর্বরতা শক্তি যেমন সমান নহে, সকল খনিজ দ্রব্য বহনকারী জমির সম্পদ্-সম্ভারও সমান নয়। শ্রমের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক শ্রমে পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও, দক্ষতার পার্থক্যের দরুন সকল শ্রমকে এক শ্রেণীভুক্ত করা বিজ্ঞানসম্মত বলা চলে না।

এক উপাদানের সকল ইউনিট উৎপাদন-ধারায় সমান কাজ করে না

বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও খুব গভীর নহে। যেমন, যোগানের সীমাবদ্ধতা ভূমির একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু স্বল্পকালীন হিসাবে বহু যন্ত্রপাতির যোগানও সীমাবদ্ধ। সময় পাইলে যেরূপ মূলধনের যোগান কিছুটা বাড়ানো যায়, সেরূপ উপায়ে ভূমির যোগানও কিছুটা বাড়ানো সম্ভবপর। ভূমি ও মূলধনের পার্থক্যকে তাই মৌলিক বলা চলে না। মূলধন ও শ্রমের পার্থক্যও মৌলিক নয়, কারণ মূলধন হইল অতীত শ্রমেরই ফল—'জমাট বাধা শ্রম' (congealed labour)। যেমন মূলধন শ্রমেরই ফল, তাই ইহাকে সম্পূর্ণ পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়।

পারস্পরিক পার্থক্য বেশি নহে

সংগঠন একটি বিশেষ ধরনের শ্রম মাত্র। প্রত্যেক শ্রমিকের মধ্যে দক্ষতা, বুদ্ধি ও সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে এবং দৈনন্দিন উৎপাদন-ধারায় উহাদের প্রয়োগও করিতে হয়। উৎপাদন-ধারার ঝুঁকি কিছুটা শ্রমিকও বহন করে, তাহাকে বেকার হওয়ার বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহন করিতে হয়।

সুতরাং আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্বশেষ বিশ্লেষণে শুধু দুইটি উপাদানকেই আদি উপাদান বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব। প্রকৃতি ও মানুষ, একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করিয়া উৎপাদন-কার্য চালাইতেছে, কারণ মূলধন হইল শ্রম ও প্রকৃতির মিলিত ফল এবং সংগঠন একটি বিশেষ ধরনের শ্রম মাত্র।

ইহা সত্ত্বেও আলোচনার সুবিধার জন্য উপাদানসমূহকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। এইরূপ শ্রেণীবিভাগের আরও বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ প্রত্যেক উপাদানের পারিশ্রমিক নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং তাহাদের প্রকৃতি কিছুটা পৃথক।

ফার্ম কাহাকে বলে ও উহার প্রকৃতি (What is firm and the nature of a Firm)

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে যাহারা সমাজে উৎপাদন ও বিক্রয়েব কাজ করে তাহাদের ফার্ম বলে। জমি, শ্রম, মূলধনকে কোন-না-কোন রূপে একসঙ্গে সংযুক্ত করিয়াই উৎপাদন সম্ভব, উৎপন্ন দ্রব্য তাই প্রকৃতপক্ষে তিনটি উপাদানের মিলিত ফল। জমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্র করিয়া উৎপাদন-কার্য চালানোর কাজ কোন ব্যবসায়ী একা বা কয়েকজন মিলিত হইয়া করিয়া থাকেন। সংগঠনের এই কাজ যে-করে ধনবিজ্ঞানে তাহার নাম হইল ফার্ম। এই ফার্মটি আজকাল সকল উৎপাদন সংগঠন ও পরিচালনা করে। ফার্মের আয়তন বা মাত্রা বৃদ্ধি বলিলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বোঝা যায়। জমি, শ্রম ও মূলধনের চাহিদা এই ফার্ম হইতে সৃষ্টি হয়, ফার্মই উপাদানসমূহের সম্মিলন করায়, উৎপাদনের ব্যয় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দামেব মধ্যে সমতা সাধনের চেষ্টা করে। সুতরাং ফার্মের গঠন, আকৃতি ও কাজকর্ম সমাজের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। সমাজে উৎপাদন কাঠামোর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা জুড়িয়া রহিয়াছে বিভিন্ন দ্রব্য-উৎপাদনকারী বিভিন্ন আকৃতির ফার্ম। কোন ফার্ম অতি ক্ষুদ্র, যেমন কৃষিকার্য বা মুদির দোকান; কোন ফার্ম অতি বৃহৎ, যেমন টাটা আয়রণ ওয়ার্কস্। ইহাদের মধ্যে পরিচালন যোগ্যতার পার্থক্য থাকিতে পারে, সহায়-সম্পদ ও শক্তির তারতম্য থাকে, কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য হইল উৎপাদন এবং লক্ষ্য হইল মুনাফা করা। ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় কমাইয়া অথবা বাজারের দামকে প্রভাবান্বিত করিয়া সর্বোচ্চ মুনাফাব লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ইহারা আকৃতি ও উৎপাদনেব পরিমাণে পরিবর্তন সাধন করে এবং ভারসাম্যাবস্থায় পৌছিতে চেষ্টা করে, যে-অবস্থায় পরিবর্তনের দিকে আর ঝোঁক থাকে না। কোন শিল্পে শুধু

ফার্ম কি?

একটিমাত্র ফার্ম থাকিতে পারে।* বাজারে দ্রব্যের চাহিদা এবং শিল্পের অন্তর্গত ফার্মসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া এই ফার্ম উৎপাদনের চাহিদা করে, উৎপাদনের পরিমাণ ও দ্রব্যের দাম নির্ধারণের চেষ্টা করে।

একটি শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মই যে ঠিক একই দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা নহে ; প্রত্যেকের কিছুটা নিজস্বতা থাকে (পরিচালনার ব্যাপারে, উৎপাদন-পদ্ধতি অথবা কাঁচামালের ব্যাপারে)। এই নিজস্বতা প্রত্যেকের দ্রব্যটিকেই পৃথক ও বিশেষ ধরনের করিয়া রাখে। কখনও এই পার্থক্য খুবই কম, কিন্তু ক্রমেই বিভিন্ন ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এই পৃথকীকরণ বাড়িয়া চলিতেছে, যাহার ফলে একটি ফার্মের সহিত অন্য ফার্মের প্রতিযোগিতা আর প্রত্যক্ষ ও সরাসরি হয় না ; প্রত্যেক ফার্মই ক্রমে যেন এক একটি শিল্পে পরিণত হইতেছে (যেমন সাবান-শিল্পে লাক্স, হামাম এবং মার্গো সাবান ক্রমেই পৃথক দ্রব্যে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করিতেছে)।

উপাদানের সম্মিলন

একটি ফার্ম ঠিক কিভাবে বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলন করিবে তাহা নির্ভর করে কিছুটা যন্ত্র-সম্পর্কীয় (technical) এবং কিছুটা অর্থ নৈতিক (economic) বিচার-বিবেচনার উপর। ঠিক কি-পদ্ধতিতে উপাদানসমূহের সম্মিলন হইবে তাহা প্রধানত যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন-কৌশলের দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু সেই পদ্ধতি স্থির হইয়া গেলে কোন উপাদান কতখানি ব্যবহার করা হইবে তাহা অর্থ নৈতিক বিচারের দ্বারা স্থির হয়। যে উপাদানের দাম কম, তাহা অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া বেশি দামী উপাদান কম প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়, যাহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক মুনাফা লাভ করিতে পারে।

ফার্মের তত্ত্ব (Theory of the Firm)

ধনবিজ্ঞানে ফার্মের তত্ত্ব আলোচনায় ধরিয়া লওয়া হয়, ইহা সর্বদা সর্বোচ্চ মুনাফা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কোন ভোগকারী ব্যক্তি সর্বদা সর্বোচ্চ তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে—একমাত্র ইহা স্বীকার করিয়াই তাহার কার্যের বিশ্লেষণ করা সম্ভব। সেইরূপ ফার্মগুলি সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের চেষ্টা করে, উহাই তাহাদের পিছনে প্রেরণা ও পরিচালনা-শক্তি—ইহা না ধরিয়া লইলে উৎপাদনের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বহু কারণে কোন ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফা না চাহিতে পারে

* পরে দেখা যাইবে, ইহাদের পূর্ণ প্রতিযোগিতা, অলিগোপলি ও একচেটিয়া বলে।

অথবা লাভ না করিতে পারে। পাঁচটি কারণের দ্বারা ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়ার ইচ্ছা বা ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রথমত, কোন ব্যবসায়ী হয়তো সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতে চায়, সবচেয়ে বেশি মুনাফা চায় না, কেহ হয়তো বেশি ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিলে বা বেশি বিক্রয় করিতে পারিলেই সুখী; মুনাফা সর্বোচ্চ হইল কিনা তাহা দেখে না। কোন ব্যবসায়ী আলস্য বা উদাসীনতার দরুন তাহার পরিচালন-যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার করে না। তাই ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গী কম গুরুত্বের বিষয় নহে। অনেক ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ প্রধান প্রেরণার বিষয় নয়।

পাঁচটি কারণে ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফালাভের ইচ্ছা বা ক্ষমতা না-ও থাকিতে পারে

দ্বিতীয়ত, সমাজের প্রচলিত আইন-কানুন, প্রথা ও রীতিনীতির বাধানিষেধ মানিয়া ফার্মকে ব্যবসায় করিতে হয় বলিয়া অনেক সময় সে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করিতে পারে না। যেমন, প্রতি সপ্তাহে শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা নির্দিষ্ট আছে, ছুটির দিন স্থির করা আছে। শ্রমিকসংঘ, মালিকসংঘ এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট বাধানিষেধ মানিয়া ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে উৎপাদন করিতে পারে না—এইরূপ অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব।

তৃতীয়ত, অনেক সময় যন্ত্রপাতির নির্দিষ্ট আয়তন ও প্রকৃতি সর্বোচ্চ মুনাফা লাভে বাধা দেয়। সর্বোচ্চ স্তরে মুনাফা পাইতে হইলে যে-পরিমাণ উৎপাদন করা দরকার যন্ত্রপাতির প্রকৃতিই এইরূপ যে, ঠিক সেই পরিমাণ উৎপাদন করা চলে না—অনেক ক্ষেত্রে এই রকমের বাধা থাকে। যেমন, কোন ফার্মে আরও 2000 গজ কাপড় উৎপাদন করা দরকার, বিক্রয়ের বাজার আছে, মুনাফাও বাড়িয়া সর্বোচ্চ হইবে। কিন্তু হয়তো ঠিক ওই পরিমাণ উৎপাদন বাড়াইবার উপযোগী যন্ত্র নাই, এমন আয়তনের যন্ত্র বাজারে পাওয়া যায় যাহাতে উৎপাদন 2000 গজের বেশি হয় (এমন অবস্থায় যন্ত্রের কিছুটা অব্যবহৃত থাকিয়া যায়) অথবা 2000 গজের কম হয়। কোন অবস্থাতেই সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করা সম্ভব হইল না। অথবা ঠিক ওই আয়তনের যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়া লইতে কিছুটা সময় লাগিতে পারে, স্বল্পকালে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ নাও হইতে পারে। দীর্ঘকালে দ্রব্যের চাহিদা পরিবর্তন হইল, তাই তখনও তাহা সম্ভবপর হইল না, এইরূপ ঘটিতে পারে।

চতুর্থত, বাস্তবক্ষেত্রে, ফার্ম জানে না তাহার দ্রব্যের চাহিদা ভবিষ্যতে কি থাকিবে; তাহা জানিতে পারিলে মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে উঠানো সম্ভব হইত ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও অজ্ঞানতার দরুন ইহা সম্ভব হয় না।

পঞ্চমত, স্বল্পকালীন স্বার্থ ও দীর্ঘকালীন স্বার্থে বিরোধ থাকে। যেমন স্বল্পকালে অতিরিক্ত দাম বাড়াইলে ভবিষ্যতে ফার্মের বদনাম হইবার ভয় থাকে। ভবিষ্যতে মুনাফা কমিবে, তাই অনেকে সুদূর ভবিষ্যতে মুনাফা করার বা ব্যবসায়ে টিঁকিয়া থাকার আসায় স্বল্পকালে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের চেষ্টা করে না। এই সূত্রে অধ্যাপক হিক্‌স দুই ধরনের ফার্মের কথা বলিয়াছেন: যে কোনমতে ব্যবসায়ে লাগিয়া থাকে (sticker) এবং যে ছিনাইয়া লইতে চাহে (snatcher)।

ধনবিজ্ঞানে ধরিয়া লওয়া হয় যে, ফার্মগুলি এই সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকিয়াই সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের উৎপাদন সংক্রান্ত কাজকর্ম চালায় এবং যতটা সম্ভব এই সকল বাধানিষেধ ও সীমাবদ্ধতা দূর করার চেষ্টা করে।

উৎপাদন সূত্র তাহাতে রদবদল (Production-Function & its variations)

উৎপাদন-ধারায় উপাদানসমূহের যে সম্মিলন (combination of factors) থাকে তাহাকে অনেক সময় উৎপাদন-সূত্র (production formula) বা উৎপাদনকারণ (production function) বলা হয়। যেমন 10টি দ্রব্য উৎপাদন করিতে একাধিক উৎপাদন-সূত্র থাকিতে পারে। যদি A, B ও C এই তিনটি উপাদান আমরা ধরিয়া লই তাহা হইলে 3A+1B+2C অথবা 1A+3B+1C এই উভয় সূত্র দ্বারাই 10টি দ্রব্য উৎপাদন করা চলে, এইরূপ প্রত্যেক উপাদান-সম্মিলনকে একটি উৎপাদন-সূত্র বলা চলে। উপাদান-সম্মিলনে কোন উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া বা কোনটি কমাইয়া উৎপাদনের পরিবর্তন করা হয়। আজকাল বহু প্রকার জটিল যন্ত্র প্রচলনের ফলে উৎপাদন-এন্‌জিনীয়ারিং বিজ্ঞানের এরূপ উন্নতি হইয়াছে যে, কি-পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদনে সঠিক কোন্ সূত্রটি প্রযোজ্য তাহা মোটামুটি নির্দিষ্ট আছে এবং ফার্মগুলির উপাদানের রদবদলের স্বাধীনতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবুও এখনও উপাদান সম্মিলনের রদবদল করিয়া উৎপাদনের পরিমাণে কিছুটা পরিমাণে কিছুটা পরিবর্তন করা প্রায় সকল শিল্পেই অনেক পরিমাণে সম্ভব।

উৎপাদন-সূত্র ও উপাদানসমূহের আনুপাতিক পরিবর্তন

যদি একটি উপাদানকে স্থির রাখিয়া অপর সকল উপাদানের প্রয়োগ বাড়ানো যায়, তবে একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিয়া

আসিবে। ইহাকে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) বলা হয়।

যদি নির্দিষ্ট অনুপাতে সকল উপাদানকে একই সঙ্গে বাড়ানো হয় তবে উপাদান বৃদ্ধির হার অপেক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধির হার অধিক হইতে পারে। উহাকে বলা হয় ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Increasing Returns)।

যদি একটি নির্দিষ্ট হারে উপাদানসমূহ বৃদ্ধি হইলে উৎপাদনও একই হারে বাড়িতে থাকে, তবে তাহাকে বলা হয় সমহার-প্রতিদানের নিয়ম (Law of Constant Returns)।

উৎপাদনের পরিমাণের উপর প্রভাববিস্তারকারী সাধারণ বিষয়সমূহ
(General factors influencing the volume of production)

দেশে সকল প্রকার দ্রব্য ও কার্যাদির মোট উৎপাদনের পরিমাণ বহু প্রকার বিষয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

প্রথমত, দেশে উপকরণের যোগানের উপর মোট উৎপাদন নির্ভর করে। জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ, দেশের জনসংখ্যা ও তাহাদের কাজ করিবার শক্তি, মূলধনের পরিমাণ—এই সকল বিষয় মোট উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, কৃষি ও শিল্পে উহার সার্থক প্রয়োগ, উৎপাদন-কৌশলের (Technique of production) উন্নতি, শ্রমিকদের মধ্যে কারিগরী জ্ঞানের স্তর ইহারা মোট উৎপাদনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তৃতীয়ত, দেশের যানবাহন ব্যবস্থা, ঋণব্যবস্থার সুবিধা ও প্রসার, ব্যাঙ্ক ও বীমার প্রসার ইত্যাদি উৎপাদনের পরিমাণকে প্রভাবান্বিত করে।

চতুর্থত, রাষ্ট্রের মনোভাব ও সাহায্যের উপর দেশের কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতি ও উৎপাদনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে। কর-ব্যবস্থা, শিল্পেঋণ পাইবার ব্যবস্থা, শ্রমিক ও ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত আইন-কানুন উৎপাদনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আজকাল অনেক দেশে বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে রাষ্ট্র উৎপাদনের গতি ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করিতেছে।

পঞ্চমত, প্রাকৃতিক কারণসমূহকে অগ্রাহ্য করা চলে না। দেশের জলবায়ু, আবহাওয়া, জমি, পর্বত, নদী ও সমুদ্রের তীররেখা (coast line) প্রভৃতি সাধারণভাবে দেশের উৎপাদনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকম্প ও ঝড়ের ফলে উৎপাদন কমে, দেশে পর্যাপ্ত সুষম বৃষ্টিপাত হইলে উৎপাদন বাড়ে। যুদ্ধবিগ্রহ, আণবিক বোমা বিস্ফোরণ, তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকীরণ প্রভৃতি বিষয় বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের উৎপাদন কমাইয়া দিতে পারে।

4

ভূমি (Land)

সংজ্ঞা (Definition)

উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রকৃতির সকল প্রকার দানকে ভূমি বলা হয়। ভূমির যে শক্তি কৃষিকার্যে বা অরণ্য-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, যেমন খনিজ-পদার্থ, জলশক্তি, নৌকা বা জাহাজ চলাচলের উপযোগী জলের উপরিভাগ, নদী ও সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ সকল কিছু, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সকল কিছুই ভূমি। যে-সকল আদি সম্পদ মানুষের শ্রম ছাড়াই উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে এবং মানুষের সম্পদ উৎপাদনে সহায়তা করিতেছে, সেই সকল দ্রব্যকেই ধনবিজ্ঞানে ভূমি বলিয়া অভিহিত করা হয়। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায়, ভূমি হইল "the materials and the forces which nature gives freely for man's aid in land and water, in air and light and heat."

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ ভূমিকে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ বলিয়া মনে করিতেন এবং অন্যান্য উপাদানের তুলনায় ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতেন। প্রথমত, ভূমির আয়তন সীমাবদ্ধ। মানুষ ইচ্ছা করিলে প্রকৃতি দানকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না ; ইহার যোগান প্রকৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট। ইহার অন্যতম তাৎপর্য হইল, ভূমির উপর মালিকানা একচেটিয়া মালিকানার সমান। ভূমিজাত দ্রব্যের দাম যদি বাড়িয়া যায়, তবে ভূমির মালিকদের অতিরিক্ত আয় হইবে, কারণ ভূমির যোগান আর বাড়ানো সম্ভব নহে। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতি ইহা মানুষকে দান করিয়াছে, ইহার জন্য মানুষের কোন ব্যয় করিতে হয় নাই। সুতরাং ইহার কোন উৎপাদন-ব্যয় নাই। তৃতীয়ত ভূমির কতকগুলি শক্তি আছে যাহা আদি এবং অক্ষয়, বারবার উৎপাদন করিলেও সে শক্তির ক্ষয় নাই। রিকার্ডো ইহাকে বলিতেন 'ভূমির আদি ও অক্ষয়' শক্তি। চতুর্থত, ভূমি একজাতীয়া নহে (not homogeneous), ইহা বহুজাতীয়া (heterogeneous)। কোন জমিতে ধান হয়, কোন জমিতে গম হয় ; কোথাও হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয়, কোন জমি গৃহ বা কারখানা নির্মাণের কার্যে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ বাহ্য প্রভেদ ছাড়াও জমির বিভিন্ন খণ্ডে উর্বরতা-শক্তির তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও ভূমির উর্বরতা বেশি, সেখানে ব্যয় অপেক্ষা উৎপন্নের মূল্য অধিক, সে সকল ভূমিকে উর্ধ্ব-প্রান্তিক বা প্রান্তোর্ধ্ব

ভূমির বৈশিষ্ট্য
১। যোগান সীমাবদ্ধ
২। উৎপাদনের ব্যয় নাই, ৩। আদি ও অক্ষয় শক্তি, ৪। বহুজাতীয়
৫। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম

(Intra-marginal) ভূমি বলা হয়। কোন ভূমিতে উৎপন্নের মূল্য উহার ব্যয়ের সমান, তাহাকে প্রান্তিক ভূমি (Marginal Land) বলা চলে। যদি ব্যয় হইতে উৎপাদনের মূল্য কম হয়, তবে তাহাকে নিম্নপ্রান্তিক বা প্রান্ত-নিম্ন-ভূমি (Sub-marginal Land) বলা হইয়া থাকে। ভূমিজাত দ্রব্যের দাম কমিলে, উর্ধ্ব-প্রান্তিক জমি প্রান্তিক ও নিম্ন-প্রান্তিক জমিতে পরিণত হয়। সর্বশেষে, ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মনে ভূমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মাধীন।

ভূমির এই বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য জমির খাজনা ও জনসংখ্যা সম্পর্কীয় তত্ত্বগুলি এইরূপে উদ্ভব হইয়াছে। ভূমির যোগান যদি সীমাবদ্ধ না হইত অথবা বিভিন্ন জমির মধ্যে যদি তারতম্য না থাকিত তবে খাজনা-তত্ত্ব ভিন্নরূপ হইত। ভূমি হইতে উৎপাদন যদি ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম মানিয়া না চলিত, তবে রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব বা ম্যালথাসের জনসংখ্যা সম্পর্কীয় তত্ত্ব সম্পূর্ণ অন্য ধরণের হইত।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ অন্যান্য উপাদানের তুলনায় ভূমির এই সকল বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে চাহেন না। ভূমির ন্যায় সকল দ্রব্যই তাহাদের সর্বপ্রাথমিক অবস্থাতে নিশ্চয়ই প্রকৃতিরই দান, ভূমি একা এই বৈশিষ্ট্য দাবী করিতে পারে না। ভূমির যোগান ভৌগোলিক ভাবে সীমাবদ্ধ হইলেও ইহার কার্যকরী যোগান (effective supply) কৃত্রিম সারের সাহায্যে বাড়ানো সম্ভবপর। ভূমির উৎপাদন ব্যয় নাই ইহা বলাও ঠিক নহে, কারণ ভূমিকে উৎপাদনের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে বহু শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বিশ্লেষণের সময় স্বল্পকাল বিবেচনা করিলে অন্যান্য উপাদানের যোগান (বিশেষ করিয়া, যন্ত্রপাতির) জমির যোগানের ন্যায়ই অস্থিতিস্থাপক (অর্থাৎ দাম বাড়িলেও যোগান তত বেশি বাড়ে না)। তাহা ছাড়া, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানেরনিয়ম যে শুধু ভূমির ক্ষেত্রে দেখা যায় তাহা নহে, অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns)

ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি প্রধান ও মৌলিক নিয়ম হইল ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম। এই নিয়মের গুরুত্ব এত বেশি যে Cairnes বলিয়াছেন যে এই নিয়মটি না-থাকিলে "the science of political economy would be as completely revolutionised as if human nature were altered."

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে ভূমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান প্রতি-দানের নিয়ম মানিয়া চলে। সাধারণ কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা

হইতে এই নিয়মের উৎপত্তি হইয়াছে বলা হয়। এই নিয়মানুসারে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন কৌশল ও পদ্ধতি স্থির ধরিয়া লইয়া যদি শ্রম ও মূলধন ক্রমে বাড়ানো যায় তাহা হইলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পাইবে। যে-হারে শ্রম ও মূলধন বাড়ানো যাইতেছে উৎপাদন ঠিক সেই হারে বৃদ্ধি পাইবে না, উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমে কমিয়া আসিবে। অধ্যাপক বেন্‌হামের ভাষায় বলিতে গেলে "The Law of Diminishing Returns realy states how output would vary if the proportions of the factors were altered at a given moment, and this rules out any changes in knowledge."*

নিয়মের ব্যাখ্যা

মনে করা যাক্ নির্দিষ্ট এক বিঘা জমিতে 5 টাকার শ্রম ও মূলধন প্রয়োগের ফলে 3 মণ শস্য উৎপন্ন হইতেছে। যদি সেই জমিখণ্ডে শ্রম ও মূল ধন দ্বিগুণ করা যায় তাহা হইলে প্রথমে উৎপাদন হইল মোট 10 মণ। কিন্তু ক্রমে উৎপাদনের বৃদ্ধি এমন এক স্তরে আসিয়া পড়িবে, যাহার পরে শ্রম ও মূলধনের প্রয়োগ আরও বৃদ্ধি করিলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিতে থাকিবে। যদি, 10 টাকার স্থলে 20 টাকার শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদন দ্বিগুণ না হইয়া তাহা অপেক্ষা কম, যেমন 16 মণ হইবে। আরও 10 টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে উৎপাদন মাত্র 4 মণ বৃদ্ধি পাইয়া 20 মণ হইবে। এইরূপে দেখা যাইবে যে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু সেই বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান। সর্বোন্নত (optimum) স্তরের পরেও উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিলে ভূমি হইতে প্রতিদান ক্রমশ হ্রাস পায়। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় "An increase in capital and labour applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of produce raised unless it happens to coincide with an improvement in the arts of agriculture."

উদাহরণ

ভূমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম দুইটি উপায়ে কার্যকরী হয়।

---

* *Benham*, Economics Pp. 122-23

নীচে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান সম্পর্কে বর্তমানকালের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হইল "The Law of Diminishiug Returns really states that there is a limit to the extent to which one factor of production can be substituted for another, or in other words, that the elasticity of substitution between factors is not infinite." *Mrs. Joan Robinson, Economics of Inperfect Competition, P. 330.*

উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে চাষী ক্রমশ অনুর্বর জমি চাষ করিতে শুরু করে, সুতরাং শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া ক্রমশই তাহা হইতে হ্রাসমান প্রতিদান পাইতে থাকে। ইহাকে বলা হয় ব্যাপক চাষ (extensive cultivation)। ইহা ব্যতীত, একই জমিতে বারবার শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক নিয়োগ (marginal doses) হইতে ক্রমশ প্রতিদান হ্রাস পায়। এইরূপ চাষকে বলা হয় প্রগাঢ়-কর্ষণ (intensive cultivation)।

ব্যাপক চাষ ও প্রগাঢ়-কর্ষণ

এই নিয়ম উৎপাদনের পরিমাণের উপর প্রযোজ্য কিন্তু উহার দামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের কারণ ভূমির উর্বরতাশক্তির হ্রাস নহে; উর্বরতাশক্তি সমান আছে ইহাই ধরিয়া লওয়া হইতেছে। এই নিয়মের পিছনে কারণ উপাদান-সম্মিলনে বিভিন্ন উপাদানের নিয়োগের অনুপাতে পরিবর্তন। উপাদান-সম্মিলনে কোন একটি উপাদান নির্দিষ্ট রাখিয়া অপরাপর উপাদানগুলির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিলে পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির উৎপাদন শক্তি ক্রমশ কমিয়া আসে (Diminishing Productivity of a factor)। অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া কোন উপাদানের এক ইউনিট বেশি নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা সেই উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন-শক্তি (Marginal Productivity) মোট উৎপন্নের পরিমাণকে সেই উপাদানের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে সেই উপাদানের গড় উৎপাদন-শক্তি (Average Productivity) পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট কোন উপাদানের সহিত পরিবর্তনীয় উপাদানের নিয়োগ ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিলে সেই পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-শক্তি ক্রমশ কমিতে থাকে।* ইহার ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিয়া আসে এবং ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের কার্যকারিতা চলিতে থাকে।

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের ফলে উৎপাদনের ইউনিট-প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি পায় ; এই

If the quantity of one productive services is increased by equal increments, the quantities of the other productive services remaining fixed, the resulting increments of product will decrease after a certain point." *Stigler*, Theorp of price, P. 116.

* ইহার কারণ হইল, সর্বোন্নত উপাদান সম্মিলনের পরে (Optimum combination of factors) পরিবর্তনীয় উপাদানের কোন ইউনিটের দক্ষতা আর পূর্বের ন্যায় প্রকাশ পায় না। কোন উপাদানের পরিবর্তে উহা ব্যবহৃত হইতেছিল, কিন্তু একটি উপাদান অপর একটি উপাদানের নিখুঁত পরিবর্ত-দ্রব্য কখনই হইতে পারে না। মিসেস রবিন্সনের ভাষায় বলা চলে, উপাদানগুলির পারস্পরিক পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতা 1 হইতে কম (The elasticity of substitution between factors is less then one)।

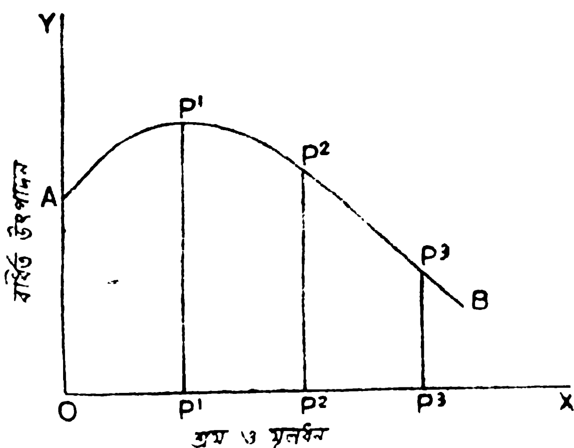
নিয়মকে তাই ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়ের নিয়মও বলা যাইতে পারে। যেমন,

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়

প্রথমে 5 টাকা ব্যয়ে 3 মণ ধান উৎপাদন হইতেছিল, মণ-প্রতি উৎপাদন ব্যয় ছিল 1·66 প.। পরবর্তীবারে 10 টাকা ব্যয়ে 10 মণ ধান উৎপন্ন হইলে, প্রথমে মণ-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া গেল; 1 টাকা হইল। ইহার পরেও শ্রম ও মূলধন বাড়াইলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় শুরু হইল; যেমন 20 টাকা ব্যয়ে 16 মণ উৎপাদন, ফলে মণ প্রতি ব্যয় 1·25প.; 30 টাকা ব্যয়ে 20 মণ উৎপাদন, ফলে মণ-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া হইল 1 50প.।

রেখা-চিত্রের সাহায্যে এই নিয়মটিকে প্রকাশ করা চলে। নিম্নের চিত্রে OX রেখা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের পরিমাণ প্রকাশ করিতেছে এবং OY রেখাতে বর্ধিত উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হইতেছে। OP^1 পর্যন্ত শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ উৎপাদন বাড়ায়, তাহার পরে ইহার পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসে। OP^1-র পরে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ক্রমহ্রাসমান হারে।

এই নিয়মের দুইটি স্বীকার্য বিষয় (assumptions) আছে যাহা ধরিয়া লইলে এই নিয়মটি কার্যকরী হইবে। প্রথমত, যদি জমি পূর্ববর্তী চাষের সময়ে যথোপযুক্তভাবে কর্ষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরবর্তীকালে শ্রম ও



মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার না কমিয়া বাড়িয়া যাইতেও পারে; দ্বিতীয়ত, যদি কৃষির উৎপাদন-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কৌশল ও দক্ষতা ও উন্নত হইয়া উঠে এবং জমিতে উহাদের প্রয়োগ হয় তাহা হইলে এই নিয়ম

কার্যকরী হইবে না। উন্নত যন্ত্রপাতি ও কৌশলের প্রয়োগ উৎপাদনের পরিমাণকে তৎক্ষণাৎ বাড়াইয়া দিবে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ধিত স্তরেও শ্রম ও মূলধনের বারবার প্রয়োগ এই নিয়মকে কার্যকরী করিবে। যদি ইহাদের উন্নতি হয় তবে উৎপাদনের রেখা ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাইবে বটে, কিন্তু ইহার আকৃতি একই থাকিবে, অর্থাৎ অধিক উৎপাদনের স্তরেও, শ্রম ও উন্নত ধরনের মূলধনের ক্রমশ অধিকতর প্রয়োগের ফলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইবার ঝোঁক থাকিবে।

দুইটি স্বীকার্য বিষয়

ধনবিজ্ঞানশাস্ত্রের ইতিহাসে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত এই ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হইত। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের ন্যায় অবিচল ও অমোঘ এই নিয়ম সদাসর্বদা মানুষের অর্থ নৈতিক জীবন ও সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের এইরূপ ধারণা ছিল। এই নিয়ম মানিয়া লইলে বলা চলে যে, মানুষ যতই বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও প্রয়োগ করুক না কেন, সে কখনও প্রকৃতির অন্ধ শক্তিকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে পারিবে না। এই নিয়ম এক অপ্রাকৃত শক্তির অমোঘ ইচ্ছা, মানুষ এই 'অদৃশ্য হাতের' ('The Invisible Hand') ক্রীড়নক মাত্র। প্রাকৃতিক শক্তি ও নিয়মের কার্যকারিতা মানুষ সাময়িকভাবে ঠেকাইতে পারে মাত্র, ইহাকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করিতে পারে না। মার্শালের ভাষায় বলিতে গেলে, "This tendency to a diminishing return was the cause of Abraham's parting from Lot, and of most of the migrations which history tells. Were it not for this tendency every farmer could save nearly the whole of his rent by giving up all but a small piece of his land and bestowing all his capital and labour on that."

পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম এবং ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (The Law of Variable Proportions and the Law of Diminishing Returns)

আধুনিক ধনবিজ্ঞানে বলা হয় যে, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কেবল জমি হইতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নহে, শিল্পের উৎপাদনেও কার্যকরী হয়। যখনই কোন স্থির উপাদানের সহিত অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া উৎপাদন

বাড়াইতে হয়, তখনই এই নিয়মের প্রভাব শুরু হয়, শিল্পে বা কৃষিতে উভয় ক্ষেত্রেই ইহার কার্যকারিতা দেখা যায়।*

উৎপাদনের যে কোন শাখায়, শিল্পে বা কৃষিতে, যখনই কোন উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে তখনই উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রভাব দেখা যায়। টেকনিক্যাল বা অপর কারণে হয়তো কোন একটি উপাদানের যোগান বাড়ানো সম্ভবপর হইতেছে না; অথবা বাড়াইতে হইলে সেই উপাদানের নিকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ইউনিটগুলি প্রয়োগ করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় একটি উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অথবা সেই উপাদানের নিকৃষ্ট ইউনিটগুলিকে ক্রমাগত প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন বাড়ানো সম্ভবপর। কিন্তু এইরূপে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে উৎপাদন-ধারায় পরিবর্তনীয় উপাদানটির সহায়ক শক্তি বা প্রদান ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া আসিবে; ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাইবে। এই নিয়ম শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যন্ত্রের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অন্যান্য উপাদান ক্রমাগত বাড়াইলে শিল্প-ক্ষেত্রেও উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিয়া আসে।

স্থির উপাদান ও উহার ক্রমহ্রাসমান সাহায্য শক্তি

শ্রমের পরিমাণ বা সংগঠনের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অন্যান্য উপাদান ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে একই রূপ ঘটে। উপাদানের অনুপাত ও সম্মিলন ক্রমাগত পরিবর্তন করিলে প্রথমে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার বাড়িয়া যাওয়া ও পরে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিয়া যাওয়া—ইহাকেই পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম বলা হইয়া থাকে। এই ব্যাপক নিয়মের একটি অংশ হইল ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম।

উৎপাদন বাড়াইবার ফলে যখন বাজারে কোন উপাদানের যোগান কমিয়া আসে তখন তাহার দাম বাড়ে এবং উহা পাইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সেইরূপ অবস্থায় উদ্যোক্তা চেষ্টা করে যাহাতে সহজ প্রাপ্য এবং কম-দামী উপাদান বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া দুষ্প্রাপ্য ও বেশি-দামী উপাদান (উপাদান-সম্মিলন হইতে) বাদ দিতে পারে। অর্থাৎ সে উপাদান-সম্মিলন বদলাইবার চেষ্টা করে, দুষ্প্রাপ্য ও বেশি-দামী উপাদানের স্থলে উহার পরিবর্তে সহজ প্রাপ্য উপাদান

পরিবর্তন ও তাহার সীমা

* "The English classical economists considered this law in relation to agriculture. They said that if population increased more agricultural produce would be demanded. But the total output of land, they said, was fixed. Therdfore, as more men were employed in agriculture the average amount produced per man would tend to fall. For example, if twice as many men

বা কম দামী উপাদানের প্রয়োগ বৃদ্ধি করে। দুষ্প্রাপ্য উপাদানের পরিবর্তে সহজ-প্রাপ্য উপাদান ক্রমাগত ব্যবহার করিলে যদি উৎপাদনের ক্ষতি না হয়, তবে কোন উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ হইয়া তাহা স্থির উপাদানে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কারণ উদ্যোক্তা এইরূপ উপাদান-পরিবর্ততা চালাইয়া যাইতে থাকিবে। কিন্তু এই পরিবর্তনতার (substitution) সীমা আছে, কারণ এক উপাদান কখনই অন্য উপাদানের একেবারে নিখুঁত পরিবর্ত-দ্রব্য হইতে পারে না। মিসেস্ রবিন্‌সন বলেন যে, উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তনতার স্থিতিস্থাপকতা 1 হইতে কম। তাই ক্রমে উৎপাদনের নিপুণতা কমিতে থাকে এবং ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া চলে। উপাদান-পরিবর্তনতা (Factorial Substitution) অসীম কাল ধরিয়া চলিতে পারে না, কারণ ক্রমে উপাদান-সম্মিলন এমন স্তরে আসিয়া পড়ে যাহার পরে দুষ্প্রাপ্য উপাদানটি আর বাদ দেওয়া চলে না, উহাকে বাদ দিলে উৎপাদন পণ্ড হইয়া যায়, উৎপাদন-সূত্র গঠন করা যায় না। এইরূপ অবস্থায় সেই উপাদানটি স্থির উপাদান (fixed factor) হইয়া পড়ে। এই স্তরের পরে তাহার সহিত অন্যান্য উপাদান বৃদ্ধির দরুন ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান পাওয়া যায়। যে-উপাদানটির পরিবর্তনতা আর সম্ভব নহে তাহাকে বিশেষ-নির্দিষ্ট (specific) উপাদান বলে। এই বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদানের সহিত অন্যান্য উপাদানের প্রয়োগের ফলে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান হইয়া পড়ে। কত শীঘ্র ক্রমহ্রাসমান নিয়মের প্রভাব শুরু হইবে তাহা নির্ভর করে উপাদানের বিনির্দিষ্টতার মাত্রার (degree of specificity) উপর। জমির ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জমি হইল অধিক মাত্রার বিনির্দিষ্ট উপাদান (specific factor), যাহাকে উপাদান-সম্মিলন হইতে বাদ দিয়া অপর কোন উপাদানের দ্বারা উহার কাজ চালানো যায় না ; ফলে কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম অতি-শীঘ্র কার্যকর হইয়া থাকে। যে উৎপাদন-সূত্রে এইরূপ বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদানের পরিমাণ যত বেশি থাকিবে, সেইক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রতি-দানের নিয়ম তত শীঘ্র ও তীব্রভাবে কার্যকর হইবে।

বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদান. জমি প্রকৃত উদাহরণ

সীমাবদ্ধতা : এই নিয়মের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমত, এই নিয়ম ধরিয়া লয় যে, ইতিমধ্যে উৎপাদন-কৌশলে (technique of production)

were employed on land the total amoun of produce would be less then double. This tendency, they said, might be counteracted for a time by the progress of knowledge but it was always present."—*Benham*, Economics.

কোন পরিবর্তন হইবে না। নূতন কৌশলে নূতন উপাদান-সম্মিলনের প্রয়োজন হইবে, তাহাতে উৎপাদন-ধারায় কোন উপাদানের প্রদানক্ষমতা বাড়িয়া যাইতে পারে এবং ফলে এই নিয়মটি ঠিক সেই সময়ে কার্যকরী না-ও হইতে পারে। অবশ্য, সেই নূতন কৌশল অনুযায়ী উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে এই নিয়মের প্রভাব অবশেষে শুরু হইবে।

উৎপাদন-কৌশল স্থির থাকিবে এবং উপাদান সমূহ সম্পূর্ণ বিভাজ্য হইবে

দ্বিতীয়ত, ধরিয়া লওয়া হয় যে, কোন উপাদানকে অল্পমাত্রায় বাড়ানো বা কমানো সম্ভব। কিন্তু অনেক উপাদানের ক্ষুদ্র অংশ নিয়োগ করা চলে না বা অল্প একটু সরাইয়া আনা চলে না (যেমন বড় একটি যন্ত্র)। বাস্তবে এইরূপ অবিভাজ্য উপাদান থাকায় সঠিকভাবে উপাদানের পরিবর্ততা বা এক উপাদানের পরিবর্তে অল্পমাত্রায় অপর উপাদানের ব্যবহার (substitution of factors) করা চলে না।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম : বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ (The Law of Diminishing Returns : its application in different types of Productive activities)

যে-ক্ষেত্রে একটি উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ এবং সেই স্থির উপাদানের সহিত অন্যান্য উপাদান বাড়াইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়, সে-ক্ষেত্রে এই নিয়মটি নিশ্চয় কার্যকর হইবে।

খনির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ক্রমশই খাদের গভীরতর অংশ হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করিতে হয়, ক্রমশ অধিক শ্রমিক ও মূলধন প্রয়োগ করিলে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার কমিয়া আসে এবং ইউনিট প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অনেকে বলেন যে, খনিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের প্রভাব দেখা দেয়।

কিন্তু কেয়ার্নক্রসের অভিমতে সঠিকভাবে বিচার করিলে খনিতে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। জমি হইতে উৎপাদন চিরকাল আসিতে থাকিবে ; উহা হইতে বারবার অবিরত ধারায় উৎপাদন হইবে। কিন্তু খনির সম্পদ-সম্ভার আজ বা কাল ফুরাইবেই, জমির উর্বরতা শক্তির ন্যায় উহার চিরস্থায়িত্ব নাই। জমির পরিমাণ কম থাকায় অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগের দ্বারা ক্রমশ উহা হইতে উৎপাদন বাড়াইতে হয়, কিন্তু খনিজ সম্পদ আছে, উহা তুলিয়া আনিতে হইবে—ইহাই মাত্র সমস্যা। উহা জমির নিচে মজুত দ্রব্য, জমির উপরে তুলিয়া আনাই এক্ষেত্রে উৎপাদন। জমির ক্ষেত্রে যেমন একই শক্তির (উর্বরতার) বারবার ব্যবহার, খনিজ ক্ষেত্রে তাহা নহে। যদি ব্যয়ে পোষায় তাহা হইলে

তোলা হইবে, যদি ব্যয়ে না পোষায় তবে তোলা হইবে না। এই কারণে, তিনি খনিতে এই নিয়মের সঠিক ও সম্পূর্ণ কার্যকারিতা স্বীকার করেন না।

মৎস্যচারণ ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকরী হয়। ক্রমশই আরও গভীরে অথবা আরও দূরে গিয়া মাছ ধরিতে হয়, ফলে মণ-প্রতি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, গৃহ যতই উপরে উঠিতে থাকে, উপরতলার ঘরগুলি হইতে আয় কমে, নির্মাণের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

শিল্প ক্ষেত্রে, স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত স্থির যন্ত্রপাতির পরিবর্তন করা সম্ভব না হয়, ততদিন এই নিয়ম কার্যকরী হয়। দীর্ঘকালে, পরিচালনা শক্তি নিজেই স্থির উপাদানে পরিণত হয়, সুতরাং উৎপাদন আরও বাড়াইতে গেলে অবশেষে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের প্রভাব শুরু হয়।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের মূল কারণ কি? উপাদানের ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ক্ষমতা (Why Diminishing Returns? The Diminishing Productivity of a factor)

পরিবর্তনীয় উপাদানের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন-শক্তি ক্রমশ কমিয়া আসে

কোন উপাদানকে স্থির রাখিয়া যদি অন্যান্য উপাদানকে বাড়ানো যায় তাহা হইলে উৎপাদন ধারায় পরিবর্তনীয় উপাদানের সাহায্য করার ক্ষমতা বা উহার প্রদান ক্ষমতা ক্রমে কমিয়া আসিতে থাকে। অর্থাৎ যে উপাদানের নিয়োগ বাড়ানো হইতেছে তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমশ কমিয়া আসে।

জমির পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইলে কিভাবে শ্রমিকের

শ্রমিকের পরিমাণ	মোট ধান উৎপাদন, মণের হিসাবে	শ্রমিক-প্রতি গড় উৎপাদন, মণের হিসাবে	শ্রমিক-প্রতি প্রান্তিক উৎপাদন, মণের হিসাবে
1	50	50	50
2	160	80	110
3	285	95	125
4	400	100	115
5	500	100	100
6	582	97	82
7	630	90	48
8	656	82	26
9	656	প্রায় 73	0
10	650	64	—6

প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়, পূর্ব পৃষ্ঠার তালিকায় তাহা দেখানো হইয়াছে। জমির পরিমাণ 1 বর্গ মাইল ধরা হইয়াছে ; উহা স্থির উপাদান।

মোট উৎপন্ন দ্রব্যকে শ্রমিক-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে শ্রমিক-পিছু গড় উৎপাদনেব পরিমাণ পাওয়া যায়। 5 জন শ্রমিক পর্যন্ত গড উৎপাদন বেশি, তাহার পর উহা কমিয়া যাইতেছে।

একজন অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা শ্রমিকেব প্রান্তিক উৎপাদন। 4 জন শ্রমিক পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িতেছে। তাহাব পর উহা কমিয়া যাইতেছে।

1 হইতে 4 জন শ্রমিকের নিয়োগ পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান হারে উৎপাদন বাড়িতেছে। তাহার পর ক্রমহ্রাসমান নিয়োগের প্রভাব শুরু হইয়াছে। ইহার কারণ হইল যে, 1 জন, 2 জন, 3 জন বা 4 জন শ্রমিক ওই জমি ক্রমে আরো ভালভাবে চাষ করিতে পারায় প্রত্যেকটি শ্রমিক নিয়োগের ফলেই প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন বাড়িতেছে। কিন্তু 5 জনের বেশি হইলেই জমির নির্দিষ্টতাব দরুন শ্রমিকের প্রদান-ক্ষমতা কমিতেছে ; তাই মোট উৎপাদন-বৃদ্ধির হারও ক্রমহ্রাসমান। শ্রমিকের গড ও প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা উভয়ই কমিতেছে।

গড ও প্রান্তিক উভয় ব্যয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে

যখন উভয়ে বাড়ে, তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড হইতে বেশি (2 হইতে 4 পর্যন্ত) ; যখন উভয়ই কমে, তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড হইতে কম (6 হইতে 10 পর্যন্ত) স্নতবাং ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

"কোন উপাদান-সম্মিলনে যদি একটি উপাদানের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে, একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে প্রথমে সেই পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও পবে তাহার গড উৎপাদন-ক্ষমতা উভয় কমিতে থাকে ”

শ্রম

সংজ্ঞা (Definition)

বিনিময়ের জন্য দ্রব্যসামগ্রী বা কার্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত মানুষ কর্তৃক প্রদত্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলা হয়। অধ্যাপক মার্শাল শ্রম বলিতে বুঝিয়াছেন "any exertion of mind or body undergone partly or wholly with a view to some good other than the pleasure derived

from the work." এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে; (ক) ইহা মানুষেরই পরিশ্রম হইতে হইবে। জীবজন্তুর পরিশ্রমকে ধনবিজ্ঞানে শ্রম বলা চলে না, (খ) এই শ্রম শারীরিক বা মানসিক উভয় প্রকারের হইতে পারে, (গ) নিছক আনন্দ পাওয়া এই শ্রমের উদ্দেশ্য নয়, বিনিময়ের উপযোগী উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমকেই ধনবিজ্ঞানে শ্রম বলা চলে। আনন্দের জন্য ফুলবাগানে কাজ করিলে তাহা শ্রম নহে, কিন্তু মালী অর্থের বিনিময়ে যে-কাজ করে, তাহা শ্রম।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

উপাদান হিসাবে শ্রমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে: (ক) শ্রমিক হইতে শ্রমকে পৃথক করা চলে না। যদি শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে তাহা হইলেও শ্রমশক্তির উৎস তাহার শরীর সে নিজের নিকটেই রাখে। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় "The worker sells his work but he himself remains his own property." এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য ফল হইল যে, অন্যান্য উপাদানের মালিক যত খুশি উপাদানের উপর মালিকানা স্থাপন করিয়া আয় বাড়াইতে পারে, কিন্তু শ্রমকে পৃথক করা চলে না বলিয়া শ্রমিক তাহা পারে না। (খ) কোথাও শ্রম বিক্রয় করিতে হইলে শ্রমিককেও সেই স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। শ্রমিক নিজে উপস্থাপিত না হইয়া শ্রম করিতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে অন্যান্য উপাদানের তুলনায় শ্রমিকদের গতিশীলতা বা চলনশীলতা (mobility) অপেক্ষাকৃত কম থাকে। (গ) কাজ না করিয়া শ্রমশক্তি জমাইয়া রাখা যায় না। একটি দিন কাজ না করিলে সেই দিন আর ফিরিয়া আসে না, অন্যদিন কাজ না করিলেও পূর্বের দিনটি শ্রমিকের নিকট লোকসান হইয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন মালিকেরা শ্রমিকদের অনেক সময়ে কম মজুরিতে কাজ করাইতে পারে এবং মালিকদের সহিত দরকষাকষির ব্যাপারে শ্রমিকদের অসুবিধা হয়। (ঘ) দেশে শ্রমিকের যোগান অতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। জন্মহার, কারিগরি শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা শ্রমিকের যোগান প্রভাবান্বিত হয়, সুতরাং শ্রমিকের যোগানে বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে হওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকের যোগান শীঘ্র কমেও না; কারণ শ্রমিকেরা সহসা একটি কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে যাইতে চাহে না বা হঠাৎ দেশে জন্মহার কমিয়াও যায় না। (ঙ) কেয়ার্নক্রস্ বলেন যে, শ্রমিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বুদ্ধি ও বিচারশক্তি। তাঁহার মতে পরিশ্রম ও খাটুনি হইল যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, উহা সর্বক্ষণ অবিরাম

চলিতে পারে। কৃষিপ্রধান সমাজেও ঘোড়া ও গরুতেই প্রধানত খাটুনির কাজটা করিয়া দেয়। যে-কাজে কোন বুদ্ধির প্রয়োজন নাই নিছক খাটুনি তাহা মূলত যান্ত্রিক ধরনের এবং ক্রমশ যন্ত্রের সাহায্যে সে কাজ সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু মানুষের মনের কাজ বা বুদ্ধির কাজ যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। যন্ত্রকে চালাইবার উপযোগী বুদ্ধি বা বিচারশক্তি শ্রমের অঙ্গ বলিলেও চলে।

সমাজের দৃষ্টিকোণ হইলে দেখিতে গেলে শ্রম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেবলমাত্র উৎপাদন পদ্ধতিতে ইহার প্রয়োগ করিতে হয় তাহা নহে, সকল দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হইল মানুষের ভোগ বা অভাবমোচন। সুতরাং সমাজে উৎপাদনকারী ও ভোগকারী উভয়রূপেই মানুষ কাজ করে। মানুষের জন্যই উৎপাদন, আবার মানুষের দ্বারাই উৎপাদন।

দেশের মোট সম্পদ উৎপাদনে শ্রম কি-পরিমাণ সাহায্য করিবে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর—শ্রমিকের যোগান এবং শ্রমিকের দক্ষতা। দেশে শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর: দেশের মোট জনসংখ্যা, জনসংখ্যার কত অংশ শ্রম বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, প্রতিটি শ্রমিক গড়ে কত ঘণ্টা কাজ করে। জনসংখ্যা কিসের উপর নির্ভর করে সেই বিষয়ে সর্বপ্রধান মত হইল ম্যালথুসীয় তত্ত্ব।

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (The Malthusian Theory of Population)

মনুষ্য সভ্যতার প্রাচীন কাল হইতেই সকল পণ্ডিতেরা জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে সমাজদেহের শক্তি বৃদ্ধি বলিয়া মনে করিতেন। সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাজা ও সামন্ত প্রভুরা জনবৃদ্ধি চাহিতেন দেশে কৃষক ও সৈন্যসংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে। মার্কেন্টাইলিস্টদের মতে জনসংখ্যা বাড়িলে দেশ সম্পদশালী হইতে পারে, সৈন্যসংখ্যা বাড়ে, দেশের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর বাজার প্রসারিত হয়, বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত লোক পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত চিন্তানায়ক ব্যক্তিরা জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে ঈশ্বরের দান এবং দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই এই ধারণা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে শুরু করিল, ইংলণ্ডের তদানীন্তন অর্থনৈতিক অবস্থার দরুনও জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা পরিত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডে যে কৃষির সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল

ম্যালথাসের পূর্বে এই বিষয়ের লোকের ধারণা কি ছিল

তাহা এই শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত স্থায়ী হয় নাই। ধনতান্ত্রিক শিল্পবিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অনাহার, দুঃখ, দুর্দশা এমন স্তরে পৌছিল যে অনেকে চিন্তা করিলেন দেশের জমি আর লোকের ভাব বহন করিতে পারে কি না।*

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকে 1798 সালে ইংলণ্ডের টমাস রবার্ট ম্যালথাস নামে এক ধর্মযাজক "Essay on the Principle of population as it affects the future improvement of society" নামক এক পুস্তক প্রকাশ কবেন এবং তাঁহার জনসংখ্যা সম্পর্কীয় তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁহার মতে, "The power of population is indefinitely greater than the power in the earth to produce subsistence for men." জনবৃদ্ধির প্রবণতা এত বেশি যে, প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যার প্রতি 25 বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইবার দিকে ঝোঁক থাকে। দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিব হারেব তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বদাই অধিক থাকে। তাঁহার ভাষায় "By nature human food increases in a slow arithmetical ratio : man himself increases in a quick geometrical ratio unless want and vice stop him." ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম নিয়মেব ফলে, জমির যোগান সীমাবদ্ধ থাকার দরুন খাদ্যোৎপাদন দ্রুত এবং যথেচ্ছ হাবে বাড়ানো সম্ভব হইয়া উঠে না, কিন্তু জনসংখ্যা বাড়িতেই থাকে। তাঁহার মতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় সমান্তর অগ্রগতির হারে (Arithmetic Progression, যেমন 2+2+2+2 . ...), অথচ জনসংখ্যা বাড়িতে থাকে জ্যামিতিক অগ্রগতির হারে (Geometric Progression, যেমন 2×2×2×2.. .)। সুতরাং

খাদ্যের ক্রমবৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি দ্রুততর

* "Poverty was added to the curse of misgoverment, and poverty deepened with the rapid growth of the native population till famine turned the country into a hell,' *Green*, A short History of English P. 788. "Prices rose, and at least while this country was at war with nearly whole civilised world, the nation well nigh suffered the horrors of famine. During the whole of that war, the country seemed to be passing through one of those cycles of scanty crops which appear to occur in some undefined but mysterious fashion."—Introduction by *Thorold Rogers* to Adam Smith's Wealth of Nations.

কিছুকাল পরেই জনসংখ্যা অধিক হইয়া উঠে, খাদ্যোৎপাদন তাহার বহু পিছনে পড়িয়া থাকে। ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনশন, রাষ্ট্রবিপ্লব ও গৃহবিবাদ শুরু হইয়া যায়। দেশের খাদ্যশস্য যে-পরিমাণ লোককে ভরণপোষণ করিতে সক্ষম তাহার অধিক লোকসংখ্যা নিঃশেষ হইয়া যায়, খাদ্য ও জনসংখ্যার ভারসাম্য পুনরায় ফিরিয়া আসে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির দৌড় শুরু হয় এবং চক্রের মত প্রকৃতির এই নিয়ম আবার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার অবলুপ্তি ঘটাইয়া খাদ্যের সহিত উহার সমতা আনে। মানুষ যদি বিবাহ হইতে বিরত থাকে, সংযম অভ্যাস করে, তাহা হইলে সে এইরূপ ভয়াবহ ভবিষ্যৎ-এর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। যদি সে এই সকল প্রতিষেধক পদ্ধতি (Preventive checks) গ্রহণ না করে, তবে প্রকৃতি উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা কমাইবার জন্য নিজেই প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (positive checks) গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষ নিজের চেষ্টায় যদি জন্মের হার না কমাইয়া দেয়, তবে প্রকৃতি মৃত্যুর হার বাড়াইয়া খাদ্যোৎপাদন ও জনোৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া থাকে। ম্যালথাসের ভাষায় বলিতে গেলে "By the law of our nature which makes food necessary to the life of man the effects of these unequal powers must be kept equal."

প্রকৃতির প্রতিশোধ

তদানীন্তন চিন্তাজগতে ম্যালথুসীয় এই তত্ত্বের গভীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সমাজকল্যাণ, দরিদ্রের উপকার করা, সবকিছুই প্রকৃতির অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধাচরণ—এই ছিল তাঁহার তত্ত্বের প্রকৃতি। শিল্পবিপ্লব ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়াইবে, দুঃখদুর্দশা দূর করিবে, নিত্য নূতন ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করা সম্ভব হইবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই আশাবাদী ধারণার মূলে ম্যালথাস সজোরে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। শ্রমিক কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করা, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, মানবজাতির কল্যাণ করা—এই সকল ছিল তাঁহার মতে অসম্ভব এবং প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধাচরণ। নৈরাশ্যবাদ (pessimism) এবং সন্দেহবাদ (scepticism) তাঁহার তত্ত্বের গোড়ার কথা। মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়—জীবনযাত্রার মান কখনই অস্তিত্ব রক্ষার স্তর (Subsistence level) হইতে উপরে উঠিতে পারে না, এই ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন চিন্তাধারাকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়াছিল। এমনকি

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের প্রকৃতি ও প্রভাব

কি ডারউইন্-এব অস্তিত্ব-রক্ষার সংগ্রাম (Struggle for Existence), যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest), যোগ্যতাহীনের বিলুপ্তি (Elimination of the unfit), জীবজগতে বিবর্তনের এই সকল সূত্রাবলী এই তত্ত্বেরই ভাবগত ফল।

সমালোচনা (Criticisms)

(ক) এত প্রভাব সত্ত্বেও, ইতিহাস কিন্তু ম্যালথাসেব তত্ত্বকে সর্বতোভাবে ভুল প্রমাণিত করিয়াছে। ঘটনাব গতি দেখাইয়াছে যে, ম্যালথাস খাদ্যোৎপাদন ও জনোৎপাদন বৃদ্ধিব হার সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অভূতপুর্ব অগ্রগতি কৃষিব ক্ষেত্রে নূতন উৎপাদন-কৌশল ও যন্ত্রের প্রচলন করিয়া খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধির পথ সুগম করিয়াছে। (খ) শুধু তাহাই নহে, ম্যালথাসের এই তত্ত্বের নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার ফলেই এইরূপ শক্তিব উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব আজ বাস্তব জগতে কার্যকবী নাই। নয়া-ম্যালথুসীয়গণ মানুষেব যৌন-আবেগ এবং প্রজনন-আবেগের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া দিয়া জন্মনিয়ন্ত্রণেব পদ্ধতির বহুল প্রচারের দ্বারা, বিশেষ কবিয়া সমগ্র ইউরোপে, জন্মের হার কমাইয়া দিয়াছে। ম্যালথুসীয় সংযমের তত্ত্ব এড়াইয়া তাঁহারা জন্ম হার কমাইবার বাস্তব পদ্ধতিব প্রসাব করিয়া এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জনসংখ্যাব আধিক্য (over-population) আর সমস্যা ছিল না, জনসংখ্যার হ্রাসই ইউরোপে সমস্যার রূপ ধারণ করিয়াছিল। (গ) খাদ্যোৎপাদন ও জনোৎপাদন সম্পর্কীয় আঙ্কিক সূত্রগুলিও বাস্তব জগতে সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই; খাদ্যোৎপাদন সমান্তর অগ্রগতির হার অপেক্ষা দ্রুত লয়ে বৃদ্ধি পায়, জনোৎপাদন ও জ্যামিতিক অগ্রগতির হার অপেক্ষা ধীর লয়ে বৃদ্ধি হয়। (ঘ) তাহা ছাড়া, ক্যানান বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের পরিমাণ বাড়ে, কৃষি ও শিল্পে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতে পারে। (ঙ) ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, জনসংখ্যার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ শুধু খাদ্যোৎপাদনেব নহে, দেশের সকল প্রকার মোট সম্পদেব। মোট সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন ভয়ের নহে, যেমন ইংলণ্ডের খাদ্যোৎপাদন জনসংখ্যার তুলনায় কম হইলেও ইংরাজদের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উঁচু। সেলিগ্ম্যান তাই বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যার আসল সমস্যা পরিমাণগত নহে, সুদক্ষ উৎপাদনেব এবং সুষম বণ্টনের।

সুতরাং বলা চলে, ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্ব গ্রহণের পক্ষে আজকাল কোন যুক্তি নাই। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া ইউরোপে, প্রধান সমস্যা হইল কি করিয়া জনসংখ্যা হ্রাসের হার কমানো যায়। জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, অধিক বয়সে বিবাহ, বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনে অনিচ্ছা, জীবনযাত্রার মান উঁচুতে রাখার প্রচেষ্টা, সকল কিছু মিলিয়া জন্মহার হ্রাস করিয়া দিয়াছে। এশিয়ার বহু অনুন্নত দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পাইয়াছে, অথচ শিল্পায়নের প্রাথমিক স্তরে জন্মহার অত্যন্ত অধিক রহিয়াছে। ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই অধিক, জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত নীচু। এই সকল দেশে এখনও প্রচুর পরিমাণে ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সমর্থক রহিয়াছেন এবং জনসংখ্যাধিক্য (over-population) বাস্তব সমস্যারূপে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনুন্নত দেশসমূহে ইহার প্রভাব: বর্তমানের বাধা বটে, তবে ভবিষ্যতের উদ্বৃত্ত

তবে বর্তমানকালে পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে, দেশের জনসংখ্যার আধিক্যকে আর কেবলমাত্র বাধা হিসাবে গণ্য করা হয় না। বিশেষ করিয়া আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অনুন্নত দেশসমূহে ইহাকে দ্রুত মূলধন-গঠনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করেন। এই সকল দেশে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা কম উৎপাদনশীল বা অনুৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত থাকে, উহা প্রচ্ছন্ন বেকারির রূপ গ্রহণ করে। এই অধিক জনসংখ্যাকে সরাইয়া আনিয়া যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা চলে। ইহা হইল সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত (Potential Surplus), ইহার সাহায্যে ভোগ না কমাইয়া দ্রুত মূলধনগঠন সম্ভব হয়।

সর্বোন্নত বা কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব (Theory of Optimum Population)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কার-সণ্ডার্স ও ক্যানান কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি বৈজ্ঞানিক মান নির্ধারণ করা যাহার দ্বারা দেশের জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে উপযোগী বা অনুপযোগী, তাহার সঠিক বিচার করা যায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে, যে-পরিমাণ জনসংখ্যা থাকিলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম এরূপ হয় যাহাতে অধিবাসীদের মাথাপিছু আসল আয় সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহাকে কাম্য জনসংখ্যা (Optimum population) বলে। দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা যদি কাম্য জনসংখ্যা হইতে বেশি হয় তাহা

সর্বোন্নত বা কাম্য জনসংখ্যা

হইলে মাথাপিছু আসল আয় কমিয়া যাইবে। এই অবস্থাকে জনাধিক্যতা (over-population) বলা চলে। যদি দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যা হইতে কম হয়, তাহা হইলেই মাথাপিছু আসল আয় কমিয়া যাইবে। এই অবস্থাকে জন-অপূর্ণতা (under-population) বলা হয়।

সর্বোন্নত ফার্ম যেমন সকল উপাদানের সুষ্ঠু সম্মিলন ও প্রয়োগের দ্বারা সর্বনিম্ন ইউনিট ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে, কাম্য জনসংখ্যাও সেইরূপ দেশের সকল প্রকার সম্পদকে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতে পারে, যাহাতে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রম-বিভাগ, যন্ত্র, উৎপাদন-কৌশল, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান, ধারণা এবং শিক্ষা-দীক্ষার পরিবর্তন হইলেই কাম্য জনসংখ্যা আর পূর্বের ন্যায় থাকিবে না, পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। কাম্য বিন্দু তাই কোন স্থির বিন্দু নহে, পরিবর্তনশীল বিন্দু।

এই বিন্দু সর্বদা পরিবর্তনশীল

দুইটি শক্তির পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই কাম্য জনসংখ্যা নির্ধারিত হইয়া থাকে: (ক) প্রাকৃতিক সম্পদ (খ) অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুবিধা। প্রকৃত জনসংখ্যা যখন প্রথমে বাড়িতে থাকে তখন প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুবিধা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। এইরূপে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয় এবং দেশ ক্রমে কাম্য জনসংখ্যার স্তরে পৌঁছে। কাম্য স্তরে পৌঁছিবার পরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সহযোগিতার সুবিধার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত হারে কমে, মাথাপিছু আয় কমিয়া যাইতে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নতির সময়ে সহযোগিতার সুবিধা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ প্রভৃতি গণ্ডগোলের সময়ে সেই সুবিধা দ্রুত হ্রাস পায়। কাম্য জনসংখ্যা তাই বাড়িতে পারে, আবার অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে কমিতেও পারে।

কিভাবে সর্বোন্নত বা কাম্য সংখ্যা দেখা দেয়

ডাঃ ডাল্টন একটি সূত্রের সাহায্যে কাম্য সংখ্যা হইতে প্রকৃত জনসংখ্যার বিচ্যুতি অর্থাৎ অসামঞ্জস্য (Mal-adjustment) পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সূত্রটি এইরূপ: $\text{অসামঞ্জস্য} = \frac{\text{প্রকৃত সংখ্যা} - \text{কাম্য সংখ্যা}}{\text{কাম্য সংখ্যা}}$। সংক্ষেপে, এই সূত্রটিকে লেখা যায়: $M = \frac{A - O}{O}$। M যদি শূন্য হয় তবে দেশে কাম্য জনসংখ্যা রহিয়াছে। M যদি শূন্যের অধিক (ধনাত্মক বা (Positive) হয়, তবে দেশে জনাধিক্যতা আছে, এবং M যদি শূন্যের কম হয় (ঋণাত্মক বা Negative) তাহা হইলে দেশে জন অপূর্ণতা রহিয়াছে।

সর্বোন্নত বিন্দু হইতে বিচ্যুতির পরিমাপ

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব ও কাম্য সংখ্যাতত্ত্বের পার্থক্য (Distinction between Malthusian and Optimum theory of Population)

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ নৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী আনিয়া দেওয়াই হইল কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রধান দান। ম্যালথুসীয় তত্ত্বানুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি সর্বদাই অনিষ্টকর, কিন্তু কাম্য সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী ইহা সর্বদাই শুভ বা সর্বদাই অশুভ নহে। (খ) ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী যখন 'প্রত্যক্ষ' পদ্ধতিগুলি (দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি) দেশে চলিতেছে তখনই জনসংখ্যাধিক্য রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু কাম্য সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী, দেশের জনসংখ্যা কিছুটা কমাইলে যদি মাথাপিছু আয় বাড়ে তবে দেশে জনসংখ্যাধিক্য রহিয়াছে বোঝা যায়। কোটিপতিদের দেশেও যদি কয়েকজন কোটিপতিকে কমাইলে অবশিষ্ট কোটিপতিদের মাথাপিছু আয় বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে সে দেশেও জনাধিক্য রহিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। ম্যালথাসের ন্যায় মৃত্যু দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকেই জনাধিক্যের লক্ষণ বলিয়া ইহারা মনে করেন না। (গ) শুধুমাত্র খাদ্যোৎপাদনের সহিত জনসংখ্যার তুলনা না করিয়া ইহাকে দেশের সমগ্র সম্পদের সহিত তুলনা দ্বারা কাম্য সংখ্যাতত্ত্বের সমর্থকগণ দেখাইয়াছেন যে, দেশে উপযুক্ত খাদ্যোৎপাদন না হইলেও অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান কমিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। (ঘ) ম্যালথুসীয় নৈরাশ্যবাদ এবং মানব-জাতির অন্ধকারময় ভবিষ্যতের ভয় দূরীভূত করিয়া কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব পৃথিবীতে মানুষকে আশার বাণী শুনাইয়াছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভবপর, শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবনের অবসান ঘটানো যাইতে পারে, এই তত্ত্ব হইতে ইহাই প্রচারিত হইয়াছে: "Malthus was obsessed by the fear of an impending economic Hell, the propounders of the optimum theory were elated with the hopes of a coming Paradise."

কাম্য জন সংখ্যাতত্ত্বের সমালোচনা (Criticism)

(ক) এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমালোচনা হইল যে, ইহা ঠিক জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় নির্দিষ্ট কোন তত্ত্ব নয়। এই তত্ত্বের দ্বারা জানা যায় না কেন এবং কোন্ কোন্ শক্তির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় অথবা কমিয়া যায়। বহুল প্রচারিত 'কাম্য' বা 'সর্বোন্নত স্তরের' ধারণা জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই জনসংখ্যার পরিমাণের গতিশীলতা ও উহার কারণ সম্বন্ধে কোন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। (খ) কাম্য জনসংখ্যা

জীব-বৃদ্ধির মূল কারণে ও ধরনে যে তত্ত্ব আলোকপাত করে না তাহা প্রকৃত জনসংখ্যা সম্পর্কীয় তত্ত্ব নহে

সম্বন্ধে ধারণা একটি নিশ্চল ও স্থির জগতের ধারণা মাত্র। যদি অর্থ নৈতিক পরিবেশে কোন পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলেই কাম্য জনসংখ্যা নিধারণ করিতে পারা যায়। কিন্তু সদা পরিবর্তনশীল অর্থ নৈতিক পরিবেশে মরুভূমির আলেযার ন্যায় কাম্য জনসংখ্যাকে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নহে। (গ) এই তত্ত্ব জনসংখ্যাধিক্য পরিমাপ করার উপযোগী কোন বাস্তব মানদণ্ডের নির্দেশ দেয় না। জনসংখ্যা কমাইয়া মাথাপিছু আয় বাড়িল কি বাড়িল না তাহা পরীক্ষা করিয়া জনাধিক্য হইয়াছে স্থির করা কোন সম্ভবপর কার্যকরী পন্থা নহে। এই তত্ত্ব এমনই যে, কোন প্রয়োগগত সার্থকতা ইহার নাই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বরূপ (The nature of Population Increase)

কি-ভাবে কোন একটি দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তন হয় তাহার সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে। বর্তমানে লজিস্টিক রেখা নামে একটি ধারণা সুপ্রচলিত আছে। এই রেখা অনেকটা ইংরাজী S অক্ষরের মতন। ইহাতে বুঝা যায়, একটি দেশে প্রথমে জনসংখ্যা ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, পরে বৃদ্ধির গতি দ্রুত হইয়া উঠে, অবশেষে আবার ধীর গতি আসিয়া পড়ে, একেবারে শেষের দিকে হ্রাস পাইবার ঝোঁকও দেখা যায়। সভ্যতার শুরুতে জীবনযাত্রার উপকরণের ও শান্তি শৃঙ্খলার অভাবের দরুন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি দ্রুত হইতে পারে না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার উপকরণের যোগান বাড়িতে থাকে। কিন্তু জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হইবার পর জনসংখ্যা আর বাড়িতে চাহে না, অনেক সময় জনসংখ্যা হ্রাস পাইবার দিকে ঝোঁক আসিয়া পড়ে।

সভ্যতার স্তর ও জনসংখ্যা

জনসংখ্যা পরিবর্তনের পরিমাপ (Measurement of Population Change)

রেমণ্ড পার্ল নামে এক লেখক জনসংখ্যার পরিবর্তন পরিমাপ করার জন্য একটি নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি শতকরা মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা জন্মের সংখ্যা হইতে বেশি হয় তাহা হইলে জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান বলা চলে; যদি মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে জনসংখ্যা ক্রমপ্রসারমান, যদি মৃত্যুর সংখ্যা ও জন্মের সংখ্যা সমান হয়, তবে বলা চলে যে, জনসংখ্যা স্থিতিশীল। শতকরা জন্মের হার ও শতকরা মৃত্যুর হারের অনুপাতের সাহায্যে জনসংখ্যা পরিবর্তনের ধারা বোঝা যাইতে পারে। ইহাকে প্রাণ-সূচী (Vital-Index) বলা হয়।

জন্মহার ও মৃত্যুহারের অনুপাত

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পার্লের এই নিয়ম ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দেশে সন্তান প্রজননের গড় ক্ষমতা মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, গড়-আয় প্রভৃতি বাদ দিয়া কেবলমাত্র জন্মহার ও মৃত্যু হারের অনুপাত হিসাব করিয়া সঠিকভাবে জনসংখ্যার পরিবর্তন পরিমাপ করিতে পারা যায় না।

সমালোচনা

যেমন, বর্তমানে মৃত্যুহার বেশি হইলেও যদি অধিকাংশ মৃত্যু বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ঘটে (যাহাদের সন্তান প্রজননের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, তবে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা কমিবে কি না তাহা বলা চলে না। যদি জন্মহার বেশি থাকে কিন্তু অধিকাংশ মৃত্যু প্রাক্-যৌবন স্তরেই ঘটিয়া থাকে তবে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা কমিবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। অধিক সংখ্যায় পুরুষ শিশু জন্ম-গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা কমিতে পারে, অধিক সংখ্যায় স্ত্রী শিশু জন্মগ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বাড়িতে পারে।

কুসজিন্স্কি এই কারণে একটি নতুন পদ্ধতির সাহায্যে দেশের জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন পরিমাপের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার পরিমাপ পদ্ধতির মূল কথা হইল যে, স্ত্রীলোকই সন্তান উৎপাদনক্ষম, সুতরাং জনসংখ্যার মধ্যে প্রজননক্ষম স্ত্রীলোকের অনুপাত পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে কিরূপ বদলাইয়াছে তাহার গণনাই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তর হইতে নমুনা খুঁজিয়া 1000টি নূতন স্ত্রী-শিশু লইয়া হিসাব শুরু হইল এবং দেখা গেল উহাদের মধ্যে কতটি স্ত্রী-শিশু সন্তান প্রজননের বয়স (15-50) পর্যন্ত পৌঁছায় এবং ইহাদের মধ্য হইতে মোট কতজন স্ত্রী-শিশুর জন্ম হয়। যদি 1000 নবজাত স্ত্রী-শিশু সন্তান প্রজননের বয়স পার হইয়া আসিবার মধ্যে ঠিক 1000টি স্ত্রী-শিশু রাখিয়া আসে, তবে জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা। যদি কম স্ত্রী-শিশু রাখিয়া আসে (যেমন 700) তাহা হইলে জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান (নীট প্রজনন হার হইল '7)। যদি 1000-এর অধিক স্ত্রী-শিশু রাখিয়া আসে (যেমন 1500), তাহা হইলে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান (নীট প্রজনন হার হইল (1 5)। এইরূপে দেশের প্রজনন হার (Net Reproduction Rate) হিসাব করিতে পারা যায়।*

গড় প্রজনন-শক্তি ও স্ত্রীলোক সংখ্যা

* The pertinent question is not is there an excess of births over deaths? But rather, are natality and mortality such that a generation which would be permanently subject to them would, during its life-time, that is, before it has died out, produce sufficient children to replace that generation? . Since

মূলধন কাহাকে বলে (Definition of Capital)

মানুষের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য পুনরায় উৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত হইলে তাহাকে মূলধন বলে। উইক্‌সেলের ভাষায় বলিতে গেলে "মূলধন হইল সঞ্চিত শ্রম এবং সঞ্চিত ভূমির মিলিত ও একত্রীভূত ফল, বহু বৎসর ধরিয়া তিলে তিলে ক্রমশ জমাট বাঁধা রূপ ধারণ করিয়াছে।" অতীত কালের শ্রম ও প্রকৃতির সম্পদ মিলিয়া প্রথমে যে মূলধন সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশ অধিক আয় ও অধিক সঞ্চয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, পরবর্তী কালে আরও বেশি মূলধন গঠনে সহায়তা করিয়াছে। আজিকার মূলধন তাই অতীত কালের বহু স্তরের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ফলস্বরূপ।

অতীতের শ্রম ও ভূমির মিলিত সঞ্চিত ফল

মূলধন কথাটির অর্থ বুঝিতে হইলে মনে রাখা দরকার যে, ইহার প্রকৃতি হইল আয় সৃষ্টি করা (Income-creating) বা আয় প্রদান করা (Income-earning)। যে-সকল সম্পদ ইহার মালিককে আয় প্রদান করে, অথবা যাহা সরাসরি উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া আয় সৃষ্টি করে তাহাকেই মূলধন বলে। অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন যে মূলধন হইল "Wealth which yield an income or aids in the production of an income or is intended to do so" কেয়ার্নক্রসের অভিমতে মূলধন শব্দটি তিন ধরনের পৃথক দ্রব্য বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়: দ্রব্যরূপ মূলধন (Concrete Capital); অর্থরূপ মূলধন (Money Capital); ও ঋণরূপ মূলধন (Debt Capital)।

যে-সম্পদ হইতে আয় হয়

দ্রব্যরূপ মূলধন হইল সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী যাহা প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষ-ভাবে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত থাকে। সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, কারখানা এবং অর্ধ-প্রস্তুত দ্রব্যাদি হইল মূলধন এবং তাহারা সরাসরি আয় সৃষ্টি করে, নূতন দ্রব্যাদি তৈয়ারী করে। অর্থরূপ মূলধন হইল, কোন ব্যবসায়ীর

---

we are concerned here with birth-giving only, it suffices to take into account the female population The pertinent question then is. are natality and mortality such that 1000 newly-born girls will in the course of their lives give birth to 1000 girls ?......It becomes necessary. first to ascertain on the basis of present mortality how many out of 1000 newly born girls reach child bearing age, that is 15 years, how many reach 16 years etc., finally how many pass through the child leaving age, that is 50 years. In short, we have really to find how many females are born of the original stock of 1000 girls. If 1000 girls of child-bearing age survive per 1000 girls born, then the population is stationary. if larger than 1000 survive then the population is increasing otherwise it is decreasing, The rate at which the female population is replacing itself is the net reproduction rate." *Kuczynski*, Balances of Births and Deaths. Pp. 41-4.

বা ফার্মের হাতে মজুত অর্থের পরিমাণ, যাহা দিয়া তাহারা উপাদানসমূহের কার্যশক্তি ক্রয় করিতে পারে। অর্থের সাহায্যে মূলধনের উপর ব্যক্তির বা ফার্মের মালিকানা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে কিন্তু অর্থ নিজেই মূলধন নহে, দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না। অর্থরূপ মূলধন মালিকের আয় প্রদান করে, নিজেই উৎপাদন-ধারায় সশরীরে ব্যবহৃত হইয়া আয় সৃষ্টি করে না। ঋণস্বরূপ মূলধন হইল যে-অর্থের সাহায্যে ব্যক্তি বা ফার্ম, নিজে উৎপাদন না করিয়া অন্যকে ঋণ দেয় এবং উহার দরুণ নিয়মিত সুদ পায়। কোন ঋণপত্র বা ওই প্রকার দলিলের মালিক নিয়মিত আয় পাইতে থাকে, তাই বলা যায় ইহা আয়-প্রদানকারী। ইহা আয়-সৃষ্টিকারী হইতেও পারে, অথবা না-ও হইতে পারে। সরকারী ঋণপত্র উহার মালিকের নিকট আয়-প্রদানকারী, কিন্তু যদি উৎপাদনের কার্যে সেই অর্থ নিয়োজিত হয়, তবেই তাহা আয়-সৃষ্টিকারী, যদি উৎপাদনের কার্যে সরকার তাহাকে নিয়োগ না করেন তবে ব্যক্তির নিকট আয় প্রদানকারী হইলেও ইহা নিজে কখনই আয় সৃষ্টিকারী নহে। শেয়ারের ও ডিবেঞ্চারের মালিক ইহা হইতে আয় পায়, তাহাদের নিকট এই দলিল ঋণরূপ মূলধন।

আয় সৃষ্টি করে না
আয় প্রদান করে

মূলধন ও সম্পদ (Capital and Wealth)

সম্পদের যে অংশ মানুষের দ্বারা উৎপন্ন এবং যাহা অপর দ্রব্য উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত হয় তাহাকে মূলধন বলে। মানুষের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যাদি ভোগকার্যে নিয়োজিত হইলে উহাকে সম্পদ বলে এবং উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত হইলে উহাকে মূলধন বলে। সম্পদের যে-অংশ হইতে আয় দেখা দেয় উহাকে মূলধন বলা হয়। কি উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার দ্বারা উহাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা চলে।

আয় প্রদানকারী
সম্পদ হইল মূলধন

মূলধন ও আয় (Capital and Income)

মূলধনের উপর মালিকানার দরুন তাহা হইতেই নিয়মিত যে-প্রতিদান পাওয়া যায় তাহাকে আয় বলে। মূলধন হইল সঞ্চিত ও একত্রীভূত রূপ, আয় হইল উহা হইতে উদ্ভূত দ্রব্যসামগ্রীর স্রোতধারা। আয় হইতে সঞ্চয় হইয়া মূলধন গঠিত হয়, উহা হইতে পুনরায় আয় হইতে থাকে। অবশ্য মূলধনের মালিকানা ছাড়াও শ্রম ও কাজের দ্বারাও ব্যক্তির আয় হইতে পারে।

মূলধন হইতে আয় হয়
এবং আয় হইতেই
নূতন মূলধনের সৃষ্টি হয়

মূলধন ও ভূমি (Capital and Land)

মূলধন হইল মানুষের শ্রমের ফল, কিন্তু ভূমি প্রকৃতির দান। সুতরাং উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হইলেও ভূমি কখনই মূলধন নহে। ভূমির যোগান নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কিন্তু মূলধনের যোগান অপরিবর্তনীয় নয়, ইহাকে বাড়ানো বা কমানো যায়।

স্থির মূলধন ও সঞ্চরণশীল মূলধন (Fixed and circulating capital)

যে-সকল মূলধন একবার উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত হইলে তাহাদের আকৃতি এরূপভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায় যে, পুনরায় একই উৎপাদন-ধারায় তাহাদের আর নিয়োগ করা সম্ভব হয় না, তাহাদের সঞ্চরণশীল মূলধন বলে। আর যে-সকল মূলধনকে অনেকবার একই ধরনের উৎপাদন-কার্যে নিয়োগ করা চলে এবং আকৃতিতে পরিবর্তন হয় না, তাহাদের স্থির মূলধন বলে। প্রত্যেকবার উৎপাদন-কার্যের পর উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, বাজারে স্বাভাবিক অবস্থায়, সঞ্চরণশীল মূলধনের দাম সম্পূর্ণ উঠিয়া আসে; কিন্তু প্রতিবারে স্থির মূলধনের দামের অংশমাত্র দ্রব্যের দামের মধ্যে যুক্ত হইয়া বিক্রেতার নিকট ফেরত আসে। অবশ্য মনে রাখা দরকার, এই পার্থক্য কিন্তু কোন মৌলিক পার্থক্য নহে। উদাহরণস্বরূপ একটি গাড়িতে যদি 10 মাইল চড়া যায় তাহা মোটরের চাকা স্থির মূলধন এবং পেট্রল সঞ্চরণশীল মূলধন। কিন্তু যদি 1000 মাইল চড়া হয় তাহা হইলে উভয়ই সঞ্চরণশীল মূলধনের শ্রেণীতে পড়ে। কারণ উভয় দ্রব্যই সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও উভয়ের আকৃতিতেই পরিবর্তন ঘটে।

মূল্যের মধ্যে সঞ্চরণশীল মূলধনের সবটা ও স্থির মূলধনের কিছুটা যুক্ত থাকে

মূলধনের কার্য (Functions of Capital)

আধুনিক উৎপাদনকে পুঁজিবাদী উৎপাদন বলা হয়, কারণ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পুঁজি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মূলধন বা পুঁজি অতীতের সঞ্চয়ের ফল, আর সঞ্চয় হইল ভোগকার্য হইতে কিছুটা সময় বিরত থাকা। সেইজন্য উৎপাদনে পুঁজির নিয়োগকে বম্ বোয়ার্ক সময়ের নিয়োগ বলিয়াছেন, যেন অতীতকালের জমাটবাঁধা সময়কে বর্তমানে নিযুক্ত করা হইতেছে।

মনে করা যাউক, এক শিকারী শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে। রোজই তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্য সে শিকার করিয়া আনে। ভাল অস্ত্র বা উন্নত ধরনের মূলধন তৈয়ারী করিতে হইলে তাহাকে দুই সপ্তাহকাল শিকার হইতে

বিরত থাকিয়া পাথর বা লোহা দ্বারা নূতন অস্ত্র তৈয়ারী করিতে হইবে। এই দুই সপ্তাহ হয় সে কিছুই ভোগ করিবে না, অথবা পূর্বের শিকারের সঞ্চয় দ্বারা চালাইয়া লইবে। মূলধন তৈয়ারীর পরে সেই অস্ত্রের সাহায্যে সে পূর্বাপেক্ষা বেশি শিকার (উৎপাদন) করিতে পারিবে। যদি দুই সপ্তাহের স্থলে চার সপ্তাহ যাবৎ সে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে সে আরও পুঁজি উৎপাদন করিয়া ভবিষ্যতে খাটাইতে পারিবে, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। কিছুটা ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন—সঞ্চয়—মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন – অধিকতর ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন—অধিকতর সঞ্চয়—আরও মূলধন গঠন—আরও অধিক ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, এই ভাবেই উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অন্য উপাদানের তুলনায় পুঁজি-নিয়োগের অনুপাত বাড়িতে থাকে। ফলে উৎপাদন-পদ্ধতি ক্রমে অধিকতর মূলধনপ্রধান বা পুঁজিপ্রধান (Capitalistic) হইয়া উঠে। ইহাকে চক্রাকৃতি উৎপাদন-পদ্ধতি (round-about methods of production) বলে। যত অধিক মূলধন বা জমাট বাঁধা শ্রম সে নিয়োগ করিতে পারে, তত সেই উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে অধিক উৎপাদনক্ষম করিয়া তোলে। সুতরাং যত বেশি মূলধন নিয়োগ সম্ভব হইবে, জাতীয় আয় ও ব্যক্তিগত আয় তত দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে, লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়া উঠিবে।

উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে অধিক উৎপাদনক্ষম করিয়া তোলে

কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়, সেই সময়ের পরে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থের হিসাবে শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য ফেরৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে যতদিন পর্যন্ত দ্রব্য-উৎপাদনের ধারা শেষ না হইয়া চলিতে থাকে, ততদিন শ্রমিকেরা যে মজুরি পাইয়া তাহাদের জীবনধারণ করে,—যে সকল খাদ্য, বস্ত্র বা ভোগ্য দ্রব্যাদি ব্যবহারের ফলেই উৎপাদন কার্য চালাইয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়—তাহাদের মূলধন বলা হয়, কারণ উৎপাদন-কার্যে তাহারা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। শ্রম ও ভোগের এইরূপ সংযোগ-সাধন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক কালে কাঁচা মাল যোগাড় করিয়া উৎপাদন শুরু করা ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করার মধ্যে প্রচুর সময়ের ব্যবধান থাকে, সেই সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরি ফার্মের সঞ্চরণশীল পুঁজি হইতেই দেওয়া হয়।

উৎপাদন কালের মধ্যে শ্রমিকদের বাঁচাইয়া রাখা

ফার্মের উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা মূলধনের একটি বিশেষ কাজ বলিয়া

ধরা হয়। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদককে যদি বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের ধারা ব্যাহত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ; ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। মূলধন থাকিলে পূর্বের উৎপন্ন দ্রব্য সম্পূর্ণ বিক্রয় না হইলেও উৎপাদন চলিতে পারে, একই সঙ্গে বিক্রয় ও উৎপাদন সচল রাখা সম্ভবপর হয়।

উৎপাদন-ধারা অব্যাহত রাখে

মূলধন-গঠন (**Capital Formation**)

দেশের মোট আয়ের সবটাই যদি ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হইতে থাকে, অধিবাসীরা যদি মোটেই সঞ্চয় না করে, তাহা হইলে দেশের মূলধন-গঠন সম্ভবপর হয় না। মূলধন গঠন করিতে পারিলে উহার নিয়োগের দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দেশের লোক যদি বর্তমানে ভোগ হইতে বিরত থাকে, আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করিয়া তাহা মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে, তবেই দেশে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধনী দ্রব্য তৈয়ার করা সম্ভবপর। ভবিষ্যতে অধিক আয় ও অধিক ভোগ্যদ্রব্য পাইবার আশায় তাহারা বর্তমানে সঞ্চয় করিলে এবং সেই সঞ্চয় সঠিকভাবে বিনিয়োগ করা হইলে (অর্থাৎ নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে খাটানো হইলে) তবেই দেশে মূলধন-গঠন হইয়া থাকে।

মূলধন আসে সঞ্চয় হইতে

এই সঞ্চয় কিসের উপর নির্ভর করে ? নয়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সঞ্চয় করিতে হইলে লোককে বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয়। কিন্তু মানুষের মনই এমন যে, তাহারা বর্তমানের অভাবকে বড করিয়া দেখে, ভবিষ্যতের অভাব মোচনের চিন্তা অপেক্ষা তাহাদের বর্তমানের অভাব মিটাইবার চিন্তা প্রবলতর। বর্তমানে ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করা বেদনাদায়ক সুতরাং সঞ্চয়কারীকে বেদনা উপশমের জন্য কিছুটা সুদ দিতে হইবে। এই সুদের হারের উপর দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করিবে। সুদের হার বাড়িলে দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং মূলধনের পরিমাণ বাড়ে।

সঞ্চয় কিসের উপর নির্ভর করে
১। সুদের হার

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে সুদের হারের সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক ভিন্ন রূপ। দেশে অনেক লোক আছেন যাঁহারা সুদের হার সম্পর্কে উদাসীন হইয়া সঞ্চয় করিয়া থাকেন ; ব্যবসায়ী ফার্মগুলির সঞ্চয় ও সুদের হারের অপেক্ষা রাখে না। কেইন্‌স বলিয়াছেন যে, সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে দেশে শিল্প ও ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ কম হয়, ফলে লোকের মোট আয় কমিয়া যায়,

তাহাদের সঞ্চয় করিবার শক্তি কমে, দেশে মোট সঞ্চয়ও কমে। সুদের হারের সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক তাই বিপরীত বলিলেও চলে ; সুদের হার কম থাকিলেই মোট আয়, মোট সঞ্চয় এবং মূলধন-গঠন বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

২। মুনাফা
৩। আয়স্তর
৪। সঞ্চয়-প্রবণতা

দ্বিতীয়ত, দেশের বেশির ভাগ সঞ্চয় আসে যৌথব্যবসায়ী ফার্মগুলির অবণ্টিত মুনাফা হইতে। তাহারা প্রতিবৎসর নূতন মূলধন-গঠনের জন্য মুনাফার বৃহৎ অংশ সঞ্চয় করে ; বিভিন্ন কারণে, যেমন, (ক) যন্ত্রপাতি বা মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য, (খ) ব্যবসায়-সংকট ভালভাবে কাটাইয়া উঠিবার জন্য, (গ) ব্যবসায় বা ফার্মের আয়তন ও সম্পদ আরও বাড়াইবার জন্য, (ঘ) প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের হটাইবার উদ্দেশ্যে অথবা আক্রমণ শুরু করিবার জন্য, এই সকল ফার্ম তাহাদেব বাৎসরিক মুনাফা হইতে প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় কবিয়া থাকে। এই সঞ্চয় দেশের মূলধন-গঠনে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত, সঞ্চয় নির্ভর কবে, দেশে আয়স্তরের উপব। যদি সাধারণভাবে দেশেব আয়স্তর বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মোট সঞ্চয়ও বাড়িবে, আয়স্তর কমিয়া গেলে মোট সঞ্চয়ও কম হইবে।

চতুর্থত, সঞ্চয় নিভর কবে দেশের লোকের গড় সঞ্চয়-প্রবণতার উপর। আয় হইতে যে পরিমাণ সঞ্চয় হয় তাহাকে অর্থাৎ আয় ও সঞ্চয়ের অনুপাতকে, সঞ্চয়-প্রবণতা (propensity to save) বলা হয়। ব্যক্তিব সঞ্চয়-প্রবণতাব বহুবিধ কারণ থাকে। যদি লোকটি বিশেষ হিসাবী প্রকৃতির ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে সঞ্চয়ী হইবে। যদি সে ভবিষ্যতে উন্নতির কথা ভাবে, অথবা নিজের অবর্তমানে স্ত্রীপুত্রেব নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, তাহা হইলে সে সঞ্চয়ী হইবে। প্রচুর সঞ্চয় করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ধনী বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইবে, এই আশায় বা অহংবোধ চরিতার্থের সুযোগ লাভেব জন্য সে সঞ্চয় করিতে পারে, কৃপণ স্বভাবের লোকের কোন কারণ বিনাই সঞ্চয় হইতে পারে। লোকের মনে এই সকল বিভিন্ন কারণে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি কতটা শক্তিশালী হইবে তাহা নির্ভর করে দেশে (ক) জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, (খ) বিনিময়ের সুযোগ-সুবিধা, (গ) অভ্যাস ও রাজনীতি প্রভৃতির উপর। দেশের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা বজায় থাকিলে, বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মারফত বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা থাকিলে এবং

সঞ্চয়োপযোগী অভ্যাস ও রীতিনীতি থাকিলে দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

কিন্তু সঞ্চয় হইলেই মূলধন গঠন হয় না। যদি এই সঞ্চয় সোনা রূপা বা অলঙ্কার-ক্রয়ে আবদ্ধ হইয়া থাকে অথবা বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায় (বা ঋণ পরিশোধের জন্য বিদেশে পাঠাইতে হয়), তাহা হইলে সেই সঞ্চয়ের দ্বারা দেশে মূলধন-গঠন হইতে পারে না। ইহার জন্য চাই বিনিয়োগ অর্থাৎ সেই সঞ্চয়কে নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে খাটানো। কেবলমাত্র সঞ্চয় হওয়ার ফল হইল ভোগ্যদ্রব্যের বিক্রয় ও চাহিদা কম হওয়া। বিনিয়োগ হইলেই সেই সঞ্চিত অর্থ উপাদানসমূহের চাহিদা সৃষ্টি করিবে এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিবে।*

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বিনিয়োগ নির্ভর করে দুইটি শক্তির উপর: (ক) নূতন মূলধনী-দ্রব্যের উৎপাদন হইতে সম্ভাব্য মুনাফার হার, এবং (খ) সুদের হার। যদি নূতন মূলধনী-দ্রব্য হইতে সম্ভাব্য মুনাফার হার বাজারে প্রচলিত সুদের হার হইতে বেশি হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীগণ অবশ্যই সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ করিয়া লাভের আশায় নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করিবে। কেইন্‌সের ভাষায় বলা যায়, যদি মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (Marginal Efficiency of Capital) সুদের হার হইতে বেশি থাকে তবেই সঞ্চয়ের বিনিয়োগ হইবে এবং দেশে মূলধন-গঠন সম্ভব হইবে।

সংগঠন কাহাকে বলে (What is Organisation)?

শিল্পবিপ্লবের ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সমগ্র উৎপাদনের ধরন আজকাল বিশেষায়িত (Specialised) এবং ঝুঁকিবহুল হইয়া উঠিয়াছে। সমাজে যাহারা উৎপাদনের উদ্যোগ ও পরিচালনা করেন, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার ভার বহন করেন তাঁহাদের বলা হয় উদ্যোক্তা (Entrepreneur)। বিরাট আয়তনের জটিল ও বহুমূল্য যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা বহুসংখ্যক শ্রমিকের সাহায্যে অনির্দিষ্ট চাহিদার উদ্দেশ্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া আধুনিক কালের ফার্মগুলি উৎপাদন করে। সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া এই কার্য সম্পাদন করা দুরূহ ব্যাপার।

* শুধু সঞ্চয় করিলে সেই অর্থ অন্যের আয় সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহারা সঞ্চয় করিতে পারেন না—সুতরাং বিনিয়োগহীন আজিকার সঞ্চয়, ভবিষ্যতের সঞ্চয়কে কমাইয়া দেয়। তাই রবার্টসন বলিয়াছেন, সঞ্চয়কে "সঞ্চিত করিয়া রাখা চলে না।"

সংগঠনকে পৃথক উপাদান বলা উচিত কি না। (Is Organisation a separate foctor ?)

নয়া ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ সংগঠনকে উৎপাদনের একটি বিশিষ্ট উপাদান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সংগঠনের কাজ হইল শ্রম, মূলধন ও ভূমির সংযোগ সাধন এবং উৎপাদনের উপযোগী করিয়া ইহাদের আয়ত্তাধীনে রাখা। উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করাও সংগঠনের কাজ। বিপদের মুখে ধৈর্য সহকারে কার্য পরিচালনা করা, সময়নিষ্ঠা, এই সকল প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণ অপর উপাদানের কম থাকিলে চলে, কিন্তু এই সকল গুণই সংগঠন-পরিচালকের বৈশিষ্ট্য। সুদক্ষ বিবেচনা, নৈপুণ্য ও স্থানকাল পাত্র অনুযায়ী দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, সংগঠন পরিচালনাকে অপর সকল উপাদান হইতে পৃথক করিয়া ইহাকে এক বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের মতে ইহাকে পৃথক উপাদান বলাই উচিত।

কোন পৃথক বলা চলে

কিন্তু সকল আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ সংগঠনকে পৃথক উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, ইহা শ্রমের একটি বিশেষ রূপ মাত্র, শ্রম হইতে এই উপাদান পৃথক নহে। শ্রমিকই মানুষ ও দ্রব্যাদি লইয়া কাজ চালাইবার উপযোগী জ্ঞান রাখে, কেয়ানক্রস বলিতেছেন, "শ্রমিকের বৈশিষ্ট্যই হইল বুদ্ধি ও বিবেচনা।" সকলের মধ্যেই কম বেশি সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে, যাঁহাদের কম, তাঁহারা ইহাদের অধীনে আছেন এবং হয়তো কিছুটা কম আয় করেন। একই যোগ্যতার পরিমাণগত পার্থক্য তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায়, এই পার্থক্য গুণগত নয়। ঝুঁকি বহন করা কেবলমাত্র সংগঠনের গুণ নয়; সকল শ্রমিকই শরীর, স্বাস্থ্য ও বেকারির ঝুঁকি মাথায় করিয়া কাজ করে। অর্থের ঝুঁকি ও জীবনের ঝুঁকির পার্থক্য এরূপ নহে যে, ইহাদের পৃথক উপাদান বলিয়া নির্ধারিত করিতে হইবে। অপর যে-সকল গুণের জন্য সংগঠনকে একটি পৃথক উপাদানের স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহা শ্রমিকদের মধ্যেও যথেষ্ট আছে, তাহা না থাকিলে বর্তমান যুগের জটিল ও যান্ত্রিক উৎপাদন তাহাদের দ্বারা সম্ভব হইত না। সুতরাং সংগঠনকে একটি পৃথক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

কেন উচিত নহে

কিন্তু মনে রাখা দরকার, সকল শ্রমিককে দাম ও উৎপাদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় না (price-output decisions); উদ্যোক্তার কার্যই হইল এই সকল বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তাহা ছাড়া পৃথক ভাবে বিভিন্ন উপাদানের আয় হয়। মজুরি

...ষ সিদ্ধান্ত

ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য খুবই বেশি, ইহাদের নির্ধারণের নিয়মও পৃথক। সুতরাং এমতাবস্থায় বিশ্লেষণ ও আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাকে পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হইতেছে।

উদ্যোক্তার কার্য ও গুরুত্ব (Functions and importance of Entrepreneur)

প্রথমত, ভূমি, শ্রম ও মূলধন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে উৎপাদন সম্ভব হয় না, ইহাঁদের একত্র সমাবেশ করিলেও আপনা-আপনি দ্রব্যোৎপাদন শুরু হইতে পারে না। চিন্তা ও পরিকল্পনা করিয়া এমন ভাবে ইহাদের সম্মিলনের ও সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা করিতে হয় যাহাতে ইহারা উৎপাদন-ধারায় কাজকর্ম শুরু করিতে পারে। উদ্যোক্তা তাহাই করে। সে অপর সকল উপাদানের নিয়োগকর্তা, তাহাদের উৎপাদন-কার্যের উপযোগী ইউনিটে বিভক্ত করিয়া উৎপাদন-পদ্ধতি এবং উপাদান-সম্মিলন স্থির করিয়া উৎপাদন শুরু হয়।

উপাদানসমূহের সংযোগ সাধন

দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তাকে স্থির করিতে হয়, সে কি-উৎপাদন করিবে, কোথায় করিবে, দ্রব্যের উৎকর্ষ কিরূপ হইবে, কত পরিমাণে এবং কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে। অর্থাৎ তাহাকে বাজারের চাহিদা বুঝিয়া দ্রব্য স্থির করিতে হইবে, বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা এবং ব্যয়-রেখার (cost-curve) গতি লক্ষ্য করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক করিবে। বিভিন্ন উপাদান-সম্মিলনের ফলাফল হিসাব করিয়া নিজের উৎপাদন-পদ্ধতি ও উপাদান-সম্মিলন পছন্দ করিবে।

তৃতীয়ত, ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণ করা উদ্যোক্তার কার্যের অঙ্গ। পূর্বে ধারণা ছিল যে, ব্যবসায়ের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও পরিদর্শন তাহার কাজের অংশ, কিন্তু বর্তমানে যৌথ ব্যবসায়ী ফার্মসমূহে দৈনন্দিন পরিচালনা সংক্রান্ত কাজগুলির ভার মাহিনা-ভোগী কর্মচারীদের উপর দেওয়া হইয়াছে। দাম, উৎপাদন ও বিভিন্ন বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব উদ্যোক্তাগণ নিজেদের হাতে রাখিয়াছে। শেয়ারক্রেতাগণ বাৎসরিক সভায় সকল কিছু সিদ্ধান্ত করার মধ্য দিয়া উদ্যোক্তার কার্য চালাইয়া থাকে।

ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ ও নীতি নির্ধারণ

চতুর্থত, অন্যান্য উপাদানকে শুধু নিয়োগ করাই উদ্যোক্তার কার্য নহে,

প্রত্যেককে পূর্বচুক্তি অনুযায়ী তাহাদের প্রাপ্য বেতন বা অর্থ দেওয়াই তাহার কাজ। ভূমির মালিককে খাজনা, শ্রমিককে মজুরি, মূলধনের মালিককে সুদ দেওয়ার পরে যদি কিছুটা অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা সে নিজে মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করিবে। কিছু অবশিষ্ট না থাকিলে সে কিছু পাইবে না, কম পড়িলে তাহারই লোকসান হইবে।

অন্যান্য উপাদানের বেতন দান

পঞ্চমত, উদ্যোক্তার অন্যতম প্রধান কাজ হইল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করা। এই ঝুঁকি বহু বিষয়ের। ফ্যাশান ও রুচি বদলাইলে দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে, প্রতিযোগী বা পরিবর্ত সামগ্রীর উৎপাদন শুরু হইতে পারে; অচিন্ত্যপূর্ব কারণে ব্যয়বৃদ্ধি হইতে পারে। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বাভাবিক গতিশীলতা (Dynamicity) হইতে উদ্ভূত একরূপ বহু ঝুঁকি তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। আগুন লাগা বা অপর কোনরূপ দুর্ঘটনার ঝুঁকি সে সর্বদা পূর্বেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু ব্যবসায়ের যে সকল ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করা যায় না, সেই প্রকার ঝুঁকি সর্বদাই তাহাকে বহন করিতে হয়। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিয়া তাহা সর্বদা কমাইবার চেষ্টা করা উদ্যোক্তার একটি গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব।

ঝুঁকি ও অনিশ্চযতা

সর্বশেষে, জে, বি, ক্লার্ক বলেন যে, উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হইল নূতনত্ব আনয়ন করা (Innovation)। কোন উদ্যোক্তা নূতন পদ্ধতি বা নূতন যন্ত্র এইরূপ কিছু প্রবর্তন করিতে পারিলে অন্যান্য ফার্মের তুলনায় তাহার অধিক মুনাফা হয়, এবং যতদিন পর্যন্ত অন্যান্য উদ্যোক্তা তাহাকে অনুকরণ না করে, ততদিন সে এই অধিক মুনাফা লাভ করিতে থাকে। কিন্তু পরে ক্রমে সকলেই ইহা গ্রহণ করিলে সকলের মুনাফার হার স্বাভাবিক স্তরে নামিয়া আসে, ফলে আবার তাহাকে কোন বিষয়ে নূতনত্ব আনয়নের চেষ্টা কবিতে হয়। এইরূপে উৎপাদন-প্রক্রিয়াব বিভিন্ন দিকে আবিষ্কার ও নূতনত্ব প্রচলন করা উদ্যোক্তার প্রধান কার্য।

নূতন প্রচলন

উদ্যোক্তার এই সকল কাজ হইতে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাহাব স্থান কত গুরুত্বপূর্ণ ইহা বোঝা যায়। আধুনিককালে, চাহিদার স্থান হইতে বহুদূরে, দীর্ঘকালব্যাপী উৎপাদন-পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত হইয়াছে। স্থান ও কালের ব্যাপারে বাজার হইতে বহুদূরে অবস্থিত উৎপাদন কেন্দ্র হইতে উদ্যোক্তাকে উৎপাদন চালাইতে হইতেছে। নূতন প্রতিযোগী ফার্ম ইতিমধ্যে কম ব্যয়ে উৎপাদন করিয়া ফেলিতে পারে, নূতন ফ্যাশনের দ্রব্য উৎপন্ন হইতে

পারে, ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে, বিদেশী প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়া উঠিতে পারে—এইরূপ অজানা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ব্যবসায়-সমুদ্রে উদ্যোক্তাকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারকে যন্ত্রবিজ্ঞানে রূপান্তরিত করিয়া ব্যয় না কমাইলে কোন ফার্ম প্রতিযোগিতায় টিঁকিবে না, বাজার ও ক্রেতাদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণা না করিলে ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগীদের হঠাইয়া নিজের দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। দেশে যে জটিল ধরনের ব্যাঙ্ক, বীমা ব্যবস্থা, শেয়ার-বাজার ও মূলধনের বাজার সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে ফার্মের সুনাম রক্ষা করিয়া প্রয়োজনমত মুনাফা তুলিতে না পারিলে চলিবে না। এই যুগে, তাই বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তিসম্পন্ন উদ্যোক্তাশ্রেণী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্রমশ নেতৃস্থানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে।

আধুনিক যুগে তাহার গুরুত্ব

যৌথমূলধনী কারবারে সংগঠক কে? (Who is an Entrepreneur in a Joint Stock Company?)

উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে প্রধানত একক মালিকানায় ব্যক্তি উদ্যোগী উৎপাদন সংগঠিত হইত। উদ্যোক্তাগণ ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন উপাদান ভাড়া করিয়া উৎপাদন চালাইবার ব্যবস্থা করিতেন, দৈনন্দিন পরিচালনার কাজ চালাইতেন, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিতেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যৌথ-মূলধনী কারবার পরিচালিত হয় অংশীদারদের সাধারণ সভা, ডিরেক্টর সভা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর দ্বারা। এই ধরনের কারবারের বৈশিষ্ট্যই হইল কারবারের মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে পার্থক্য। সাধারণভাবে কারবারের দৈনন্দিন পরিচালনা করেন বেতনভুক কর্মচারীরা। শুধু তাহাই নহে। অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার দ্বিতীয় কার্য সিদ্ধান্ত-গ্রহণও শেয়ার ক্রেতারা করেন না। উদ্যোক্তার কাজে ভুল হইলে শেয়ারক্রেতাদের ক্ষতি হয়, তাঁহার কাজ ঠিক হইলে শেয়ারক্রেতাদের লাভ হয়। কিন্তু শেয়ারক্রেতাগণ নিজেরা দাম-নির্ধারণ, উপাদান সংগ্রহ ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করেন না, সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন না। ক্ষতি হইলে শেয়ারক্রেতাদের সাধারণ সভায় তাঁহারা চীৎকার করেন; ডিরেক্টর সভায় সভ্যদের উপর চাপ দেন। অনেক ক্ষেত্রে

যৌথমূলধনী কারবারে উদ্যোক্তা কে?

যদি শেয়ার ক্রেতাগণ আগ্রহশীল হইয়া ক্ষমতা ব্যবহার করেন

বহু ঘুমন্ত শেয়ার-ক্রেতা আছেন তাঁহারা সেই চেষ্টাও করেন না। ডিরেক্টর সভার বহু সদস্যও অনেক সময় বিশেষ চিন্তা করেন না; কোম্পানির ম্যানেজার ও দায়িত্বশীল কর্মচারিগণ যাহা বলেন, তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিয়া থাকেন। আধুনিককালে সাধারণত এইরূপই ঘটিতেছে। দাম নির্ধারণ, উৎপাদন ও পরিচালনাসম্পর্কীয় সকল ঝুঁকিবহুল কার্য বেতনভুক্ ম্যানেজার ও প্রধান কর্মচারীরাই চালাইতেছেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে উদ্যোক্তা হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা সাধারণত কোম্পানির শেয়ারক্রেতা নন, অর্থাৎ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ইহাদের আর্থিক লাভ হয় না; ভুল সিদ্ধান্তে নিজস্ব আর্থিক ক্ষতি হয় না। আধুনিক কালে তাই কোন ফার্মে নির্দিষ্টভাবে উদ্যোক্তা কে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, যদিও ফার্ম নিয়মিত ভাবে পরিচালিত হয়, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের কাজও চলে এবং ফার্মের ব্যবসায়িক উদ্যোগ (Business enterprise or initiative) দেখা যায়।

কিন্তু আধুনিক কালে অধীনস্থ উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ

তবুও তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিয়া আমাদের এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাইতে হয় যে যৌথ মূলধনী কারবারে শেষপর্যন্ত শেয়ার ক্রেতারাই উদ্যোক্তা। যদি তাঁহারা খোঁজখবর নেন, সক্রিয় থাকেন তবে তো তাঁহারা অনেকটাই উদ্যোক্তার কাজ করিতেছেন। আর যদি তাঁহারা ঘুমন্ত হন তবুও সর্বশেষ স্তরের দায়িত্ব তাঁহারাই বহন করিতেছেন। বর্তমানে ঘুমাইলেও তাঁহারা একবার সঠিক কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ লাভ লোকসানের দায়িত্ব বহন করিতেছেন। সুতরাং শেয়ার ক্রেতারা উদ্যোক্তার কার্য ও দায়িত্ব অনেকাংশে বেতনভুক কর্মচারীদের হাতে ছাড়িয়া দিতেছেন, হয়ত বেশির ভাগ কাজই নিজেরা করেন না। তবুও শেয়ার-ক্রেতারাই সম্মিলিত উদ্যোক্তা।

আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সব ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে সরকারী কর্মচারীরাও উদ্যোক্তায় পরিণত হইতেছে, আর ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যবসায়ীর ন্যায় মনে করা চলে না। যে-কোন উপায়ে মুনাফা বৃদ্ধি করিয়া ও কারবার বাড়াইয়া তুলিয়া, প্রতিযোগীদের ছলে-বলে-কৌশলে পরাস্ত করিয়া, অক্লান্ত উদ্যমের সহিত নিত্যনূতন দ্রব্যসামগ্রী, উপাদান, যন্ত্রপাতি ও বাজার সৃষ্টি করিয়া ব্যবসা-জগতে ফার্মকে

জাতীয়করণের ফলে রাষ্ট্রীয় কারবারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সরকারী কর্মচারিগণ উদ্যোক্তা শ্রেণীতে পরিণত হইতেছেন

ও লোকজগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা—ইহাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর উদ্যোক্তার রূপ। যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানের পর রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কারবারের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় দায়িত্বশীল পদস্থ সরকারী কর্মচারীশ্রেণী বর্তমানে প্রধানত উদ্যোক্তার কাজ চালাইতেছে।

অনুশীলনী

1. "The Law of Diminishing Returns is only one phase of the universal Law of Variable Proportions." (C.U. B.Com. '51)

2. Explain why the Law of Diminishing Returns prevails in agriculture and the Law of Increasing Returns mainly in manufacture.

3. Explain the conditions which lead to the operation of the Law of Diminishing Returns. Is this Law incompatible with the economies of large scale production ? (C.U.B.Com. 1951, 1955)

4. 'Reflection on the characteristics of land give us one of the most famous of Economic Laws—the Law of Diminishing Returns." Explain. (C.U. B. Com. 1958)

5. Discuss the functions of the entrepreneur and his importance in the modern industrial organisation.

6. Explain and illustrate what you mean by the Laws of Diminishing and Increasing Returns. (C.U. B.A. 1955)

7. What is capital ? Is Money capital ? Justify your answer by appropriate reasoning. (C.U. B.A. 1955)

8. "The Laws of increasing and diminishing returns are often cited as if they were in some way parallel to one another. But they are quite distinct." Explain this statement. (C.U. B.A. 1960)

9. Explain the characteristics of land as a factor of production and deduce therefrom the Law of Diminishing Returns.

10, State the Law of Diminishing Returns, Does it apply to manufacturing industries ?

5

উদ্যোক্তার বিভিন্ন সাংগঠনিক রূপ

(Forms of Entrepreneurial Organisation)

এক-মালিকানা ব্যবসায় (Single Entrepreurship)

একজন মালিক কোন ফার্মের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা সব যদি নিজে করেন তাহা হইলে সেই ব্যবসায়কে এক মালিকানা বলে। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই এক-মালিকানা ব্যবহারের প্রচলন আছে। মুনাফা করিতে পারিলে সেই মালিকই মুনাফা সম্পূর্ণরূপে একা ভোগ করেন। লোকসানের ঝুঁকিও তিনি একা বহন করেন। এইরূপ ব্যবসায়ের কয়েকটি সুবিধা আছে।

এক মালিকানার সুবিধা

(ক) ইহাতে অপব্যয় কম হয়। যে ব্যবসায় মালিক নিজে সর্বদা পরিদর্শন ও পরিচালনা করেন সেই ব্যবসায়ে অপব্যয় হওয়া শক্ত, বেতনভুক্ কর্মচারীর চক্ষে যে-ব্যয়বাহুল্যের কারণ ধরা পড়ে না, মালিকের চক্ষে সে অপব্যয় নিশ্চয় ধরা পড়িবে।

(খ) মাত্র একজন মালিক থাকায় ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি দ্রুত গ্রহণ করিতে পারেন , কাহারও সহিত আলেচনা বা কাহারও মত লইবার প্রয়োজন হয় না। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা থাকায় যৌথ-মূলধনী বা অংশীদারী সংগঠনের তুলনায় ইহা সহজে টিঁকিয়া যাইতে পারে।

(গ) মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক সৌহার্দ্র্যপূর্ণ থাকে। শ্রমিকদের অবস্থা মালিক স্বচক্ষে সর্বদা দেখিতে পান, শ্রমিকরাও প্রয়োজন হইলে সরাসরি মালিকের শরণাপন্ন হয়, মালিকের নিজস্ব উপস্থিতি শ্রমিকদের কাজে উৎসাহিত করে। দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্য দিয়া উভয়ের সম্পর্ক সাধারণত সম্প্রীতিপূর্ণ থাকে।

(ঘ) একক মালিক দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকেন এবং জনসাধারণের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারেন। বহু-মালিকানা থাকিলে ইহাতে অসুবিধা হইতে পারে।

কিন্তু এইরূপ সংগঠনের অনেক ত্রুটি আছে। (ক) মূলধনের স্বল্পতা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রধান অসুবিধা। আধুনিক কালের বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন কখনই

অল্প মূলধনের দ্বারা সম্ভব নহে। (খ) তাহা ছাড়া, এইরূপ ব্যবসায়ে ঝুঁকিও অত্যধিক কারণ একজন মালিকই সকল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিয়া থাকেন। আজকাল কৃষি, হোটেল, খুচরা বিক্রয়ের দোকান প্রভৃতি ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদন-ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবসায়ের প্রচলন থাকিলেও বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে ইহারা দ্রুত অপস্যয়মান।

এক-মালিকানার অসুবিধা

অংশীদারী ব্যবসায় (Partrership)

অল্প কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া কোন ব্যবসায়ের মালিক হইলে এবং সকলে মিলিতভাবে তাহা পরিচালনা করিলে উহাকে অংশীদারী ব্যবসায় বলা হয়। ইহার দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, অংশীদারদের মিলিতভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইবে, এবং দ্বিতীয়ত, কোন অংশীদারের আর্থিক লেনদেনের দায়িত্ব অপর অংশীদারদেরও গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণত অংশীদারী ব্যবসায় অসীম-দায়সম্পন্ন (unlimited liability)। অংশীদারের মধ্যে দ্বিধাহীন পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া এই ব্যবসায় চলে।

বৈশিষ্ট্য

অংশীদারী ব্যবসায়ের সুবিধা অনেক। (১) ইহা একক মালিকানা ব্যবসায়ের তুলনায় অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ কবিতে পারে। একা যে-পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করা সম্ভব তাহার তুলনায় কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া অধিকতর ঝুঁকি গ্রহণ করিতে পারেন। (২) পরিচালনার মোট কাজ বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন অংশীদার পরিচালনার এক এক দিকে দক্ষতা লাভ করেন—ফলে মোট দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। (৩) ইহার সাংগঠনিক কাঠামো খুবই নমনীয় (flexible)। প্রয়োজন হইলে নূতন অংশীদার গ্রহণ করিয়া মূলধন বা পরিচালন-যোগ্যতা বাড়ানো সম্ভবপর। (৪) যেহেতু মিলিতভাবে সকলের নিকট হইতে বা যে-কোন অংশীদারের নিকট হইতেই কোম্পানীর ঋণ আদায় করা সম্ভব, সেইজন্য অংশীদারী ফার্মের পক্ষে বাজারে ঋণ পাইবার সুবিধা থাকে। (৫) ব্যবসায়ের ঋণের জন্য প্রতিটি অংশীদারের দায় অসীম বলিয়া অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যায় ঝুঁকি কেহ লন না, ইহাতে ব্যবসায়িক স্থায়িত্ব ও রীতিনীতি রক্ষিত হয়।

সুবিধা

কিন্তু ইহার বহু ত্রুটি ও অসুবিধাও আছে। (১) অংশীদারদের মধ্যে মতের অমিল হইলে পরিচালনযোগ্যতা হ্রাস পায়। (২) কোন অংশীদারের মৃত্যু

হইলে বা ব্যবসায় হইতে কোন অংশীদার সরিয়া আসিতে চাহিলে অংশীদারী সংগঠন ভাঙ্গিয়া যায়। (৩) সাধারণত ধনী ব্যক্তিরা সম্পত্তি ও সম্পদ হারাইবার ভয়ে অংশীদারী ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে চাহেন না, কারণ ব্যবসায়ের দায় অসীম। ইংলণ্ডে, অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন অংশীদারী ব্যবসায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) আধুনিক যুগে উৎপাদনের পক্ষে যে-পরিমাণ মূলধন দরকার তাহা কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া সংগ্রহ করিতে পারেন না, বা যে পরিমাণ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয়, তাহা কয়েকজনের পক্ষে সম্ভব নয়।

অসুবিধা

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Company)

বহু ব্যক্তি একত্রে মূলধন সংগ্রহ করিয়া এবং সংঘবদ্ধ পরিচালনার দ্বারা যে-ব্যবসায় গড়িয়া তোলে, তাহাকে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বলে। অর্থ নৈতিক কাজকর্মে এই প্রতিষ্ঠানের একটি পৃথক সত্তা থাকে। কোম্পানি নিজের নামেই ব্যবসায় চালায়, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণ গ্রহণ ও ঋণ দান, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি সকল কিছু এই প্রতিষ্ঠান নিজের নামে করিতে পারে। প্রথম দিকে কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিয়া, কি কি ব্যবসায় করিবে এবং কোম্পানির নিয়মাবলী সংক্রান্ত স্মারক-লিপি (Article of Memorandum) জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া শেয়ার বা অংশ-পত্র বিক্রয়ের দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিবে। সেই শেয়ারক্রেতাগণ সভায় মিলিত হইয়া ভোটাধিকার প্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া একটি পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) গঠন করিবে। প্রতি বৎসর নূতন পরিচালকমণ্ডলী গঠনের অধিকার কোম্পানির শেয়ার-ক্রেতাদের থাকে। এই 'পরিচালকমণ্ডলী' কোম্পানি চালাইবার উপযোগী উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিবে এবং বাৎসরিক সভায় গৃহীত নীতি অনুযায়ী ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের কার্য করিবে। এইভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনাই যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য, যদিও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকজন উদ্যোক্তা বা শেয়ার-ক্রেতার হাতেই আসল পরিচালন ক্ষমতা চলিয়া যায়।

কি ভাবে গঠিত ও পরিচালিত হয়

কি ভাবে মূলধন সংগৃহীত হয় (How Capital is raised)

সাধারণত, যৌথ-মূলধন প্রতিষ্ঠান দুইটি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে: শেয়ার বা স্টক বিক্রয়, এবং ডিবেঞ্চার বা বণ্ড বিক্রয়। শেয়ার বা স্টক হইল

কোম্পানির অংশপত্র, ইহার ক্রেতারা কোম্পানির স্বত্বাধিকারী, ডিবেঞ্চার হইল কোম্পানির ঋণ-পত্র, ইহার ক্রেতারা কোম্পানিকে ঋণদানকারী। শেয়ারক্রেতাদের আয় হইল লভ্যাংশ (Dividend), তাহা মোট মুনাফা এবং উহার বণ্টননীতির উপর নির্ভরশীল ; ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের আয় হইল সুদ, তাহা ডিবেঞ্চার-ক্রয়ের সময়েই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। অন্যান্য সকলকে মিটাইয়া দেওয়ার পরেই শেয়ার-ক্রেতাদের লভ্যাংশ পাইবার সম্ভাবনা।

শেয়ার ও বণ্ড

ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ সর্বাগ্রে তাহাদের পাওনা পাইয়া থাকেন। কোম্পানি যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে ডিবেঞ্চার-ক্রেতাদের পাওনা প্রথমে মিটিবে ; শেয়ার-ক্রেতাদের পাওনা সর্বশেষে। সংক্ষেপে, শেয়ার-ক্রেতাদের ঝুঁকি সর্বাধিক ; ডিবেঞ্চার-ক্রেতাদের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম।

বণ্ড বা ডিবেঞ্চার বহু প্রকারের থাকিতে পারে। কোন কোন ডিবেঞ্চারে নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তি (যেমন বাড়ি, যন্ত্র ইত্যাদি) বন্ধক দেওয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, প্রথম-বন্ধকী বণ্ড, দ্বিতীয়-বন্ধকী বণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বণ্ড

বিভিন্ন প্রকারের বণ্ড

থাকে। কোম্পানি উঠিয়া গেলে প্রথম-বন্ধকী বণ্ড ক্রেতাগণ প্রথমে তাহাদের পাওনা পাইবে, তাহার পরে দ্বিতীয়-বন্ধকী বণ্ড ক্রেতাগণের পাওনা মিটিবে। এইরূপে ডিবেঞ্চারে ঝুঁকির তারতম্য করা হয়। ঝুঁকি বেশি হইলে সেই বণ্ড হইতে আয় বেশি, ঝুঁকি কম হইলে উহাতে সুদ কম। বণ্ড ক্রেতারা নিজেদের ঝুঁকি বহনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার বণ্ড ক্রয় করিতে পারেন।

শেয়ারের ক্ষেত্রেও বহুপ্রকারের শেয়ার বা স্টক্ (অংশপত্র) থাকে। বহু শ্রেণীতে বিভক্ত এই শেয়ারগুলি বিভিন্ন পরিমাণের ঝুঁকিবহনেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট উপস্থাপিত করিলে শেয়ার ক্রেতা ও কোম্পানির উভয়েরই শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের সুবিধা হয়। সাধারণ শেয়ার (Ordinary Shares) সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিবহুল। নির্দিষ্ট লভ্যাংশ-দেয় শেয়ারের (Preference Shares) ক্রেতাদের লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট থাকে, কোম্পানির মুনাফা হইলে শেয়ার-ক্রেতা সেই নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায়, মুনাফা না হইলে লভ্যাংশ পায় না। নির্দিষ্ট লভ্যাংশ-দেয় শেয়ার হইতেও কম ঝুঁকিসম্পন্ন হইল ইহারই আর এক

বিভিন্ন প্রকার শেয়ার

ধরন। এইরূপ শেয়ারে যে কয় বৎসর মুনাফা না হওয়াও দরুন শেয়ার-ক্রেতা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইল না, পরবর্তীকালে মুনাফার বৎসরে সেই হারে সেই পুরাতন কয় বৎসরের লভ্যাংশও

পাইবে (Cumulative Preference Shares)। এইরূপ সর্বাগ্রে লভ্যাংশ-দেয় শেয়ারগুলি 'সংলগ্ন' (Participating) অথবা 'অসংলগ্ন' (Non-participating) হইতে পারে। সংলগ্ন শেয়ারগুলি নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইবার পরেও আবার সাধারণ শেয়ারের ন্যায় লভ্যাংশ পাইয়া থাকে। অপরপক্ষে, অসংলগ্ন শেয়ারগুলি শুধু নির্দিষ্ট হারেই লভ্যাংশ পায়।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে. যাহার ফলে ইহা অন্যান্য ধরনের প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথক। প্রথমত. শেয়ার-ক্রেতাদের অর্থাৎ মালিকদের দায় সীমাবদ্ধ (Limited Liability)। অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কোম্পানির ঋণের দায় অসীম ; মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেও ঋণ শোধ করিতে হইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোম্পানি ঋণ করিয়া উঠিয়া গেলেও কোন ব্যক্তি যে-মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিয়াছে উহার বেশি দায়িত্ব সেই শেয়ার-ক্রেতার নাই।

সীমাবদ্ধ দায় এবং মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে পার্থক্য

যেমন, 100 টাকার একটি শেয়ার ক্রয় করিয়া যদি কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ টাকাটাই কোম্পানিকে মিটাইয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার আর কোন দায় নাই। যদি 100 টাকার শেয়ারে (ধরা যাউক) 70 টাকা দেওয়া হইয়া থাকে (Paid-up) ; তবে বাকী 30 টাকা পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে আদায় হইতে পারে, ইহার বেশি নহে। অর্থাৎ কোম্পানির ঋণের জন্য কোন শেয়ার-ক্রেতারা দায়িত্ব নিজের নামে কেনা শেয়ারের মূল্য পর্যন্ত নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, যৌথ মূলধনী ব্যবসাতে ব্যবসায়ের মালিকানা ও দৈনন্দিন পরিচালনার মধ্যে পার্থক্য থাকে। যাহারা মালিক তাহারা বেতনভুক্ত কর্মচারীদের দ্বারা ব্যবসায়-পরিচালনার সাধারণ কাজগুলি সরাইয়া থাকেন।

সুবিধা (Advantage)

(১) বলাই বাহুল্য যে, আধুনিক যুগের বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনী ফার্মসমূহ গঠন করিতে হইলে যৌথ মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ছাড়া গত্যন্তর নাই : প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তির নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিয়া প্রভূত মূলধন সংগ্রহ করা ইহার পক্ষে সম্ভব। শুধু তাহাই নহে। অসংখ্য ব্যক্তি প্রত্যেকে স্বল্পমূল্যের

শেয়ার ক্রয় করার দরুন ঝুঁকি-বহুল উৎপাদন ও ব্যবসায় শুরু করা সম্ভব হয়, কারণ প্রত্যেকটি শেয়ার-ক্রেতার নিজস্ব ঝুঁকির পরিমাণ কম থাকে। (২) দায় সীমাবদ্ধ থাকায় এবং শেয়ারের দাম কম হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি কমিয়া যায়। (৩) কোম্পানিকে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া, যে-কোন শেয়ার-ক্রেতা নিজের প্রয়োজনে বা অপছন্দ হইলে, যখন খুশি শেয়ার বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ ফিরিয়া পাইতে পারে। (৪) শেয়ারগুলি হস্তান্তরযোগ্য অর্থাৎ ইহাদের যখন খুশি বিক্রয় করা সম্ভব। শেয়ার ক্রেতার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীরা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় শেয়ারের মালিকানা পাইয়া থাকে। সুতরাং শেয়ার-ক্রেতাদের মৃত্যুতে ফার্মের উৎপাদন-ধারার কোন ক্ষতি হয় না, তাহা অব্যাহত থাকে। (৫) আধুনিক সমাজে সাধারণ লোকদের ব্যবসায়ে যোগদান করিবার সুযোগ এই ধরনের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া সম্ভব। ইহার মাধ্যমে তাহারা ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাহায্যে অল্প দামের শেয়ার ক্রয় করিয়া বিনিয়োগের সুযোগ পাইতেছে। (৬) পরিচালনার যোগ্যতাবিহীন অর্থবান ব্যক্তি অর্থের বিনিয়োগ করিবার সুযোগ পায়; যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজের অর্থ না থাকিলেও (বেতনভুক্ কর্মচারী হিসাবে) ব্যবসায় পরিচালনার সুযোগ পায়। (৭) শেয়ার ক্রেতাদের মোট ঝুঁকি কম বলিয়া এই ধরনের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বহু অর্থ গবেষণা ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যয় করে। সভ্যতার অগ্রগতিতে ইহাদের দাম কম নহে।

অসুবিধা ও ত্রুটি (Difficulties and Defects)

(১) পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা সাধারণত সকল শেয়ার-ক্রেতাদের নিকট থাকে না। কয়েকজন বুদ্ধিমান চালক-চতুর ব্যক্তি একটি উপদল গঠন করিয়া শেয়ারের অল্পাংশের মালিক হইয়া সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পায়। ফলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বদলে পরিচালনার ক্ষেত্রে উপদলীয় চক্রান্তের আবহাওয়া দেখা যায়।

(২) মুষ্টিমেয় ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা থাকিলে যত প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া সম্ভব, যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানে তাহার সবই ঘটিতে পারে। কোম্পানির বাৎসরিক বিবরণীতে মিথ্যা প্রচার করা, আত্মীয়তোষণ ও স্বজনপোষণ, নিজদলের লোকদের লইয়া ভুয়া ব্যবসায়ের নামে দ্রব্য বা শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের দালালি করিয়া অর্থোপার্জন, শেয়ারের দামের উঠানামা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ

করা যাহাতে উপদলভুক্ত ব্যক্তিরা অন্যায়ভাবে আয় ও সুবিধা পাইতে পারে—এইরূপ বহু দোষ যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়েব সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

(৩) বেতনভুক্ কর্মচারীদের সাহায্যে পরিচালনার দরুন সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা দেওয়া সম্ভব নহে।

(৪) শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সাধারণত শান্তিপূর্ণ থাকে না। শ্রমিকগণ জানেনই না তাঁহাদের মালিক কাহারা, মালিকদের সম্বন্ধে কোন সহানুভূতি তাঁহাদের মনে সৃষ্টি হয় না, 'কোন এক অশরীরী অদৃশ্য যন্ত্রের হুকুমে চাকুরি করা'—এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। মালিকেরাও শ্রমিকদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন থাকিয়া কেবল মুনাফার তাড়নায় এরূপ অবস্থাব সৃষ্টি করেন যে সংঘষ অনিবার্য হইয়া উঠে। কোন বিবোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে মুখোমুখি অবস্থায় দুই পক্ষের মিলিত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ মালিকবৃন্দ সাবা পৃথিবীময় অগণিত শেয়ার-ক্রেতারূপে ছড়াইয়া থাকে।

(৫) ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আধুনিক একচেটিয়া ধনতন্ত্রবাদ এই যৌথ মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সৃষ্টি হইয়াছে। অল্পসংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিয়া অধিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার এবং একই শিল্পের অধিকাংশ ফার্মের কিছু কিছু শেয়ার কিনিয়া ইহাদের সকলকে নিজের হাতে আনার সুবিধা হইয়াছে। যেহেতু ফার্মের দৈনন্দিন পরিচালনার ভার নিজের হাতে লইবার প্রয়োজন হয় না, সেই হেতু এক ব্যক্তি সকল প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া দেশের সকল শিল্প ব্যাঙ্ক ও পুঁজির কারবারে মালিকানা লাভ করিতে পারেন। কয়েকজন ব্যক্তি সকল শিল্পেরই প্রধানতম ব্যক্তি হইয়া উঠেন, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পরিচালক হিসাবে গণ্য হইতে থাকেন। ইহারা বিভিন্ন শিল্পের ও ফার্মের প্রধান পরিচালক হিসাবে গণ্য হন এবং ক্রমে দেশের রাজনীতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। একই ব্যক্তি একটি শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ফার্ম বা শিল্পের পরিচালক হইতে পারে, ইহাকে পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত ডিরেক্টারী (Interlocking Directorship) বলে।

যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগের ঝুঁকি (Joint Stock Company and Risks of Investment)

(১) বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন চালাইতে গেলে প্রচুর পরিমাণে মূলধনের দরকার হয়। শুধু তাহাই নহে, সেই মূলধন সুদীর্ঘকাল ব্যবসায়ে আবদ্ধ থাকে। ঝুঁকিবহুল উৎপাদনে সেই মূলধন নিযুক্ত হয়। প্রধানত, সেই

মূলধন যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি প্রভৃতির আকারে কোম্পানির স্থির পুঁজিরূপে আবদ্ধ থাকে। স্থির পুঁজির স্থায়িত্ব যত দীর্ঘ হইবে, মূলধন বিনিয়োগকারী ব্যক্তিকে তত বেশি দিনের জন্য মূলধন নিজের আয়ত্তের বাহিরে রাখিতে হইবে। এই ধরনের দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ও বিশেষরূপে যন্ত্রে অর্থ বিনিয়োগের ত্রুটি এই যে, প্রয়োজন হইলে তখনই এই স্থির পুঁজিকে অর্থে রূপান্তরিত করা চলে না: প্রয়োজনমত নগদ অর্থে রূপান্তরিত করিতে পারিলে সেই বিনিয়োগ সুবিধা-জনক। কিন্তু বৃহৎ ও বিশেষ ধরনের যন্ত্রে বা স্থির পুঁজিতে মূলধন আবদ্ধ থাকিলে বিনিয়োগের এই তারল্য (liquidity) বজায় থাকে না।

অর্থ আয়ত্তের বাহিরে থাকার ঝুঁকি

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের সুবিধা হইল যে, যদিও কোম্পানির সকল সম্পত্তি এইরূপ স্থির পুঁজি এবং প্রয়োজনমত নগদ অর্থে রূপান্তরের অযোগ্য (Illiquid) অবস্থায় থাকে, ব্যক্তির বিনিয়োগের রূপ কিন্তু এই তারল্য বজায় রাখে। যে-ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে, সে ইচ্ছা করিলেই তাহার শেয়ারখানা প্রয়োজনমত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থে রূপান্তরিত করিতে পারে। ব্যক্তি বিনিয়োগ করে শেয়ার ক্রয় করিয়া, সেই শেয়ার সে তাহার সুবিধামত সময়ে ও দামে বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে অর্থ আয়ত্তের বাহিরে থাকার ঝুঁকি অনেক কমিয়া যায়।

(২) বিনিয়োগের আর একটি ঝুঁকি হইল মূলধন লোকসান যাইবার ভয়। বহুকাল পরে দ্রব্য বাজারে আসিবে, বহুদূরের বাজারে যাইবে, যে-বাজারের চাহিদা অনিশ্চিত সেইরূপ বাজারে গিয়া পড়িবে। ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি বহন করিয়া উৎপাদন করিতে হইবে, ভুল ভ্রান্তি, দুর্ঘটনা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হইতে পারে। এই সকল ভয় দূর করার ব্যাপারে যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে যথেষ্ট সহায়তা করে। (ক) প্রচুর মূলধন ও সুদক্ষ পরিচালন-যোগ্যতার সম্মিলন সাধনের ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের ঝুঁকি ও অনিচ্ছা কমিয়া যায়। (খ) যে-বিনিয়োগকারী যতখানি ঝুঁকি গ্রহণ করিতে চায় সে সেইরূপ বণ্ড বা শেয়ার ক্রয় করে। সমাজে ঝুঁকি গ্রহণের ইচ্ছা কাহারও বেশি কাহারও বা কম, সেই অনুযায়ী যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ঝুঁকিসম্পন্ন বণ্ড ও শেয়ারের ব্যবস্থা আছে। (গ) পৃথক-ভাবে প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য খুব কম এবং শেয়ার ক্রেতাদের দায় সীমাবদ্ধ থাকায় শেয়ার ক্রেতার ব্যক্তিগত এবং নিজস্ব ঝুঁকির পরিমাণ খুবই কম

অর্থ লোকসান যাইবার ঝুঁকি

থাকে। (ঘ) বর্তমানে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, বিনিয়োগকারী সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠা হওয়াতে ব্যক্তির ঝুঁকি নাই বলিলেই চলে, কারণ কোন ব্যক্তি এই সকল সংস্থার মাধ্যমে অর্থ-বিনিয়োগ করিলে ইহারা সেই ঝুঁকি নিজেরাই বহন করে। তাহা ছাড়া, এই সকল প্রতিষ্ঠানের অর্থ সামর্থ্য এবং এই বিষয়ে দক্ষতা অনেক বেশি, ফলে ব্যক্তির ঝুঁকি অনেক কমিয়া যায়। দুই একটি ক্ষেত্রে লোকসান হইলেও মোটের উপর সামগ্রিকভাবে ইহাদের ক্ষতি হয় না।

সমবায় (Co-operation)

পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পুঁজির মালিক শ্রেণী ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ। শ্রমিকদের মতে, পুঁজির মালিকেরা শ্রমিকদের শোষণ করেন ; শ্রমিকেরা ধনোৎপাদন করেন বটে, কিন্তু সেই ধনের মালিক হন পুঁজির মালিক। পুঁজিপতি ও মালিক ছাড়া শ্রমিকগণ নিজেরাই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদনীফার্ম সংগঠন করিতে পারিলে এই শোষণ দূর করা যায়।

বৈশিষ্ট্য

পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে সকলে মিলিয়া মূলধন ও উদ্যোগশক্তি সরবরাহ করিয়া শ্রমিকেরা নিজেরাই একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করিলে তাহাকে 'সমবায়' বলা হয়। কোন একদল শ্রমিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে। অথবা সমিতির সভ্য কম সুদে প্রয়োজনমত ঋণ পাইবার উদ্দেশ্যে সমবায় ঋণ সমিতি স্থাপন করিতে পারেন। কম বা ন্যায্য দামে খাঁটি দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইতে পারে। পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া সকলে সুবিধার জন্য সমবায়-ক্রয় সমিতিও গঠিত হইতে পারে।

এইরূপ সমবায়ী ব্যবসায়ের সুবিধা হইল, ইহার ফলে সমিতির সভ্যদের আয় কিছুটা বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে (যেমন, সমবায় বিক্রয় সমিতির দরুণ) ব্যয় হ্রাস পায়। সমবায় উৎপাদন সমিতির ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ দূর হয়। শ্রেণী সংগ্রাম বিলুপ্ত হয়।

সুবিধা ও অসুবিধা

ইহার অসুবিধা হইল এই যে, উৎপাদনে উৎসাহ ও প্রেরণা কমিয়া যাইতে পারে। সকলের মিলিত দায়িত্ববোধের স্থলে সকলের মিলিত দায়িত্বহীনতা আসিয়া পড়িতে পারে। শৃঙ্খলা বজায় রাখা শক্ত হইয়া পড়ে। ব্যবসায়ে বা উৎপাদনে নেতৃত্ব ও পরিচালনার অভাব ঘটিতে পারে। এখন পর্যন্ত এইরূপ সমবায় সমিতি গুলির কার্য খুবই সীমাবদ্ধ।

রাষ্ট্র-পরিচালনা (Public Enterprise)

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন অবাধ বাণিজ্য নীতি (Laissez-Faire) প্রচলিত ছিল, তখন রাষ্ট্র কর্তৃক কোন শিল্প বা ব্যবসায়ের মালিকানা গ্রহণ ও পরিচালনা অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বর্তমানে ধনবিজ্ঞানীগণ আর সেই নীতি স্বীকার করেন না। বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রের মালিকানায় এবং পরিচালনায় সকল দেশেই আজকাল কম বা বেশিসংখ্যক শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গুলি পরিচালিত হইতেছে। এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা সামগ্রিক ভাবে দেশের জনসাধারণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় এবং একচেটিয়া একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হইলে দেশের পক্ষে ব্যয়সংকোচশীল (economical) যেমন রেলপথ, যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি। ইহাদের রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত হওয়া উচিত, পৃথিবীর সকল দেশেই আজকাল এইরূপ ধারণা দেখা দিয়াছে। সরকারী ও আধা-সরকারীভাবে বিরাট আর্থিক বা শিল্পসংস্থাসমূহ পরিচালিত হইলে দেশের পক্ষে কল্যাণকর, ইহা আজকাল প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

কেন ইহার উৎপত্তি ও প্রসার হইতেছে

সাধারণত, চারিটি পদ্ধতিতে সরকারী মালিকানাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয়। প্রথমত, উহা সরকারের দপ্তর হিসাবে পরিচালিত হইতে পারে, যেমন পোস্ট অফিস। দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত স্বাধীন করর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে, যেমন দামোদর ভ্যালি করর্পোরেশন। তৃতীয়ত, আধা-সরকারী বোর্ডের বা কমিটির দ্বারা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতে পারে, যেমন, রেলওয়ে বোর্ড। চতুর্থত, যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়া অধিকাংশ শেয়ার সরকার ক্রয় করিয়া সাধারণ যৌথ কোম্পানীর পদ্ধতিতে ইহা পরিচালিত হইতে পারে, যেমন হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড।

পরিচালনার সাংগঠনিক রূপ

আধুনিককালে রাষ্ট্র-পরিচালনায় স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। যেমন, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে পরিচালিত শিল্পসংস্থাসমূহ সাধারণত মুষ্টিমেয় মালিকদের মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না, জনকল্যাণই ইহার প্রকৃত লক্ষ্য থাকে। সুতরাং সবনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা করার জন্য ইহা অন্যান্য ব্যবসায়িক ফার্মের ন্যায় নিজের দাম বা উৎপাদন নীতি নির্ধারিত করে না। তাই ভোগকারীরা কম দামে ভাল জিনিস পাইতে পারে। সরকার কম

স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

সুদে টাকা ধার পায়, সুতরাং উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে। ব্যক্তিগত ব্যবসাদারেরা সমাজে ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক অসাধুতা প্রচলন ও সমর্থন করে, সরকারী ব্যবসাতে তাহাদের সেইরূপ সুযোগ থাকে না। কিন্তু সরকারী পরিচালনার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখানো হইয়া থাকে। যেমন অনুন্নত দেশের রাষ্ট্রগুলিতে পুরানো প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি কিনিয়া লইবার মত মূলধন সরকারের নাই। অল্পস্বল্প যাহা আছে তাহা দিয়া নূতন শিল্প স্থাপন করা ভাল। তাহা ছাড়া কর আদায়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, সে ক্ষতিও বিচার করা প্রয়োজন। সর্বোপরি, সরকারী কর্মব্যবস্থা, বিশেষত, অনুন্নত দেশগুলিতে, শিল্প পরিচালনার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়; রুটিন মাফিক কাজ, দীর্ঘসূত্রতা, উদ্যমহীনতা প্রভৃতি দোষগুলি ইহাতে দেখা দিবেই। চাকুরিজীবি সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা ইহারা পরিচালিত হয়, উপযুক্ত উদ্যম ও প্রেরণা তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না।

অনুশীলনী

1. Examine the reason for the predominance of Joint stock companies over other forms of business organisation.

2. What are the different kinds of shares issued by Joint stock Companies? In what respects is a joint stock company superior to a partnership?

3. Compare the advantages and disadvantages (a) the simple proprietorship (b) the partnership, (c) the Corporation form of business organisation.

4. What are the advantages and disadvantages of different kinds of security?

6

উৎপাদন সংগঠন

Organisation of Production

বিশেষায়ণ (Specialisation)

বর্তমান সমাজে মানুষ বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করে ; কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, সে নিজে সেই সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে না। হয়তো ইচ্ছা করিলে কাহারও পক্ষে অনেক প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব ; কিন্তু তাহা না করিয়া মাত্র এক প্রকার বা একটি দ্রব্যের উৎপাদন সে নিজে করে, এবং অপরের উৎপাদিত অন্য দ্রব্যাদি নিজের দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া লয়। নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা বিভিন্নমুখী উৎপাদন ক্ষমতা বিসর্জন দিয়া একটি নির্দিষ্ট দিকে ব্যক্তির সামর্থ্যকে সীমাবদ্ধ রাখা এবং উৎপাদন-ধারায় নিয়মিতভাবে একটি বিশেষ ধরনের কার্য করাকে বিশেষায়ণ (Specialisation) বলে।

কাহাকে বলে

আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিশেষায়ণ। অ্যাডাম্ স্মিথ্ 1776 সালে তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রম-বিভাগ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন যে শ্রমিকের উৎপাদনীশক্তির সর্বাধিক উন্নতি, তাহার দক্ষতা, নিপুণতা ও উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি—এই সব কিছুর মূলে রহিয়াছে শ্রম বিভাগ। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন এক বিশেষ গুণ আছে, সেই অনুযায়ী উহাকে কোন এক দিকে সর্বতোভাবে নিয়োগ করিলে সে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পদ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি যদি সেই দ্রব্য উৎপাদনেই নিযুক্ত হয় তাহা হইলে সমাজের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তির শক্তিসমূহের পূর্ণ ও উপযুক্ত ব্যবহার হয়।

শ্রম বিভাগ

আদিম সমাজেও শ্রম-বিভাগ প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোক গৃহের কার্যাদি করিত, পুরুষেরা শিকার এবং কৃষিকার্য করিত। বর্তমানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পুরাতন শ্রম-বিভাগ ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। উহার পরবর্তী স্তরে, একদল লোক সমাজে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিত, অপর কিছু লোক অন্যান্য দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত হইত ; কেহ ধান, কেহ কাপড়, কেহ বা নৌকা। কোন কোন দ্রব্য উৎপাদনের মোট ধারার সম্পূর্ণটাই তাহারা উৎপন্ন করিত। এইরূপে

শ্রম বিভাগের ক্রমপ্রসার

সমাজে বৃত্তিবৈশিষ্ট্য বা বৃত্তিনির্দিষ্টতা দেখা দিয়াছিল। প্রাচীন ভারতেব এক একটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী বা কার্য-সম্পদকারী শ্রেণী রাখিয়া দেওয়া হইত। গ্রামের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য গ্রামেই বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বারা উৎপন্ন হইত।*

কিন্তু আধুনিক জগতে শ্রমবিভাগ আরও প্রসার লাভ করিয়াছে। একটি দ্রব্য উৎপাদনের মোট পদ্ধতি বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হইয়াছে. এবং ক্রমশই বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্রতম অংশে পরিণত হইতেছে। এক একদল মানুষ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত আছে।

শ্রমবিভাগের ফলই সহযোগিতা। যেহেতু মানুষ সকল দ্রব্য নিজে উৎপাদন করে না, এমন কি একটি দ্রব্যের সম্পূর্ণ ধারা উৎপাদন করে না, সেই হেতু তাহার অভাব মিটাইতে হইলে অন্যের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়।

বিশেষায়ণ সহযোগিতা ও বিনিময়

এইভাবে সকলেই অন্যের উপব নির্ভরশীল বলিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব ভিত্তি বলা চলে। যতদিন সমাজে বিশেষায়ণ ছিল না, ততদিন সহযোগিতা না করিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু বিশেষায়ণের ক্রমপ্রসারেব ফলে সহযোগিতা ব্যতীত সকল অভাব মোচনের কোন উপায় আর বতমান সমাজের ব্যক্তিদের নাই।

এই বিশেষায়ণের একটি ফল হইল বিনিময়, কাবণ নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে অপরের উৎপন্ন দ্রব্য না পাইলে শ্রমবিভাগ সচল থাকা অসম্ভব।

শ্রমবিভাগের সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and disadvantages of Division of Labour)

শ্রমবিভাগের অনেক সুবিধা আছে। (ক) সমাজে জনসাধারণের মধ্যে যে-কাজে যাহার যোগ্যতা (ability) সর্বাধিক সে সেই কাজে তাহার শক্তি নিয়োগ করে। তাহার ফলে দক্ষতা ও নিপুণতা বৃদ্ধি পায়। বহুবার অভ্যাসের ফলে অল্প পরিমাণ সমান ধরনের কাজ খুব সহজসাধ্য হইয়া উঠে, শ্রমিকের উৎপাদনী-শক্তি বৃদ্ধি পায়। (খ) শ্রমবিভাগের ফলে সময়ের ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে। কম সময়ের মধ্যে শ্রমিক তাহার কাজ শিখিতে পারে, কারণ উৎপাদনের সম্পূর্ণ ধারা তাহাকে শিক্ষা করিতে হইতেছে না; অল্প একটু অংশ শিখিলেই তাহাব কাজ চলিবে। (গ) শ্রমবিভাগ না থাকিলে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সকল

* এইরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি সামন্ত যুগের ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং পৃথিবীতে সামন্ততন্ত্রের একটি বিশেষ ভারতীয় রূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

প্রকার যন্ত্র থাকা দরকার হয়; সে যখন একটিতে উৎপাদন করে, তখন অপর স্তরের যন্ত্রগুলি অলস হইয়া বসিয়া থাকে। এইভাবে যন্ত্রেরও অপচয় ঘটে। কিন্তু শ্রমবিভাগ থাকার দরুণ একটি যন্ত্রের দ্বারাই একব্যক্তি সারাদিন উৎপাদন করে, কোন যন্ত্র অলস থাকে না, অপচয় হয় না। তাহা

গুণসমূহ

ছাড়া, কোন একটি যন্ত্রের কাজ শেষ হইলে শ্রমিককে উঠিয়া গিয়া নূতন স্তরের যন্ত্রের সাহায্যে তাহা দ্বারা উৎপাদন শুরু করিতে প্রচুর সময়ের অপচয় হয়, শ্রমবিভাগ চালু থাকিলে সেরূপ সময় অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে না। (ঘ) উৎপাদন ধারাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হইলে প্রত্যেক অংশের কাজ মোটামুটি ছকে-বাঁধা ধরনের হইয়া যায়, ইহার ফলে সেই কাজটুকুর জন্য যন্ত্রের ব্যবহার ও আবিষ্কার সম্ভবপর হয়।

অসুবিধার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় যে, (ক) ইহার ফলে ব্যক্তির কাজের পরিধি সংকুচিত হয়, ফলে তাহার দৃষ্টিভঙ্গিও সংকুচিত হইয়া যায়। (খ) একই ধরনের কাজ সদাসর্বদা করার ফলে একঘেয়েমি ও বিরক্তিকর মনোভাবের সৃষ্টি হয়। (গ) ব্যক্তি তাহার মনের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সৃজনীশক্তি হারাইয়া ফেলে এবং যন্ত্রের একটি অংশ মাত্রে পরিণত হয়। (ঘ) মনের সংকীর্ণতার ফলে উপদলীয় ক্ষুদ্র মনোভাবের সৃষ্টি হয়, সমাজের সাধারণ স্বার্থের কথা চিন্তা করে না। (ঙ) উৎপাদনধারা বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায়, কোন ক্ষুদ্র অংশ

দোষসমূহ

উৎপাদনকারী শ্রমিকদের দল কাজ বন্ধ করিলে অন্যান্য সকল ধারার কাজ বন্ধ হইয়া এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। (চ) সর্বোপরি, শ্রমবিভাগের ফলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে যে ফ্যাক্টরী-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নানাবিধ দোষ দেখা যায়। শহুরে আবহাওয়া, গ্রাম্য জীবনের সহিত সম্পর্কচ্যুত শহরের ক্লেদাক্ত এবং বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সৃষ্টির আনন্দ হইতে বঞ্চিত মানুষের দল, সুস্থ মনের অভাব, সকল কিছু ইহার ফলে দেখা দিয়াছে। অর্থনৈতিক কাঠামোতে বেকারির সম্ভাবনা বাড়িয়াছে, কারখানায় অধিকোৎপাদনের ক্ষমতা-সৃষ্টির ফলে পূর্বের তুলনায় ব্যবসায় ও শিল্পে বাণিজ্য-সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রমবিভাগ প্রসারের সীমা (Limits to Division of Labour)

উৎপাদন ধারাকে ক্রমাগত ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করিয়া যতদূর খুশি শ্রমবিভাগের প্রসার ঘটানো বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিভিন্ন কারণের দ্বারা শ্রম-

বিভাগের প্রসার সীমাবদ্ধ। (ক) প্রত্যেক উৎপাদন-পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদান-সম্মিলনে গঠিত হয়। কোনো শিল্পে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে কোন্ উৎপাদন-সম্মিলন গ্রহণ করা হইবে তাহা আজকাল মোটামুটিভাবে স্থির থাকে এবং সঠিক উৎপাদন-পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট থাকে। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তার পক্ষে সেই পদ্ধতি ও উৎপাদন সূত্র অনুযায়ী কাজ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও তাহার প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে না, উৎপাদন-সূত্র অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও প্রচলিত শ্রমবিভাগ মানিয়া কাজ চালাইতে হয়। সকল শিল্পে সমান শ্রমবিভাগ সম্ভব নয়, শিল্প ও উৎপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী ইহার প্রসার সীমাবদ্ধ থাকে। (খ) অ্যাডাম্-স্মিথ্ বলিয়াছেন, শ্রমবিভাগ বাজারের বিস্তৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাজার ছোট হইলে ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন হয়, শ্রমবিভাগের প্রসার সম্ভব হয়, বাজার বড় হইলে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের ধারাকে বিভক্ত করা প্রয়োজন হয়, শ্রমবিভাগ প্রসারিত হইতে পারে। (গ) শ্রমবিভাগের প্রসার নির্ভর করে মূলধনের পরিমাণের উপর। অধিক মূলধন থাকিলে যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্ভব, উৎপাদনের ধারা বিভক্ত করিয়া যন্ত্রপাতির প্রয়োগ করা চলে। (ঘ) যন্ত্র-সম্বন্ধে জ্ঞানের উপরও শ্রমবিভাগের প্রসার নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশসমূহে মূলধন ও যন্ত্র জ্ঞানের অভাবের দরুন এতদিন শ্রমবিভাগ বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

যান্ত্রিক পদ্ধতির নির্দিষ্টতা, বাজারের বিস্তৃতি, মূলধনের পরিমাণ ও যন্ত্র-প্রবর্তনের প্রসার

যন্ত্র (Machinery)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডের এবং ইউরোপের দুই একটি দেশে নূতন কয়েকটি যন্ত্রের আবিষ্কার হয় এবং শিল্প ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগ শুরু হয়। ইহার ফলে সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধতিতে ক্রমশ বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয়, মানুষ দ্বারা পরিচালিত যন্ত্রসমূহ উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত হইতে শুরু হয়। বিজ্ঞানের উন্নতি ও যন্ত্রের প্রসার পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, মানব সভ্যতা যন্ত্রযুগে উত্তরণ করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে এই মৌলিক পরিবর্তন ইতিহাসে শিল্পবিপ্লব নামে পরিচিত। ইহার ফলে ক্রমশ কল-কারখানা বাড়িতে থাকে, বৃহৎ আকারের ও অধিক উৎপাদনশীল যন্ত্র উৎপন্ন হইতে থাকে, উৎপাদনের মাত্রা বাড়ে, বিক্রয় বৃদ্ধি পায় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি

যন্ত্র ও শ্রমবিভাগ

হয়। শ্রমবিভাগের প্রসার ও যন্ত্র প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ধারাকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করার সুবিধা হয়। এই যন্ত্র-প্রচলনের অর্থনৈতিক ফলাফল পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার ফলে মানুষের জীবনে উপকার ও অপকার উভয়ই সাধিত হইয়াছে।

সুবিধা

(ক) যন্ত্র প্রচলনের সর্বাধিক সুবিধা হইল যে, প্রকৃতির অন্ধ শক্তিসমূহকে মানুষ নিজের অভাব মিটাইবার উপযোগী দ্রব্য-উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করিয়াছে, কৃপণা প্রকৃতির অনিচ্ছুক হাত হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া মানুষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়াইয়া তুলিয়াছে। (খ) মনে রাখিতে হইবে, যে উচ্চ জীবনযাত্রার মান লইয়া আজিকার মানব সভ্যতার গর্ব, তাহার ভোগ্য দ্রব্যসম্ভারের যে-অফুরন্ত ভাণ্ডার, তাহা যন্ত্রেরই দান। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের প্রভাব খর্ব করিয়া যন্ত্র কৃষির উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। (গ) মানুষের শক্তির তুলনায় যন্ত্রের সাহায্যে অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াতে নিয়োগ করিতে পারা যায়, পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলির হাত হইতে মানুষ অব্যাহতি পায়; অনেক বেশি শক্তিশালী কাজ করিতে সক্ষম হয়। (ঘ) যন্ত্রের সাহায্যে কম সময়ে এবং অনেক বেশি পরিমাণে সমান আকৃতির ও সমগুণ-সম্পন্ন দ্রব্য একই উৎপাদন ধারার মাধ্যমে প্রস্তুত হইতে পারে। সূক্ষ্ম ও চুলচেরা সঠিক কাজকর্ম একমাত্র যন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব। (ঙ) কম শ্রমিকের দ্বারা ও কম সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্যোৎপাদন হওয়ার দরুন ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হয়।

অসুবিধা

কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার, (ক) বর্তমান যন্ত্র ও ফ্যাক্টরী-সভ্যতা মানুষের জীবনের সুখ-শান্তি কাড়িয়া লইয়াছে ইহাকে কোলাহলময় ও অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সর্বদা কোন্ অতৃপ্তি লইয়া মানুষ কিসের আশায় বাস করিতেছে, তাহা সে নিজেও জানে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কারখানার চারিপাশে শ্রমিক বস্তি স্থাপন করিয়াছে, আকাশ-বাতাস কলুষিত করিয়াছে, মুনাফার লোভে শোষণের মাত্রা তীব্রতম করিয়াছে। যন্ত্রকে ব্যবহার করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে মানুষই যন্ত্রের দাসে পরিণত হইয়াছে। (খ) যন্ত্রোৎপাদন প্রধানত একসঙ্গে অধিকোৎপাদন, ইহাতে দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষের তুলনায় পরিমাণগত আধিক্যের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। (গ) কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ হইল ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে নূতন-যন্ত্র-প্রচলনের ফলে মালিকেরা শ্রমিকের পরিবর্তে

যন্ত্র-নিয়োগের সুযোগ পাইয়াছে, শ্রমিক-শ্রেণীর সম্মুখে বেকারির আশঙ্কা যন্ত্র প্রচলনের ফলে গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রের উন্নতি সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতিকে মূলধন-প্রগাঢ় (Capital-intensive) করিয়া তুলিয়াছে, প্রত্যেকটি নূতন যন্ত্রের প্রচলন বহুসংখ্যক শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিতেছে।

যন্ত্রজনিত বেকারি

ধনবিজ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন যে, যন্ত্র জনিত বেকারি বহুদিন স্থায়ী হয় না, উহা অল্পকালীন ঘটনামাত্র। যন্ত্র-প্রচলনজনিত উদ্বৃত্ত-শ্রমিকদের মধ্যে এক অংশ পুরানো ফার্মেই থাকিয়া যাইবে, কারণ নূতন যন্ত্র চালাইতেও কিছু লোক দরকার হয়। কিছু শ্রমিক ওই যন্ত্র উৎপাদনের কারখানাতে নিযুক্ত হইবে, সেই যন্ত্র মেরামতের কাজেও কিছু শ্রমিক প্রয়োজন হইবে। যন্ত্রের প্রচলনের ফলে সেই দ্রব্যসামগ্রীর ব্যয় ও দাম কমিয়া যাইবে, সমাজের ভোগকারীগণ অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করার সুযোগ পাইবে। এইরূপে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে দেশে মোট কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি ও অবৈজ্ঞানিক সামাজিক কাঠামোর জন্য যন্ত্রকে দায়ী করা চলে না।

যন্ত্রের প্রচলন বন্ধ করিলে সর্বশেষে বিশ্লেষণে শ্রমিক শ্রেণীরই ক্ষতি হয়, কারণ তাহা হইলে দেশের মোট উৎপাদন ও সঙ্গে সঙ্গে মোট আয়ও কমিবে। মোট আয় কমিলে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর জন্য দেশের মোট কার্যকরী চাহিদাও কম হইবে, ফলে দ্রব্যের উৎপাদন ও শ্রমিকের কর্মসংস্থান উভয়ই হ্রাস পাইবে।

শিল্পে স্থানিকতা (Localisation of Industries)

কাহাকে বলে

দেশের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোন একটি বিশেষ শিল্পের অন্তর্গত অধিকাংশ ফার্ম স্থাপিত হইলে তাহাকে শিল্পের স্থানিকতা বলে। যে দ্রব্য উৎপাদনে সেই অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী, যে-দ্রব্য সর্বাধিক সুবিধার সহিত সেই অঞ্চলটিতে উৎপন্ন হইতে পারে, ওই অঞ্চল সেই দ্রব্য উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ করে; আঞ্চলিক বিশেষায়ণের বা শ্রমবিভাগের ফলই হইল শিল্পের স্থানিকতা। একটি অঞ্চলে কোন্ শিল্প গড়িয়া উঠিবে তাহা তিন প্রকার কারণের উপর নির্ভর করে:

(এক) অঞ্চলটিতে সেই শিল্পের উপযোগী প্রাকৃতিক সুবিধা (Natural advantages) কি পরিমাণ আছে তাহার উপর।

(দুই) কালক্রমে অঞ্চলটি সেই শিল্পের উপযোগী যে সুবিধাগুলি লাভ করিয়াছে সেই লব্ধ সুবিধাগুলির (Acquired advantages) উপর।

(তিন) একাধিক শিল্পের পক্ষে সেই অঞ্চলটি সুবিধাজনক হইলে উহাদের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে কোন্ শিল্প সেই সুবিধাকে সর্বাধিক সুযোগের সহিত ব্যবহার করিতে পারে, সেই তুলনামূলক সুবিধার (Comparative advantages) উপর।

(১) **প্রাকৃতিক সুবিধাসমূহ** : (ক) এমন অনেক শিল্প আছে যাহারা কোন বিশেষ স্থান ব্যতীত কখনই স্থাপিত হইতে পারে না, অন্যত্র স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে। যেমন, যে-অঞ্চলে মাটির নীচে খনিজ দ্রব্য আছে সেইখানেই খনি-শিল্প স্থাপিত হইতে পারে, অন্যত্র নয়। কিন্তু সকল শিল্প এইরূপ নহে। তাহারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পর্যালোচনা করিয়াই নিজের স্থান নির্বাচন করিয়া থাকে।

স্থান, আবহাওয়া, শক্তি শ্রমিক, কাঁচামাল, বাজার . সংক্ষেপে নিম্নতম উৎপাদন ব্যয়

(খ) জমি, আবহাওয়া ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া শিল্পের স্থান নির্বাচন হয়। যে-জমিতে যে-দ্রব্য বা যে আবহাওয়াতে যে-দ্রব্য উৎপাদনের সুবিধা বেশি তাহারা যেখানে স্থাপিত হয় (যেমন, পাহাড় অঞ্চলে চা উৎপাদন হয়)। (গ) যন্ত্র চালাইবার উপযোগী শক্তির উৎস যেখানে আছে, সেখানে সস্তায় শক্তি ব্যবহারের সুবিধা পাইবার জন্য শিল্প স্থাপিত হয়। পূর্বে জলশক্তি ছিল প্রধান, তাহার পরে বাষ্প প্রস্তুতের উপযোগী কয়লা বা পেট্রল, বর্তমানে বিদ্যুৎ-শক্তির উৎসের নিকটেই ফার্মগুলি স্থাপিত হওয়ার চেষ্টা করে। (ঘ) সস্তা মজুরিতে শ্রমিক পাইবার সুবিধা যে-অঞ্চলে আছে, অধিক পরিমাণে শ্রমিক-নিয়োগকারী ফার্মগুলি সেই অঞ্চলেই স্থাপিত হওয়ার চেষ্টা করিবে। (ঙ) যেখানে কাঁচামালের পরিবহণ-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম, শিল্পটি সেই অঞ্চলে স্থাপিত হইবে। যদি শিল্পটির একাধিক কাঁচামালের প্রয়োজন থাকে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহারা ছড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে সে অন্যান্য সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ করিয়া বাজারের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হওয়ার চেষ্টা করিবে। (চ) মালের অর্ডার পাইবার সুবিধা থাকিলে এবং বাজারে মাল পাঠাইবার ব্যয়-হ্রাসের উদ্দেশ্যে বাজারের নিকটবর্তী স্থানে শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করিবে।

মনে রাখা দরকার যে, কাঁচামাল ও বাজারের সান্নিধ্য, এই উভয় শক্তি শিল্পটিকে বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতে পারে। আবার, দ্রব্যটির বিভিন্ন বাজার বা কাঁচামালের বিভিন্ন উৎস থাকিতে পারে। সকল কিছু বিচার করিয়া যে-স্থানে তাহার উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম, ফার্মটি সেই স্থানেই

প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাঁচামাল ও দ্রব্যের প্রকৃতির উপরেও শিল্পের স্থানিকতা নির্ভর করে। এইরূপে বিভিন্নপ্রকার বিরোধী শক্তিসমূহের টানা-পোড়েনের চাপে তাহার স্থান নিধারিত হইবে।

(২) **লব্ধ সুবিধাসমূহ :** কোন অঞ্চলে একটি শিল্পের অন্তর্গত কয়েকটি ফার্ম স্থাপিত হইলে সেই অঞ্চলটি ঐই শিল্পের পক্ষে আরও উপযোগী হইয়া গড়িয়া ওঠে, ঐ দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী আরও সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। যেমন, উহার অনুপূরক শিল্প গড়িয়া উঠে, উপদ্রব্য (B · Product) প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়, সুদক্ষ শ্রমিকের যোগান বাড়িয়া যায়, শিল্পের পক্ষে উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদক সংঘ স্থাপিত হয়, সেই স্থানের ব্যবসায়িক সুনাম (goodwill) সৃষ্টি হয়। এই সকল লব্ধ সুবিধার (acquired advantages) আকর্ষণে নূতন ফার্মগুলি আসিয়া জড়ো হয়, ফলে লব্ধ সুবিধার পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়।

বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধাগুলি

(৩) **তুলনামূলক সুবিধা বা আপেক্ষিক সুবিধাসমূহ :** একটি স্থানে অনেক প্রকার শিল্প গঠনের উপযোগী উপকরণ থাকিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় সেই উপকরণ পাইবার জন্য এক প্রকার শিল্পের সহিত অন্য প্রকার শিল্পের দরাদরি চলে। উহাদের মধ্যে যে-শিল্পের ঐ অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক সুবিধা, সে ঐ উপকরণ-সমূহকে চড়া দাম দিয়া ক্রয় করিয়া লইতে পারে। এইরূপ তুলনামূলক সুবিধা অনুযায়ী কোন একটি শিল্প স্থান নির্বাচন করে এবং এই সকল কারণের ফলেই শিল্পের স্থানিকতা নির্ধারিত হইয়া যায়।

স্থান লইয়া শিল্পসমূহের সুবিধাগুলি

এই সকল সুযোগ-সুবিধা যে অঞ্চলে যত বেশি পরিমাণে পাওয়া যাইবে, ততই সেই অঞ্চলের স্থানিকতার মাত্রা (Degree of Localisation) অধিক হইবে। যে অঞ্চলে উপকরণ স্বল্প ও বিশেষ ধরনের, সেখানে শিল্পের বিশেষতা (specificity) অধিক। যে অঞ্চলে উপকরণের যত প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য, সেখানে শিল্পের বিভিন্নতা (diversity) তত বেশি।

স্থানিকতার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Localisation)

সুবিধা : (ক) শিল্পে স্থানিকতার প্রধান সুবিধা হইল, ইহার ফলে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কমিয়া যায়। উপাদান, শক্তি, বাজার প্রভৃতি নিকটে থাকায়

পরিবহণ-ব্যয় কম পড়ে ; সুতরাং ইউনিট-প্রতি ব্যয় কম হয়। (খ) যে অঞ্চলে ফার্মগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে, সেই অঞ্চলে প্রধান শিল্পের পরিপূরক অন্যান্য বহু শিল্প গড়িয়া উঠে, আঞ্চলিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। (গ) সেই শিল্পে কাজ করিতে ইচ্ছুক শ্রমিকগণ সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলেই কাজ পায় এবং সেখানেই তাহাদের শিক্ষা ও চাকুরির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। (ঘ) উৎপাদকগণ কাছাকাছি থাকেন বলিয়া তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার সুবিধা বেশি থাকে। তাঁহারা সকলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিষয়গুলি লইয়া আলোচনার অধিক সুযোগ পান এবং সাধারণ নীতি নির্ধারণ বা সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠনে তৎপর হইয়া উঠেন। (ঙ) সর্বোপরি, সেই অঞ্চলের ব্যবসায়িক সুনাম (goodwill) সৃষ্টি হয়, ফলে সেই অঞ্চলে স্থাপিত সকল ফার্মের দ্রব্যের বাজারই বিস্তৃতি লাভ করে।*

অসুবিধা : (ক) স্থানিকতার প্রধান অসুবিধা হইল অঞ্চলটির অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে একটি শিল্পের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। যদি সেই শিল্পের অবস্থা খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে সমগ্র অঞ্চলের অধিবাসীদের আয় ও ব্যয় কমিয়া যায়। অঞ্চলটির অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়, উহা দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে (Depressed area) পরিণত হয়। (খ) অনেক সময় সেই অঞ্চলের প্রধান শিল্পটি শুধু মাত্র পুরুষ-শ্রমিকদের নিয়োগ করে, ফলে মেয়ে-শ্রমিকগণ বেকার থাকে, পরিবারের আয় কম হয়। এইরূপ অবস্থায় বেশি মজুরি না দিলে কোন শ্রমিক সেই শিল্পে আসিতে চাহে না ; শিল্পের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর হইয়া উঠে। (গ) স্থানিকতার-হার খুব বেশি হইলে অঞ্চলটির স্বয়ংসম্পূর্ণতা এত কম থাকে যে, সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই বাহির হইতে আনিতে হয়। যদি হঠাৎ কোন কারণে বাহির হইতে দ্রব্যসামগ্রী যোগানের ধারা বন্ধ হইয়া যায়, তবে অঞ্চলটির অর্থ-নৈতিক দুর্দশা আসিয়া পড়ে। (ঘ) স্থানিকতার হার বেশি হইলে শিল্পসমূহ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়। শিল্পের এই ঘন সন্নিবেশ ঘটিবার ফলে অতিরিক্ত ভিড়,

* এই সকল সুযোগ-সুবিধাকে একত্রে বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচসমূহ (external economies) বলা চলে (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে)। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ শাই কোন অঞ্চলে শিল্পোন্নতি ঘটাইবার জন্য প্রথমে সেই অঞ্চলে নিজে এই সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বলা যায় যে, মিশ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজই হইল দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এই বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচগুলি ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া।

গৃহসমস্যা ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। (ঙ) ঘন-সন্নিবিষ্ট শিল্পাঞ্চল যুদ্ধের সময়ে অধিকতর বিপজ্জনক।

এই সকল কারণের ফলে আজকাল শিল্পসমূহকে সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ছড়াইয়া স্থাপন করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। দেশের সমস্ত অঞ্চলকে সমানভাবে শিল্পোন্নত করিয়া আঞ্চলিক দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলের (Depressed areas) সমস্যা দূর করা যাইতে পারে, সেইজন্য শিল্পের আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ (Delocalisation) প্রয়োজন। আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তাই বিভিন্ন রাষ্ট্র শিল্প প্রতিষ্ঠার স্থান-নির্বাচনের ক্ষমতা ক্রমশ নিজের হাতে তুলিয়া লইতেছে।

আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ —আধুনিক ঝোঁক

অনুশীলনী

1. Show how modern Industrial organisation is based upon Specialisation as well as Co-operation. (C. U. B. A. '51)

2. What is meant by Division of Labour? Discuss its merits and demerits and show how the modern society is based upon it. (C. U. B. A. 1953 '58)

3. What are the chief causes of the concentration of industries in particular localities? Indicate the good and evil effects of such concentration. (C. U. B. Com. 1954)

4. Describe how in the present economic organisation different economic activities are related to one another. (C. U. B. A. 1954)

7

উৎপাদনের মাত্রা
The Scale of Production

বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন কাহাকে বলে? (What is Large-scale Production)

দেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ফার্ম পাশাপাশি থাকিলেও দেখা যায় যে, আধুনিক কালে উৎপাদনী ফার্মসমূহের গড-আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকসংখ্যক শ্রমিক, প্রভূত পরিমাণ মূলধন, সুবৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে একসঙ্গে অধিক পরিমাণে দ্রব্যোৎপাদন—আধুনিক কালের উৎপাদন-সংগঠনের এই প্রকার ধরণকে বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন (Large-scale Production) বলা হয়।

মনে রাখিতে হইবে যে, বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন এবং বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদন এক নহে। ভারতে প্রত্যেক পরিবারে অম্বর চরকার সাহায্যে বস্ত্র উৎপাদন করিলে দেশে বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদন হইতে পারে, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদন। অপর পক্ষে, কোন একটি ফার্মে প্রচুর মূলধন ও শ্রমের সাহায্যে, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির দ্বারা সর্বোত্তম উৎপাদন-সূত্রের প্রয়োগ করিয়া সংগঠনের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপক বিস্তারের ফলে একই সঙ্গে অধিক পরিমাণে দ্রুতগতিতে উৎপাদনকে বৃহদায়তন বা বৃহৎ মাত্রা উৎপাদন বলা হয়।

বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন কাহাকে বলে

বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের সুবিধা (Advantages of Large-scale Production)

বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদনের ক্রম-প্রসারের কারণ হইল, কোন ফার্ম বা কোন শিল্পে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে কতকগুলি বিষয়ে ব্যয়সঙ্কোচ হয় এবং দ্রব্যের ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যায়। অধ্যাপক মার্শাল এই ব্যয়সঙ্কোচগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচ ও আভ্যন্তরীণ ব্যয় সঙ্কোচ (External and Internal economies)।

সাধারণভাবে সমগ্র শিল্পের অগ্রগতির ফলে যে-সুবিধাগুলি শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলির প্রত্যেকেই লাভ করিতে পারে—যেমন কম মজুরিতে উপযুক্ত পরিমাণে শ্রমিকের যোগান, সুবিধাজনক যানবাহনের ব্যবস্থা ইত্যাদি—ইহাদের বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচ বলে।

অপর দিকে, নিজের কারখানায় উৎপাদন মাত্রা বাড়াইবার ফলে ব্যবসায় পরিচালনা যোগ্যতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রভৃতি বৃদ্ধির দরুন কোন এক ফার্ম নিজে যে-সকল অধিকতর সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে, তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কোচ বলা যাইতে পারে। আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা শুধুমাত্র সেই ফার্মটি তাহার নিজস্ব উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির দরুণ লাভ করে, যাহার ফলে অপরাপর ফার্মের তুলনায় তাহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য মনে রাখা দরকার, যে উন্নত ধরনের উপকরণ ও পরিচালনগত যোগ্যতাসম্পন্ন ফার্মগুলি বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচের বিষয়গুলি হইতে অন্যান্য ফার্মের তুলনায় অধিকতর সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারে।

বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কোচ কাহাকে বলে

কেয়ার্নক্রস্ বলেন যে, এই ধরনের ব্যয়সঙ্কোচের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নাই। একটি ফার্মের উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কোচ ঘটিল, ইহার ফলে সেই শিল্পের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল। শিল্পের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায়, সেই শিল্পের অন্তর্গত অন্য ফার্মগুলি ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা পাইতে পারে। তাহা ছাড়া, যে সকল ফার্ম বাহ্য ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা ভোগ করে, তাহারা একত্র হইয়া একটি শিল্প সম্মিলন (Combination) গঠন করিলে শিল্পের বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচগুলি সম্মিলিত ফার্মটির আভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কোচে পরিণত হয়।*

এইরূপ বিভাগ করা চলে কি না

(১) বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচ (External economies)

একটি শিল্পের মধ্যে মোট ফার্মের সংখ্যা বা মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেকটি ফার্ম এইরূপ প্রসারের দরুণ যে-ধরনের সুযোগ-সুবিধা সমূহ লাভ করে তাহাদের বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচ বলা হয়। বহু কারণে এই বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচগুলির উদ্ভব হয়।

---

* রবার্টসন এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া 'বাহ্য-আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ' (External Internal economies) নামে নূতন ধরনের সুবিধার কথা বলিয়াছেন। কোন শিল্পের প্রসারের ফলে উহাতে হয়তো শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করিবার সুযোগ হইল এবং অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হইল। ফলে শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেকটি ফার্মের উৎপাদন মাত্রা বাড়িয়া গেল, অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ লাভ করিবার সুযোগ পাওয়া গেল। পরবর্তী অনেক লেখক (কান প্রভৃতি এইরূপ পার্থক্য করা চলে না বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং ইহাদের 'ফাঁকা অর্থ নৈতিক ঝুলি' (Empty economic boxes) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন

(ক) স্থানিকতাজনিত ব্যয়সঙ্কোচ (Economics of Location or Concentration)

যখন কোন একটি অঞ্চলে একটি শিল্পের অন্তর্গত অনেকগুলি ফার্ম পাশাপাশি স্থাপিত হয়, তখন সকল ফার্মই দক্ষ শ্রমিক, সস্তা যানবাহন এবং অন্যান্য অনুষঙ্গিক শিল্পের সুবিধা পাইতে পারে।

(খ) সংবাদ-সম্বন্ধীয় ব্যয়সঙ্কোচ (**Economies of Information**)

বৃহৎ শিল্পগুলিতে সকল ফার্ম একত্রে মিলিয়া গবেষণার কাজ চালায়, বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশ করে, যন্ত্র ও বাজার সম্পর্কীয় তথ্যাদি সকলেই পাইয়া থাকে, ফলে প্রত্যেকেরই সুবিধা হয়। সাধারণত, সংবাদ-সম্বন্ধীয় ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা দেশের সকল শিল্পই সমানভাবে পাইয়া থাকে, কোন বিশেষ শিল্প একা পায় তাহা নহে।

(গ) বিশেষায়ণজনিত বা বিযোজনজনিত ব্যয়সঙ্কোচ (**Economies of Specialisation or Disintegration**)

কোন শিল্প যখন আকারে বড় হইয়া উঠে, তখন উহার অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্ম বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিতে পারে। কাপড়ের শিল্পে কেহ ধুতি, কেহ শার্টের কাপড়, অপর কেহ কোটের কাপড় প্রভৃতি উৎপাদনে নৈপুণ্য অর্জন করে, ফলে মোট শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং সেই শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মের ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়।

(২) আভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কোচ (**Internal Economies**)

বৃহৎ আয়তন, বড় যন্ত্র, অধিক মূলধন ও উন্নত ধরনের সাংগঠনিক ব্যবস্থার দরুণ কোন একটি ফার্মের উৎপাদন মাত্রা (Scale of Production) বৃদ্ধি হইলে সেই ফার্ম যে সকল নতুন সুযোগ-সুবিধা পাইতে থাকে ও ফলে ইউনিট-পিছু উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায় তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কোচ বলা হয়। এইরূপ আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ বহু প্রকারের হইতে পারে।

(ক) যন্ত্রগত ব্যয়সঙ্কোচ (**Technical Economies**)

বৃহৎ যন্ত্র বা উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা উৎপাদন বাড়াইলে দেখা যায় যে, তুলনামূলকভাবে বৃহৎ যন্ত্র অধিকতর উৎপাদন-ক্ষম। বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনে ব্যাপকভাবে বাষ্প বা বিদ্যুৎ ব্যবহার করা চলে এবং সর্বাধুনিক

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের সুযোগ গ্রহণ করা যায়। বৃহৎ যন্ত্র চালাইবার ব্যয় উহার উৎপাদন-ক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষুদ্র যন্ত্রের তুলনায় কম পড়ে। বৃহৎ উৎপাদন-কেন্দ্রে তাহার সঙ্গেই আনুষঙ্গিক (Subsidiary) দ্রব্যের উৎপাদন হইতে পারে, ফলে ব্যয় হ্রাস পায় ও দ্রব্যের উৎকর্ষ বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, কাপড় তৈয়ারির কারখানা শার্ট বা কোর্ট তৈয়ারীর কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারে। বৃহৎ কারখানা নিজের পরিত্যক্ত উপকরণসমূহের দ্বারা বিভিন্ন উপ-দ্রব্য (By Product) প্রস্তুত করিতে পারে। ক্ষুদ্র ফার্মে পরিত্যক্ত উপকরণের পরিমাণ কম বলিয়া তাহাদের ব্যবহার করিবার সুযোগও কম। বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন-ধারার সংযুক্তির (Linked Process) ফলে সময়, যানবাহনের ব্যয়, জ্বালানি ও শক্তি প্রভৃতির ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে। এইরূপে উৎপাদনে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া উৎপাদনের ধারা আরও ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া শ্রমবিভাগের প্রসার ঘটানো যায়, ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়া যায়।

যন্ত্রগত ব্যয়সঙ্কোচের কিন্তু সীমা আছে। ফার্মের মাত্রা কিছুদূর পর্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ার পর উৎপাদন আরও বাড়িলে ব্যয়সঙ্কোচ না হইয়া ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ফার্মের এই মাত্রায় উৎপাদনকে যন্ত্রগত সর্বোন্নত স্তর (Technical optimum) বলা চলে। এই স্তরের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে আর একটি কারখানা স্থাপন করিতে হয়, নতুবা ইউনিট-প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি হয়, যন্ত্রগত ব্যয় (Technical diseconomies) ঘটে।

(খ) পরিচালনগত ব্যয়সঙ্কোচ (Economies of Management)

ফার্মের উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিকে ফার্মের পরিচালনযোগ্যতা বাড়ে, কারণ পরিচালকবর্গের মধ্যে শ্রমবিভাগের আরও প্রসার করা চলে। ক্ষুদ্র ফার্মের মালিক একা সকল কিছু পরিচালনা করে। বৃহৎ ফার্মে মাহিনাভোগী উপযুক্ত কর্মচারীদের হাতে পরিচালনার অনেক দিক ছাড়িয়া দেওয়া যায়। দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, প্রত্যেক দপ্তরে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা সম্ভব হয়।

পরিচালনগত ব্যয়সঙ্কোচ বেশিদূর পর্যন্ত লাভ করা যায় না। উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সংযোগ সাধন অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে এবং সাংগঠনিক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। বৃহদাকার শিল্প-সংগঠন প্রায় একটি ঘড়ির ন্যায়, (একটি চাকার মধ্যে আবদ্ধ আর একটি চাকা)

প্রত্যেক দপ্তর তাঁহার কাজের মাধ্যমে অপর দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট। নিয়মবদ্ধতা এবং দীর্ঘসূত্রতা কাজের উৎসাহ নষ্ট করিয়া ফেলে, এবং একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে উৎপাদন আরও বাড়াইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি হয়, ব্যয়সঙ্কোচ ব্যয়বাহুল্যে পরিণত হয়। সেই স্তরকে পরিচালনগত সর্বোন্নত স্তর (Manageriai Optimum) বলে।

(গ) ব্যবসায়গত বা বাণিজ্যগত ব্যয়সঙ্কোচ (Trading or Commercial Economies)

বৃহৎ ফার্ম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে বহু প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল বা অন্যান্য উপাদান পাইকারী দরে ক্রয় ক্রয় করিলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কম পড়ে। বিক্রেতাগণ শীঘ্র যোগান দেয়, সতর্ক মনোযোগ দেয়। এক সঙ্গে অধিক ক্রয় করায় উৎপাদনের গতিধারা অব্যাহত (continuity) থাকে। সংগঠন বৃহৎ থাকায় নিপুণ বিক্রেতা নিয়োগ করিতে পারে। বিক্রয় ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয়। নিপুণ বিক্রেতাগণ নূতন নূতন উপায়ে অনাবিষ্কৃত বাজার খুঁজিয়া বাহির করে। বিজ্ঞাপন বাবদ ইউনিট-প্রতি ব্যয় হ্রাস পায়।

(ঘ) আর্থিক ব্যয়সঙ্কোচ (Financial Economies)

বৃহৎ ফার্ম প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষুদ্র ফার্মের তুলনায় অধিকতর সুবিধাজনক শর্তে ও কম সুদে বেশি পরিমাণ ঋণ পাইতে পারে। ফলে ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকে। সহজে বিভিন্ন সূত্রে ও কম সুদে ঋণ পাওয়া সম্ভব হয়। অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইলে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের সুবিধাও সে অধিক পরিমাণে পায়।

(ঙ) ঝুঁকি বণ্টনগত ব্যয়সঙ্কোচ (Risk spreading Economies)

বৃহৎ ফার্ম আনুপাতিকভাবে অনেক কম ঝুঁকি বহন করে। তাহার উৎপাদন ও কাজকর্ম এরূপ বহুবিভক্ত যে কোন বিশেষ দিক হইতে তাহার ঝুঁকি কম হইবে। উৎপাদন যতই বৃহৎ-মাত্রায় হইবে, ততই মোট উৎপাদনের হিসাবে অনুপাতিকভাবে ঝুঁকি বণ্টন নীতি নানাভাবে কার্যকরী হয়, যেমন, (১) উৎপন্ন দ্রব্য, (২) কাঁচা মালের উৎস, (৩) শক্তি-যোগানের উৎস, (৪) উৎপাদন-পদ্ধতি, এবং (৫) বাজার প্রভৃতি

বিভাগী-করণের (diversification) দ্বারা। বৃহৎ মাত্রার উৎপাদক কখনই একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে চায় না, সে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে; একটির চাহিদা কমিয়া গেলে বা বাজার খারাপ হইলে সে অন্য দ্রব্যের বিক্রয় দ্বারা লোকসান পোষাইয়া লইতে পারে। কাঁচামাল বা শক্তি যোগানের বিভিন্ন উৎস সে রাখে, একটি বন্ধ হইলে অপর উৎস ব্যবহার করে; উৎপাদনের গতিধারা হঠাৎ ব্যাহত হয় না। উৎপাদন-পদ্ধতি এবং বাজারও সে এই উদ্দেশ্যে বিভক্ত করিয়া রাখে।

উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিবার এবং মুনাফা বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকি-বণ্টনের এই নীতি বেশিদূর অগ্রসর হইলে ফার্মটিতে সাংগঠনিক জটিলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং যন্ত্র-জনিত এবং পরিচালনগত সুবিধা পাওয়া এবং উৎপাদনের ধারা সর্বদা চালু রাখা—এই সকল লক্ষ্য অধিক পরিমাণে বিভাগীকরণকে বাধা দেয়। দেখা যায় যে, দুই একটি শিল্পে উৎপাদনকারী ছোট ছোট ফার্ম তাহাদের সহজ সরল যন্ত্রপাতি ও সংগঠন লইয়া ব্যবসায়-সংকটে অনেক সহজে বাঁচিয়া যাইতে পারে।

সর্বোন্নত ফার্ম (Optimum Firm) *

কোন একটি ফার্মের উৎপাদন-মাত্রা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন সকল প্রকার ব্যয় সঙ্কোচ যে একই সঙ্গে বা একই পরিমাণে বাড়ে তাহা নহে। মাত্রা-বৃদ্ধির একটি বিশেষ স্তরে পৌছিবার পর আরও অধিক উৎপাদন হয়তো যন্ত্রগত ব্যয়সঙ্কোচ আনিবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যয়বাহুল্য ঘটিতে পারে।

উৎপাদনের সর্বোন্নত মাত্রা বিভিন্ন প্রতিদানের নিয়ম

যেমন, উৎপন্ন দ্রব্যের পৃথকীকরণ ঝুঁকির মাত্রা কমাইতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রগত সুবিধাও কমাইয়া দিতে পারে। ফার্মটিকে তাই একই সঙ্গে উদ্ভূত সকল প্রকার ব্যয়-সঙ্কোচ ও ব্যয়-বাহুল্য হিসাব করিয়া উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইবার কথা চিন্তা করিতে হয়। ব্যয়সঙ্কোচ এবং ব্যয়বাহুল্য—ইহাদের মোট ফলাফল হিসাব করিয়া ফার্মটির মাত্রা ও আয়তন নির্ধারিত হয়। যতক্ষণ ইহাদের মোট ফল অনুযায়ী ইউনিট-প্রতি ব্যয় (প্রান্তিক ও গড় ব্যয়) হ্রাস পাইতে থাকে, ফার্মটি ততক্ষণ উৎপাদন বাড়াইতে থাকিবে। এইরূপে উৎপাদন ব্যয়ের সর্বনিম্ন স্তরে পৌছাইবার পরে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ব্যয়বাহুল্য ঘটে। এই স্তরে যে ফার্ম পৌছিয়াছে, সে দ্রব্যপিছু

* E. A. G. Robinson. *The Structure of Competitive Industry,*

সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতেছে, তাহাকে সর্বোন্নত ফার্ম (Optimum Firm) বলা হয়। যোগ্য পরিচালক সর্বদা এই স্তরে উন্নীত হইয়া উৎপাদন করিতে চাহে। সর্বোন্নত ফার্মে পৌছিবার পূর্বের অবস্থায়, যখন উৎপাদনমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ইউনিট- পিছু ব্যয় কমিতেছে, সেই অবস্থায় ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নীতি কার্যকরী হইতেছে বলা চলে। সর্বোন্নত স্তরের পরেও উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধি করিলে ব্যয়বাহুল্যের ফলে যখন ইউনিট-পিছু ব্যয় বাড়িয়া যায়, সেই অবস্থায় ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে বলা হয়। অধ্যাপক হান্‌সন্ বলেন, "At a certain size of the firm the costs of production per unit of output will be at a minimum. At that size there will be no motive for further expansion and at any other size, either larger or smaller, it would be less efficient. Such a firm is known as the optimum firm—that is, the best or most efficient size of the firm."*

স্থান কাল ও শিল্পভেদে সর্বোন্নত ফার্মের আয়তনে পার্থক্য থাকিতে পারে

সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন বিভিন্ন শিল্প, বিভিন্ন সময় বা বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী পৃথক হইয়া থাকে, একটি বিশেষ শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা ও বাজারের বিস্তৃতি অনুযায়ী সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন নির্ধারিত হয়। আবার কালক্রমে ফার্মের উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন দেশের পৃথক অর্থনৈতিক পরিবেশেও (উপকরণের যোগান ও উৎকর্ষ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, নৈপুণ্যের স্তর প্রভৃতি অনুযায়ী) সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন পৃথক হয়।

ফার্মের লক্ষ্য: সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে পৌঁছান

ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ফার্মগুলির মূল লক্ষ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা লাভ। সর্বনিম্ন উৎপাদন ব্যয়ের স্তরে উৎপাদন করিলেই যে সর্বাপেক্ষা অধিক মুনাফা লাভ হয় তাহা নহে। সুতরাং ফার্মগুলি সেই স্তরে থাকিবার চেষ্টা করে যেখানে উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া তাহাদের মুনাফা সর্বাধিক হইতেছে।

ফার্মের আয়তন (Size of the Firm)

সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহাদের মিঃ রবিন্‌সনের মত অনুযায়ী পাঁচভাগে ভাগ করা যায়: যন্ত্রসম্পর্কীয়, পরিচালনজনিত, অর্থসম্পর্কীয়, বাজারজনিত এবং ঝুঁকিবহনজনিত।

* J. L. Hanson—*A Text Book of Economics*, Pp. 112,

(ক) কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বড় যন্ত্রের ব্যবহার ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নহে, সেই সকল ফার্মের আয়তন বৃহৎ হওয়া স্বাভাবিক। আবার কোন ক্ষেত্রে এরূপ আছে যে, ছোট আকারের যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমাইয়া দেয় এবং উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেই সকল ফার্মের আয়তন ছোট হওয়া সম্ভব।

(খ) কখনো কখনো পরিচালনার কাজ খুবই সহজ, কয়েকজন পরিচালক রাখিলেই কাজ চলে। এই অবস্থায় ফার্মের আয়তন ছোট হইতে পারে। কখনো বা পরিচালনার কাজ খুবই জটিল, অধিক সংখ্যক পরিদর্শক না রাখিলে কাজ ভাল হয় না। সে ক্ষেত্রে ফার্মের আয়তন বড় হইবার সম্ভাবনা।

(গ) ফার্মটির আর্থিক সঙ্গতির উপরও ইহার আয়তন নির্ভর করে। আরও শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন বাড়াইবার সুযোগ থাকিলে ফার্মের আয়তন বাড়িতে পারে। এইরূপ সুযোগ না থাকিলে সেক্ষেত্রে আয়তন ছোট হইবে।

(ঘ) বাজার যদি স্থানীয় সীমাবদ্ধ ধরনের হয় অথবা তাহাতে দামের উঠানামা বেশি হয়, তাহা হইলে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন করিয়া লাভ নাই, কারণ বিক্রয়ের সম্ভাবনা কম ও ঝুঁকি বেশি। এইরূপ অবস্থায় ফার্মের আয়তন ক্ষুদ্র থাকারই সম্ভাবনা। বাজার যদি বড় হয় এবং সেখানে দামের উঠানামা কম হয়, তাহা হইলে বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন সম্ভব, ফার্মের আয়তনও বড় হইয়া উঠিতে পারে।

(ঙ) আয়তন বাড়াইলে ঝুঁকির পরিমাণও বাড়িয়া যায়, অধিক উপাদান ও অধিক উৎপাদন সঙ্গে লইয়া সংকটের সময় বাঁচিয়া থাকার অসুবিধা। কিন্তু আয়তন ক্ষুদ্র হইলে ফার্মের নমনীয়তা (flexibility) অর্থাৎ অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা বেশি থাকে। ফার্মের আয়তন ছোট থাকিলে অবস্থার পরিবর্তনে উহার কাঠামোতে পরিবর্তন (structural change) আনা সম্ভবপর।

সাধারণত, এই সকল বিষয় মনে রাখিয়া একটি ফার্ম তাহার আয়তন নির্ধারণ করে। তবে মনে রাখা দরকার যে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া এবং এই লক্ষ্য অনুযায়ী সে সেইভাবেই আয়তন স্থির করিবে।

বাস্তবক্ষেত্রে যে আয়তনে সে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে, সেই আয়তনই স্থির করিবে

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উৎপাদনকারী ফার্ম হইলে এমনভাবে সে তাহার আয়তন স্থির করে যেখানে দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় বাজার-দরের সমান। আবার একচেটিয়া বা একচেটীয় প্রতিযোগিতাশীল বাজারে উৎপাদনকারী ফার্ম হইলে এমনভাবে সে আয়তন স্থির করে যখন দ্রব্যের

প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় প্রান্তিক রেভিনিউ সমান। এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের উপর কোন একটি ফার্মের আয়তন নির্ভর করে।

বৃদ্ধির বাধা এবং ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদনী কার্মের অস্তিত্বের কারণ (Obstacles to expansion and why small scale firms still exist):

প্রায় সকল শিল্পেই কোন ফার্ম যখন নূতন উৎপাদন সুরু করে তখন তাহার উৎপাদন-মাত্রা কম থাকে। তবে সে সময়ের ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, ভবিষ্যতে অবস্থা বুঝিয়া সে তাহার উৎপাদন মাত্রা বাড়াইয়া ফেলে। কিন্তু অনেক শিল্প আছে যাহাতে সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন ও মাত্রা ক্ষুদ্র। ইহার অর্থ হইল যে, উৎপাদন-মাত্রায় বৃদ্ধির অনেক বাধা আছে। কোন শিল্পে এই বাধাগুলি প্রবল, কোথাও প্রবল নহে। আয়তন ও মাত্রা-বৃদ্ধির কোন এক স্তরে এই বাধাগুলি কার্যকরী হইয়া উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেয়। এই বাধাগুলি অনেক দিক হইতে আসিতে পারে।

বৃদ্ধির বাধা-সমূহ

(১) পরিচালন সংক্রান্ত বাধা :

ফার্মের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালনগত সমস্যার জটিলতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। যে ধরনের শিল্পে সর্বদা পরিদর্শনের এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন থাকে, সেখানে পরিচালনগত অসুবিধাগুলি বেশি ; ফলে ফার্মসমূহের আয়তন সাধারণত ছোট থাকে, যেমন দোকান, কৃষি ইত্যাদি।

যে ক্ষেত্রে পরিচালনার কাজ সরলভাবে রুটিন মাফিক করিলেই চলে সেই সকল শিল্পে ফার্মের আয়তন বাড়ান সহজ, যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেলওয়ে, পোস্ট অফিস ইত্যাদি। এই সকল শিল্পে নূতন নীতি-নির্ধারণ বা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুব কম ক্ষেত্রেই করিতে হয়।

আধুনিক কালে পরিচালনার কার্যের সুবিধার জন্য নূতন ধরনের সংগঠন-পদ্ধতি ও বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনার (Scientific Management) উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বহু শিল্পে এই সকল পদ্ধতির সফল প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না। সেই সকল শিল্পে সাধারণত ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন চলিতে থাকে।

সর্বশেষে, ফার্মের বৃদ্ধির কোন স্তরে পরিচালনগত বাধা আসিবেই, কারণ মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। খুঁটিনাটি সমস্যার বোঝা বিরাট হইয়া দাঁড়ায়,

দায়িত্বশীল অধঃস্তন কর্মচারীদের নিয়োগ করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখাও সহজসাধ্য নহে। সুদক্ষ, দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাবান কর্মচারীদের আয়ত্তে রাখাও শক্ত। সুতরাং পরিচালকদের যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির বাধাস্বরূপ হইয়া পড়ে।

পরিচালনগত বাধা মনস্তাত্ত্বিক স্তরেও থাকিতে পারে। মানুষের মনের বহু প্রকার খেয়াল-খুশির ফলে ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন পরিচালনা চলিতে পারে। অন্য স্থানে বেশি মাহিনায় চাকুরি পাইলে সেখানে না যাইয়া পরিচালক নিজেই ক্ষুদ্র ফার্মের পরিচালনা চালাইয়া যাইতে পারে। স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি আকর্ষণ, অনিশ্চয়তার রোমান্স, গর্ব, অহমিকা, নিজের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, সকল কিছু মিলিয়া ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদন চালানো সম্ভবপর। সুতরাং যোগ্যতা থাকিলেই সে অন্য ফার্মে কাজ করিয়া উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, এমন বলা যায় না।

(২) বাজার জনিত বাধা :

অ্যাডাম্ স্মিথ বলিয়াছিলেন যে, শ্রম-বিভাগের প্রসার বাজারের আয়তনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্থানীয় বাজারে ও অল্প পরিমাণে বিক্রয় হইবে, এইরূপ দ্রব্যের বাজার খুবই ছোট এবং এমতাবস্থায় উৎপাদনের মাত্রাও ছোট হইবে, ফার্মের পক্ষে সর্বোন্নত স্তরে পৌঁছান সম্ভব না-ও হইতে পারে। বাজার-জনিত বাধা তিন দিক হইতে আসিতে পারে : ভৌগোলিক, মানসিক ও উপাদানগত।

অনেক শিল্পে একটি ফার্মের কেন্দ্রীয়ভাবে উৎপাদন সম্ভব নয়, কারণ ক্রেতারা ছড়ান থাকে এবং বিক্রয়ের ব্যয় অধিক, যেমন পাঁউরুটি উৎপাদন, আসবাব প্রস্তুত ইত্যাদি। তাহা ছাড়া, অনেক শিল্পে কাঁচামাল ছড়ান থাকে এবং তাহাদের একটি উৎপাদন কেন্দ্রে একত্রে সংগ্রহ করা খুবই ব্যয়সাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন কোন একটি বাজারের বা কোন একটি কাঁচামালের নিকটবর্তী স্থানে ক্ষুদ্রমাত্রায় হইতে থাকিবে।

মানসিক বাধা আসে দ্রব্য পৃথকীকরণের (Product Differentiation) মধ্য দিয়া। অনেক সময় একই শিল্পের মধ্যে প্রত্যেকটি ফার্ম নিজের দ্রব্যকে পৃথক দ্রব্য বলিয়া প্রচার করে এবং হয়তো বা অল্প একটু আকৃতিগত গুণের তারতম্য করিয়া ক্রেতাদের মনে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া তোলে। ক্রেতাদের মধ্যেও তাহাদের রুচি, আয় ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন দল ও উপদলে ভাগ

হইয়া, কেহ একটি দ্রব্য, বা কেহ অপর দ্রব্যটি ক্রয় করিতে থাকে। এইরূপে প্রত্যেক দ্রব্যেরই এক একটি নিজস্ব বাজার তৈয়ারী হইয়া উঠে। ফলে, অনেক সময় ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদন চলে; উৎপাদনের মাত্রা বাড়ান সম্ভব হয় না।

ফার্মগুলি দুইটি উপায়ে এইরূপ বাজার জনিত সীমাবদ্ধতা অপসারণের চেষ্টা করে: (ক) মালপত্র চলাচলের অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে কোন ফার্ম বিভিন্ন শাখা ও উপশাখা স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ করিলে কিছুদূর পরে পরিচালনজনিত বাধা উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। (খ) ফার্মটি বহু প্রকার পৃথক রুচিসম্পন্ন ক্রেতাদের লক্ষ্য করিয়া অনেক ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে সেই ফার্ম প্রত্যেক ধরনের দ্রব্যই ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদন করিতে থাকিবে, মাত্রাবৃদ্ধিজনিত ব্যয়সঙ্কোচ লাভ করিতে পারিবে না।

বাজারজনিত বাধার আর একটি দিক হইল উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা। ফার্মের চাহিদা থাকিলেও বাজারে সেই উপাদান না-থাকিতে পারে এবং উপাদান দুষ্প্রাপ্য হইলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করা চলে না। উৎপাদন-সূত্রে স্থির উপাদান থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধি চালাইয়া গেলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম শুরু হয়, ফলে ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় বাড়িয়া যায়।

(৩) মূলধনের দুষ্প্রাপ্যতাজনিত বাধা

অনেক ক্ষেত্রে মূলধন না পাওয়াতে ক্ষুদ্র ফার্মের বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। অতিরিক্ত সুদের হার থাকিলে বা শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের ভাল প্রতিষ্ঠান না থাকিলে এরূপ ঘটে। তবে এক্ষেত্রে আসল বাধা মূলধনী দ্রব্য বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতা। অর্থের দুষ্প্রাপ্যতাকে গুরুত্বপুর্ণ বাধা বলা চলে না।

ফার্মের বৃদ্ধির কারণ ও অভিপ্রায় (Causes and motives of growth of a firm):

আধুনিককালে বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনের প্রসার হইতেছে। যদিও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদনকারী ফার্ম এখনও আছে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকার সুবিধা লাভের জন্য উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির দিকেই আজকাল ফার্মগুলির সাধারণ ঝোঁক দেখা যায়। নিজের অর্থ, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ বাড়াইয়া ফার্মটি বাড়িতে পারে; আবার অন্যান্য কয়েকটি ফার্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া একটি সংযুক্ত ফার্ম (Combi-

বৃদ্ধির উপায়—নিজের চেষ্টায় বা অপরের সহিত মিলিত হইয়া

ned firm) গঠন করিয়া উহার বৃদ্ধি হইতে পারে। কোন ফার্মের নিজের বৃদ্ধির লক্ষ্য হইল সর্বোন্নত স্তরে পৌছান। সকলে মিলিয়া সম্মিলিতভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্য হইল একচেটিয়া অবস্থায় পৌছান।

কোন ফার্মের নিজের বৃদ্ধির বহু অভিপ্রায় থাকিতে পারে :

(১) ব্যয়-সঙ্কোচের অভিপ্রায়

উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইলে বিভিন্ন কারণে ব্যয়সঙ্কোচ লাভ হয়, ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়। যন্ত্রগত, পরিচালনগত, আর্থিক, বাণিজ্য-জনিত, ও ঝুঁকি-বণ্টনজনিত বহুবিধ ব্যয় সঙ্কোচের সুবিধা লাভ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রধান অভিপ্রায়। কিন্তু অভিপ্রায় থাকিলে কি হইবে, বাস্তবক্ষেত্রে বাজার জনিত অথবা অর্থ সম্পর্কীয় বাধা উৎপাদন বৃদ্ধির পথকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে।

(২) একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের অভিপ্রায়

উৎপাদন-মাত্রা বাড়াইয়া সমগ্র বাজারে একা বিক্রয় করিতে পারিলে মুনাফা বৃদ্ধি হয়, সুতরাং একচেটিয়া জনিত মুনাফা লাভের অভিপ্রায়ে ফার্মসমূহ বাড়িতে থাকে। বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া ও দাম বাড়াইয়া মুনাফা বাড়ান একচেটিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্য। মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যয় সঙ্কোচের অভিপ্রায় বৃদ্ধি পাইয়া ফার্মটি একচেটিয়া অবস্থায় আসিয়া পৌছিতে পারে, আবার একচেটিয়া স্থাপনের অভিপ্রায়ে বাড়িলেও ব্যয় সঙ্কোচের সুবিধা পাইতে পারে।

(৩) ক্ষমতালাভের অভিপ্রায়

বড় ব্যবসায়ের মালিক হইলে বেশি ক্ষমতা ও সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভের সম্ভাবনা থাকে। তাই অনেক সময় নিজের অহংকার এবং ক্ষমতা-লিপ্সা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তা ফার্মের বৃদ্ধি ঘটায়। নিজের শক্তির পুর্ণতর ব্যবহার, স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করার আকর্ষণ, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্য হইতে নিজেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সাধনা, সব কিছুই উদ্যোক্তাকে প্রেরণা দেয়। সৃষ্টিশীল, দায়িত্বশীল এবং ক্ষমতাশীল কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ার এই আবেগের ফলেও ফার্মটি বৃদ্ধি পাইতে পারে।

স্বাধীন কাজের প্রতি উদ্যোক্তার এই আকর্ষণ অনেক সময় অন্যের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে সংযুক্ত-ফার্ম গঠনে বাধা দেয়।

(৪) অর্থলাভের অভিপ্রায়

অন্যের সহিত মিলিত হইয়া কোন ফার্মের যখন বৃদ্ধি হয়, তখন সেই ফার্ম-সম্মিলনের ও ফার্ম-সংযুক্তির উদ্যোক্তাগণ কমিশন ইত্যাদি হিসাবে প্রচুর অর্থ

পাইয়া থাকেন। শেয়ার বাজারের দালালগণ বা ব্যাঙ্কগুলি কোন শিল্পে ফার্ম-সম্মিলন ঘটাইয়া দিতে পারিলে শেয়ারের দাম বাড়াইয়া এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রচুর অর্থ আয় করিবার সুযোগ পায়। এই সকল সুযোগ লাভের অভিপ্রায়ে সংযুক্তির দ্বারা ফার্মের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

(৫) বিবিধ অভিপ্রায়

অনেক সময় দেশে প্রচলিত আইনের পরিবর্তন হইলে ফার্মের উৎপাদন মাত্রা বাড়াইতে হয়। নূতন আইনের ফলে তাহাদের নূতন শাখা স্থাপন বা নূতন দ্রব্য উৎপাদন বা নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইতে পারে। যেমন অবণ্টিত মুনাফার উপর কর ধার্য করা হইবে না, এইরূপ আইন করা হইলে ফার্মগুলি মোট মুনাফা হইতে কম লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া বেশির ভাগ মুনাফাকে পুনরায় উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করিতে পারে। এইরূপ মুনাফার পুনর্নিয়োগের (Plough-back) ফলে ফার্মের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

ফার্ম-বৃদ্ধির দিক নির্ণয় (Directions of growth of a Firm)

নিজের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, মূলধন, শ্রমিক সংখ্যা প্রভৃতির পরিমাণ বাড়াইয়া কোন ফার্মের বৃদ্ধি হইলে উহার নিজের কাঠামোতে পরিবর্তন হইতে পারে (Structural changes), অথবা তাহার কার্যাবলীর পরিধিতে (Scope of operations) রদবদল হয়। যদি নূতন দ্রব্য, নূতন পদ্ধতি, নূতন বাজার ইত্যাদি তাহার পুরানো কার্যাবলীর সহিত যুক্ত হয়, তবে এইরূপ বৃদ্ধিকে সংযোজন (Integration) বলা হয়। যেমন, বাটা কোম্পানী পূর্বে কেবল জুতা উৎপাদন করিত ; বর্তমানে উহার সহিত গেঞ্জি, ছাতা ইত্যাদি উৎপাদন সুরু করিয়াছে। যদি পুরানো কার্যাবলীর কিছু কিছু অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিযোজন (Disintegration) বলা হয়। এই সংযোজন বিভিন্নমুখী হইতে পারে।

(১) সমমুখী সংযোজন (Horizontal Integration)

যখন কোন ফার্ম তাহার দ্রব্য বা উৎপাদন-পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন না করিয়া যন্ত্রপাতি, কারখানা, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি বাড়াইয়া দেয় তখন তাহাতে সমমুখী সংযোজন বলে। এই সময়ে ফার্মের কার্যাবলীর বিস্তৃতি (Range of Operations) পরিবর্তিত হয় না। সাধারণত ফার্মের বৃদ্ধি এইভাবেই হইয়া থাকে। ইহাতে মাত্রাজনিত ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয়। যদি নূতন দ্রব্য বা পদ্ধতি গৃহীত

উহার সুবিধা

হয় অর্থাৎ ফার্মের কার্যাবলীর পরিধি বাড়ে, তাহা হইলে অনেক প্রকার দ্রব্য প্রত্যেকটিই ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপন্ন হইবে। সেই অবস্থায় ফার্মের পক্ষে মাত্রাবৃদ্ধি জনিত ব্যয়সঙ্কোচ লাভ করা সম্ভব হইবে না।

(২) লম্বমুখী সংযোজন (Vertical Integration)

একটি সম্পূর্ণ দ্রব্যের উৎপাদন বহু স্তরের উৎপাদনের মধ্য দিয়া সম্ভব হয়। যেমন, ইস্পাত উৎপাদন করিতে অনেক স্তরের মধ্য দিয়া পার হইয়া আসিতে হয়; খনি হইতে উত্তোলন, লোহা উৎপাদন এবং লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করা প্রভৃতি। যদি লোহা উৎপাদনকারী কোন ফার্ম উহার পরবর্তী স্তর অর্থাৎ ইস্পাত উৎপাদন সুরু করে, অথবা লোহার পূর্ববর্তী স্তর অর্থাৎ খনির কাজ হাতে লয়, তাহা হইলে ফার্মের এইরূপ বৃদ্ধিকে লম্বমুখী সংযোজন বলে।

দ্রব্যোৎপাদনের স্তর-ক্রমের কয়েকটি বা সবগুলি একটি ফার্মের হাতে থাকিলে প্রত্যেক স্তরের সহিত অন্য স্তরের উৎপাদনের সামঞ্জস্য সাধন করা যায় এবং সকল উপযোগী যন্ত্রপাতিরই প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

ইহার সুবিধ

পরবর্তী স্তরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী পূর্ববর্তী স্তরে উৎপাদন করা চলে। প্রত্যেক স্তরের উৎপাদন যদি বিভিন্ন স্বাধীন ফার্মের হাতে থাকে তাহা হইলে পরস্পরবিরোধী স্বার্থে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, সকল স্তরের উৎপাদনেই ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকে। লম্বমুখী সংযোজনের ফলে সকল স্তর মিলাইয়া একত্রে সকল ফার্মের উপযোগী ব্যাপক উৎপাদন-পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়, ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় কমিতে পারে। কেয়ার্নক্রস্ লম্বমুখী সংযোজনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন:

(ক) পশ্চাৎমুখী সংযোজন (Backward Integration): কাঁচামাল উৎপাদন সুরু করা, যেমন ইস্পাতের ফার্ম কর্তৃক কাঁচা লোহার উৎপাদন সুরু করা। (খ) অগ্রমুখী সংযোজন (Forward Integration): পরবর্তী স্তরের উৎপাদন নিজে সুরু করা, যেমন লোহা উৎপাদনকারী ফার্ম কর্তৃক ইস্পাত উৎপাদন শুরু করা। (গ) কৌণিক সংযোজন (Diagonal Integration): আনুষঙ্গিক দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন, যেমন মোটর কোম্পানী কর্তৃক মেরামতী কারখানা স্থাপন ইত্যাদি।

পশ্চাৎমুখী সংযোজনের উদ্দেশ্য হইল প্রধানত কাঁচামালের যোগান সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকা; অগ্রমুখী সংযোজনের উদ্দেশ্য হইল বাজার সম্বন্ধে নিশ্চিত

হওয়া ; কৌণিক সংযোজনের উদ্দেশ্য হইল যন্ত্রজনিত ব্যয় সঙ্কোচের বা উপদ্রব্য প্রস্তুতের সুবিধা পাওয়া।

(৩) পার্শ্বিক সংযোজন (Lateral Integration)

যখন কোন ফার্ম বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন সুরু করে তখন তাহাকে পার্শ্বিক সংযোজন বলে। যেমন, কোন রেল কোম্পানী যদি হোটেল, বাস ও ষ্টীমার চালাইবার কাজ হাতে লয়।

(৪) আঞ্চলিক সংযোজন (Territorial Integration)

যখন কোন ফার্ম কোন নূতন স্থানে শাখা স্থাপন করে তখন তাহাকে আঞ্চলিক বা স্থানিক সংযোজন বলা হয়। মাল চলাচলের ব্যয় অত্যধিক হইলে এইরূপ নূতন শাখা স্থাপন করিয়া ফার্মটি বর্ধিত হইতে পারে।

একচেটিয়া ব্যবসায় (Monopoly)

কোন দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান একটি ফার্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইলে ফার্মটিকে দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কোন বিশেষ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় না (কারণ দ্রব্যটির কোন ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী নাই)। সেই অবস্থাকে নিখুঁত একচেটিয়া বা পূর্ণ একচেটিয়া অবস্থা বলা হয়। কোন ফার্মের একচেটিয়া শক্তির কতকগুলি ভিত্তি থাকে, যেমন প্রাকৃতিক কারণ, যন্ত্রকৌশলগত কারণ বা বাজার গত কারণ। (ক) বাস্তব জগতে পূর্ণ একচেটিয়া অবস্থা (Perfect Monopoly) বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল দ্রব্যেরই দূরবর্তী বা ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী থাকে। যদি সেই দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী থাকে তাহা হইলে একচেটিয়া ব্যবসায় কোনমতে শক্তিশালী হইতে পারে না, কারণ দাম অল্প একটু বাড়াইলেই ক্রেতাগণ তাহার দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য ব্যবহার করিবে। তবে যদি পরিবর্ত-সামগ্রী দূরবর্তী ধরণের হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া ফার্ম শক্তিশালী হইতে পারে। যেমন বিদ্যুৎএর কোন ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী নাই, লাক্স সাবানের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী আছে (মার্গো, হামাম, পামলিভ ইত্যাদি।) (খ) দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া শক্তির ভিত্তি নির্ভর করে নূতন প্রতিযোগীদের ঐ ব্যবসায়ে প্রবেশ করার সম্ভাবনার উপর। আইনের দ্বারা কাঁচামালের উৎসের উপর মালিকানা বজায় রাখিয়া, জোর করিয়া বা যে কোন উপায়ে যদি একচেটিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে নূতন প্রতিযোগী ফার্মের প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা না হয় তাহা হইলে একচেটিয়া শক্তি টিঁকিতে পারে না।

একচেটিয়া অবস্থা উদ্ভবের উপায় দুইটি : কোন ফার্মের উৎপাদন মাত্রা ক্রমাগত বাড়াইয়া বাজার দখল করা, অথবা অনেক ফার্ম একত্র হইয়া একটি সংযুক্ত ফার্ম গঠন করা।

একচেটিয়া শিল্প সংযুক্তির কারণ কি ? (Causes of Monopolistic or Industrial Combinations)

প্রথমত, একচেটিয়া ফার্মটি মোট বাজারের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া এমনভাবে দাম বাড়াইতে পারে, যেখানে তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ একচেটিয়া মুনাফা হইবে। প্রতিযোগিতা থাকিলে কোন ফার্মের পক্ষে দ্রব্যের দাম বাড়ান সম্ভব নহে, যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে আপনা-আপনি দাম নির্ধারিত হইয়া যায়। একমাত্র একচেটিয়া অধিকার থাকিলেই দাম বাড়ান যায় এবং স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, কাঁচামাল শ্রম, মূলধন, জমি প্রভৃতি সকল উপাদানের মালিককে একচেটিয়া ফার্ম অনেক ক্ষেত্রে কম দামে উপাদান বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারে। এইরূপে একচেটিয়া ফার্ম অধিক মুনাফা আদায় করিতে পারে। তাই দেখা যায় যে একচেটিয়া মুনাফা লাভ করিবার জন্যই ফার্মগুলি একত্র হইয়া শিল্প-সম্মিলন গঠন করিবার দিকে ঝোঁক।

1. একচেটিয়া মুনাফালোভ

দ্বিতীয়ত, ফার্মসমূহ অনেক সময়ে উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধিজনিত ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা লাভ করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয়। প্রতিযোগিতা থাকিলে প্রত্যেকেরই উৎপাদনমাত্রা কম থাকিবার সম্ভাবনা, সকলে মিলিত হইয়া একটি ফার্ম গঠন করিলে উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধাগুলি পাওয়া সম্ভবপর হইবে। প্রতিযোগিতা থাকিলে ফার্মসমূহের যে ধরণের অপচয় (যেমন বিজ্ঞাপনের ব্যয় ইত্যাদি) হইতে থাকে, একচেটিয়া ফার্ম গঠিত হইলে সেইরূপ অপচয় রোধ হইবে, প্রতিযোগিতা-জনিত ব্যয় বাহুল্য কমিয়া যাইবে, যানবাহন-সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস পাইবে। কোন অযোগ্য ও দক্ষতাহীন ফার্ম থাকিলে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে, অথবা সংযুক্ত হইবার পর ফার্মসমূহের মধ্যে দ্রব্যোৎপাদন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করিয়া দেওয়া চলিবে, ফলে, প্রত্যেক ফার্ম দ্রব্যটির বিশেষ স্তরে উৎপাদনে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারিবে। প্রত্যেক

2. উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইয়া বিভিন্ন প্রকার ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধালাভ

ফার্মের শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান, খুঁটিনাটি উৎপাদন কৌশল ও শিল্প সম্পর্কীয় ধারণাবলী একত্রে মিলিয়া সংযুক্ত ফার্মটির ব্যয় সঙ্কোচে সাহায্য করিবে।

3. আত্মরক্ষার সুবিধালাভ

তৃতীয়ত, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অনেক সময় কোন শিল্পের অন্তর্গত ফার্ম-সমূহ একত্র হইয়া শিল্প-সম্মিলন গঠন করিয়া তোলে। বিদেশী প্রতিযোগিতার ভয়ে, নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য, অথবা যাহাতে আরও নূতন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য ফার্মসমূহ সম্মিলিত হইতে পারে। জাভার চিনি শিল্পের প্রতিযোগিতায় ভয়ে যেমন এক সময় ভারতীয় সুগার সিণ্ডিকেট গঠিত হইয়াছিল।

4 প্রতিযোগিতা-মূলক অবস্থায় ঝুঁকি কমান

চতুর্থত, অনেক সময় প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার ঝুঁকি কমাইবার উদ্দেশ্যে ফার্মগুলি একচেটিয়া সংস্থা গড়িয়া তোলে। প্রতি-যোগিতায় সর্বদাই লোকসানের সম্ভাবনা, তাই ফার্মগুলি একত্রিত হয়।

5. মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ

পঞ্চমত, অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে ফার্মের মালিকেরা মিলিত হইয়া বিরাট একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। দেশে অর্থনৈতিক কাঠামোর কিছুটা অংশ আয়ত্তে রাখিয়া এবং একটি দ্রব্যের যোগানকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া যে আনন্দ ও উত্তেজনা লাভ করা যায়, তাহার আকর্ষণেও অনেক সময় ফার্মসমূহ সম্মিলিত হইয়া থাকে।

6. আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠা

সর্বশেষে, অনেক সময়ে আইনের দ্বারা একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা হয়। যে সকল শিল্প জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট (যেমন পোষ্ট অফিস, রেলপথ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি) সেই সকল শিল্পে প্রতিযোগিতা দেশের সম্পদের পক্ষে নিছক অপচয়মূলক ছাড়া আর কিছু নহে। এই সকল ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা অনেক সময়ে একটি ফার্ম স্থাপিত করা হয় এবং নূতন ফার্ম প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হয় না।

শিল্প-সংযুক্তির রূপ (Forms of Combinations) :

একটি শিল্পের অন্তর্গত ফার্মসমূহের সংযুক্তি বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে। উৎপাদনের পরিমাণ, বাজার বা দাম সম্বন্ধে মৌলিক আলোচনা ও সংযুক্তির উদ্দেশ্যে অলিখিত চুক্তি হইতে সুরু করিয়া নিজেরা সম্পূর্ণ মিশিয়া

যাওয়া পর্যন্ত সংযুক্তির গভীরতা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রথমাবস্থায় দাম, বাজার ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে **অলিখিত চুক্তি** হয়। কিন্তু ফার্মসমূহ মুনাফার লোভে বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধারণত অলিখিত চুক্তি মানিতে চাহে না। তখন ফার্মসমূহ পরস্পরের প্রায় একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া **লিখিতভাবে চুক্তি** করে। উহার পরবর্তী স্তরে ফার্মগুলি মিলিয়া একটি সমিতি বা সংঘ **স্থাপন** করে এবং ধীরে ধীরে এই সংঘ বা সমিতির মারফৎ দাম, বাজার বা উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা হইতে থাকে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে **কার্টেল** বলা হয়। সর্বশেষ স্তরে উহারা নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণ একটি ফার্মে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে **ট্রাষ্ট** বলে।

অলিখিত চুক্তি, লিখিত চুক্তি, কার্টেল, ট্রাষ্ট

কার্টেল হইল শিল্প-সংযুক্তির এমন একটি রূপ যাহা শুধু প্রত্যেক ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ (কোটা) স্থির করে তাহাই নহে, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ভারও হাতে তুলিয়া লয়। উৎপাদন ও পরিচালনা হইতে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত পৃথক হইয়া যায়, স্বাধীন ফার্মসমূহ উৎপাদন চালায়, যদিও ফার্ম-প্রতি দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। প্রত্যেকটি ফার্ম একচেটিয়া দামের সুবিধা পায়। যখন খুশি যে কোন ফার্ম কার্টেল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে।

কার্টেল

বহু ফার্ম মিলিয়া যখন একটি ফার্ম গঠিত হয় এবং মিলিত ফার্মগুলির কেহ পৃথক হইয়া যাইতে পারে না বা পৃথক সত্তা বজায় থাকে না, এরূপ সম্মিলনকে ট্রাষ্ট বলে। উৎপাদন সংগঠন, পরিচালনা ও বিক্রয়ের বন্দোবস্ত সকল কিছুই কেন্দ্রীয় সংস্থা হইতে ব্যবস্থা করা হয়। এই ট্রাষ্ট উহার অন্তর্গত কোন ফার্ম বন্ধ করিয়া দিতে পারে। ফার্মসমূহকে একই কোম্পানীর বিভিন্ন উৎপাদনকারী কেন্দ্র হিসাবে ধরা হয়। যদি ফার্মসমূহের মালিকগণ কোন নূতন কোম্পানী গঠন করেন এবং সকল ফার্মের মালিকানা এই কোম্পানী কিনিয়া লয় তাহা হইলে সেই কোম্পানীকে হোল্ডিং কোম্পানী বলা হয়। ইহা কার্যত ট্রাষ্টেরই একটি সাংগঠনিক রূপ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ট্রাষ্ট বিরোধী আইন পাশ করার পর সেই আইন এড়াইবার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল।

ট্রাষ্ট ও হোল্ডিং কোম্পানী

শিল্প সংযুক্তি কার্টেলের রূপ বা ট্রাষ্টের রূপ গ্রহণ করিবে তাহা প্রধানত তিন প্রকার কারণের উপর নির্ভর করে: ব্যক্তিগত, আইনগত এবং অর্থনৈতিক সুবিধা-অসুবিধার বিচার বিবেচনা। শিল্প-সম্মিলনের রূপ সম্বন্ধে ফার্মের

মালিকদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে। কোন্ দেশের আইন কিরূপে কতখানি শিল্প-সম্মিলনের বিরোধী তাহাও দেখিতে হইবে। তবে অর্থনৈতিক সুবিধা-অসুবিধাসমূহ-ই এক্ষেত্রে প্রধান বিচার্য বিষয়। ট্রাষ্টের বহু সুবিধা আছে। বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন করিলে সে ক্ষেত্রে ব্যয়-সঙ্কোচের পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে কার্টেলের তুলনায় ট্রাষ্টই সুবিধাজনক। কারণ কার্টেলে পৃথক ফার্মগুলি প্রত্যেকে অল্প পরিমাণ উৎপাদন করে, ট্রাষ্টে একসঙ্গে বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন হওয়া সম্ভব। ট্রাষ্ট সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী। কার্টেলের স্থায়িত্ব কম, যে অবস্থায় কার্টেল গঠিত হইয়াছিল সেই অবস্থার পরিবর্তনে ফার্মগুলি কার্টেল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। তাহা ছাড়া মূলধন-সংগ্রহের ব্যাপারে কার্টেলের তুলনায় ট্রাষ্টের সুবিধা বেশি।

ট্রাষ্ট ও কার্টেলের তুলনামূলক দোষ গুণ বিচার

কিন্তু কোন শিল্পের সকল ফার্মই নিজের পৃথক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া ট্রাষ্টে যোগ না দিয়া কার্টেলে সংঘবদ্ধ হইতে চাহে, এরূপ হইতে পারে। সুতরাং কার্টেলের প্রতি সকল ফার্মের যতটা আকর্ষণ আছে, ট্রাষ্টের প্রতি তাহা না-ও থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া ট্রাষ্ট খুব ব্যয়বহুল, কিন্তু কার্টেলের সংগঠন অল্প ব্যয়সাধ্য। যে সকল শিল্পে সর্বোন্নত ফার্মের উৎপাদন-মাত্রা ও আয়তন ছোট সেক্ষেত্রে ট্রাষ্ট সংগঠিত করিয়া উৎপাদন-মাত্রা বাড়ান ব্যয় বাহুল্য ঘটাইবে। এরূপ অবস্থায় ট্রাষ্টের তুলনায় কার্টেলই সুবিধাজনক। সর্বোপরি, কার্টেল একটি নমনীয় প্রতিষ্ঠান (flexible), অবস্থা বুঝিয়া ফার্মগুলি ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে এবং অবস্থা অনুযায়ী ও সুবিধামত ইহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। এই নমনীয়তা পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক জগতে খুবই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়।

শিল্প সংযুক্তি গঠনের দিক-নির্ণয়

যদি কোন শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্ম অর্থাৎ এক জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্ম মিলিত হইয়া শিল্প সম্মিলন গঠন করে, তাহা হইলে তাহাকে সমমুখী সংযুক্তি (Horizontal Combination) বলে। আর যদি একটি দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্তরের দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্ম মিলিত হয় তবে তাহাকে লম্বমুখী সংযুক্তি (Vertical Combination) বলা হয়।

কোন দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর, যেমন খনিজ লোহা, কাঁচা লোহা,

ইস্পাত, প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য সাধারণত বিভিন্ন ফার্ম উৎপাদন করে। একটি দ্রব্যের বিভিন্ন স্তরের উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্মসমূহ মিলিত হইয়া সংযুক্ত একটি ফার্ম গঠন করিলে সকল ফার্মেরই সুবিধা হওয়ার কথা। পরিচালনার সুবিধা হয়, উৎপাদনের প্রতিটি স্তরের প্রত্যেক ফার্ম যে পৃথক মুনাফা করে তাহা বন্ধ হয়। বিক্রয়-জনিত ব্যয়, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞাপন ব্যয় কমিয়া যায়। প্রত্যেক পৃথক স্তরে অধিকোৎপাদন হইয়া লোকসানের ঝুঁকি তিরোহিত হয়। প্রয়োজনের সময় কাঁচামাল না পাইবার ভয় থাকে না। ব্যাপক পরিকল্পনার সাহায্যে সমগ্র শিল্পের পরিচালনা সম্ভব হয়, বহু দিক হইতে ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে। একটি যন্ত্র চালাইয়া তাহা হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন স্তরের কারখানায় উৎপাদন চলিতে পারে, যানবাহনের ব্যাপারে ব্যয় কমিয়া যায়।

শিল্প-সংযুক্তির অর্থ-নৈতিকভাবে শুভ ফলাফল: লম্বমুখী সংযুক্তির সুবিধা

কিন্তু বহু কারণে ব্যয়-বাহুল্যের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। প্রথমত, সমস্ত সংস্থাটি নির্ভর করে সর্বশেষ স্তরের ফার্মটি উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিল কি না তাহার উপর। যদি সে দ্রব্য বিক্রয়ে অক্ষম হয় তাহা হইলে সকল স্তরের উৎপাদনই হ্রাস পাইবে। সম্মিলন না ঘটিলে বিভিন্ন স্তরের প্রত্যেকটি ফার্ম নিজেই নিজের পথ খুঁজিয়া লইতে পারিত, অন্য যে কোন দামে বিক্রয় করিয়া, নিজের কাঠামোতে পরিবর্তন করিয়া বাঁচিয়া যাইতে পারিত। দ্বিতীয়ত, এইরূপ শিল্প-সংযুক্তির পক্ষে ব্যবসায় সঙ্কটের সময়ে অন্য স্থান হইতে অল্প দামে কাঁচামাল ও পূর্ববর্তী স্তরজাত দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা থাকে না। তৃতীয়ত, চাহিদার ঘন ঘন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্তরের উপাদানের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা সম্ভব নহে, ইহার ফলে ব্যয়-বাহুল্য ঘটিতে পারে। যেমন ইস্পাতের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে সর্বশেষ-স্তরের ইস্পাত উৎপাদনকারী ফার্মটি তাঁহার যন্ত্রপাতি বাড়াইয়া ফেলিল, ধরা যাক দ্বিগুণ করিল। পূর্ববর্তী স্তরের উৎপাদন, অর্থাৎ লোহার উৎপাদনের পরিমাণও দ্বিগুণ করা দরকার। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যন্ত্রের আকৃতি এইরূপ থাকিতে পারে যে তাহার সাহায্যে লোহার উৎপাদন দ্বিগুণের কম হইবে অথবা তিনগুণ হইবে। কম হইলে ফার্মটিকে বাহির হইতে বাজার-দরে লোহা ক্রয় করিতে হইবে (চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ সম্ভবত বেশি দাম দিয়া,) অথবা বেশি লোহা বাজারে বিক্রয় করিয়া (লোহার যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় সম্ভবত কম দামে) প্রতিযোগী ফার্মদের ইস্পাত উৎপাদনের সুবিধা

লম্বমুখীর সংযুক্তির অসুবিধা

দিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেকে স্তরের উৎপাদন একই সঙ্গে এমন মাত্রায় সম্ভব না-ও হইতে পারে, যখন সকলেই সর্বোন্নত (optimum) অবস্থায় উৎপাদন করিতেছে।

সমমুখী সংযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধা

একই দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্মসমূহ একত্র হইয়া, সমমুখী শিল্পসংযুক্তি গড়িয়া তুলিতে উহা হইতে বহু সুবিধা পাওয়া যায়। প্রধানত সম্মিলিত ফার্মটি একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুবিধাগুলি পাইয়া থাকে। নিজের মধ্যে দাম-কাটাকাটি বন্ধ হয় ঝুঁকি কমিয়া যায়, বিজ্ঞাপনের ব্যয় কমে, পরিচালনগত সুবিধা হয়, এবং সংযুক্ত ফার্মটি একচেটিয়া মুনাফা লাভ করিতে পারে।

ইহার প্রধান অসুবিধা হইল যে যদি ফার্মসমূহের উৎপাদনের মধ্যে দ্রব্য-পার্থক্য (Product differentiation) থাকে, তাহা হইলে ক্রেতাদের মনে প্রত্যেক ফার্মের দ্রব্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা থাকে যে উহা অপর ফার্মের দ্রব্য হইতে একটু বা বেশি পৃথক। এইরূপ ক্ষেত্রে সেই শিল্প সম্মিলনের পক্ষে একই দ্রব্যের বিভিন্ন ধরন বা মার্কা বাজারে চালু রাখিতে হইতে পারে। ইহাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে বিক্রয়-জনিত ব্যয়সঙ্কোচ না হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়সঙ্কোচ না-ও ঘটিতে পারে।

শিল্পসংযুক্তি গঠনের সম্ভাবনা (Chances of Combinations)

কোন শিল্পে সংযুক্তি-গঠনের সম্ভাবনা বহু বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমত, যদি প্রতিযোগী ফার্মের সংখ্যা খুব কম হয় তাহা হইলে শীঘ্র ও সহজে চুক্তির এবং সংঘ গঠনের সম্ভাবনা বেশি থাকে। সম্মিলনের জন্য প্রয়োজন হইল আলাপ-আলোচনা, পরস্পরকে বোঝাবুঝি এবং একমত হওয়া। অনেক ফার্ম থাকিলে ইহার অসুবিধা। কয়েকজনের মধ্যে মতৈক্যের সম্ভাবনা অনেকের মধ্যে মতৈক্যের সম্ভাবনা হইতে অধিক। দ্বিতীয়ত, যদি প্রতিযোগী ফার্মসমূহের পারস্পরিক ক্ষমতা মোটামুটি সমান হয় তাহা হইলেই তাহারা সহজে বোঝা-পড়ার মধ্যে আসিতে পারে। ক্ষমতাশালী ফার্ম অল্প শক্তিসম্পন্ন ফার্মদের আমল না দিতেও পারে, দামের লড়াই-এ সে ছোট ফার্মকে দমাইয়া নিজে একচেটিয়া স্থাপন করিবার আশা পোষণ করিতে পারে। তৃতীয়ত, যদি সেই শিল্পে দ্রব্য-পার্থক্য দেখা যায়, তাহা শিল্প সম্মিলন হওয়া দুরূহ। প্রত্যেক ফার্ম যদি ওই শিল্পের মধ্যেই শিল্পের মার্কা মারা দ্রব্যটির

কম সংখ্যা, সমান ক্ষমতা, এক জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে, নিকটে অবস্থান, সমিতি গঠন ও সংরক্ষণী শুল্ক

জন্য ছোটখাটো একটি পৃথক বাজার সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে এবং আধা-একচেটিয়া অবস্থা গঠন করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সম্মিলনের সম্ভাবনা কম। কিন্তু প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইলে প্রতিযোগী ফার্মগুলি নিজেদের মধ্যে আত্মধ্বংসী লড়াইতে বিরত হইয়া সকলের স্বার্থে সম্মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে। চতুর্থত, শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলি যদি মোটামুটি পরস্পরের নিকটেই অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনা ও পরিচয়ের ভিত্তিতে পারস্পরিক সমস্যার বোঝাপড়া সম্ভব হইতে পারে এবং সম্মিলনের কথা চিন্তা করা সহজ হইয়া উঠে। পঞ্চমত, যদি ফার্মগুলি কে.ন সংঘ বা সমিতিতে প্রথম হইতে যুক্ত থাকে তাহা হইলে উহার মারফৎ সংযুক্তির আলোচনা সহজতর হয়, একসঙ্গে কাজ করিবার অভ্যাসও গড়িয়া উঠে। ষষ্ঠত, সংরক্ষণী শুল্ক অনেক সময়ে শিল্প সম্মিলনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। বিদেশী দ্রব্যের দাম ও শুল্কের পরিমাণ যোগ করিলে যদি দেশীয় বাজারে দ্রব্যটিব চালু দাম অপেক্ষা বেশি হয়, তাহা হইলে দেশীয় ফার্মগুলি একত্র হইয়া উহার দাম বাড়াইয়া বেশি দামে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে পারে। কাবণ, সংযুক্তি না হইলে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাব দরুণ তাহার দাম বাড়াইতে পাবিবে না। এইজন্য বলা হয় যে সংবক্ষণী শুল্কই ট্রাষ্টের জন্মদাতা।

একচেটিয়ার দোষ-গুণ বিচার: ইহা কি সর্বদা সমাজবিরোধী? (Advantages and Defects of Monopoly: Is it always anti-social?)

একচেটিয়া ব্যবসায বহুপ্রকাব সুবিধা আছে। সকল সময়েই যে ইহা সমাজের স্বার্থ বিরোধী, তাহা নহে। প্রথমত, এরূপ অনেক শিল্প আছে যাহাতে প্রতিযোগিতা থাকার দরুণ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ফার্ম চালু থাকে। তাহার ফলে কোন ফার্মেব পক্ষেই বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন করিয়া ব্যয়সঙ্কোচ সম্ভব হয় না। এইরূপ অবস্থায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হইলে সেই ফার্মটি উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির দরুণ সকল প্রকার ব্যয়সঙ্কোচ পাইতে পারে এবং উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়া ফেলিতে পারে, প্রতিযোগিতা-জনিত ঝুঁকি কমিয়া যায়, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির বাবদ ব্যয় হ্রাস পায়। অধিকোৎপাদন (over production) ও অর্থ নৈতিক সঙ্কটের সম্ভাবনা কমে। এই কারণেই বেন্‌হাম বলিয়াছেন "একচেটিয়া ধরণের কাজকর্মে অভিযুক্ত

সুবিধাসমূহ

কোন কোন শিল্প বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রগতিশীল এবং যোগ্যতম, টেকনিকাল এবং ব্যবসায়িক উভয় দিক হইতেই ইহা সত্য।"*

দ্বিতীয়ত, এইরূপ অনেক শিল্প আছে যাহাদের জন-প্রয়োজনীয় (Public utility) শিল্প বলা হয়, যেমন রেলওয়ে, জল, বিদ্যুত সরবরাহ, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি। এই সকল শিল্পে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে জাতীয় সম্পদের অপব্যয় কম হয়। যেমন, দুইটি স্থানের মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানী যদি রেললাইন স্থাপন করিতে থাকে তাহা হইলে দেশে চাষের জমি কম পড়িয়া যাইবে। এই সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার থাকাই বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়ত, প্রতিযোগিতা থাকিলে দামে ও উৎপাদন-পরিমাণে যে উঠানামা হয়, একচেটিয়া থাকিলে তাহা অনেক সময়ে দেখা যায় না। একচেটিয়া ব্যবসায়ী বেশি টাকা খাটাইতে পারে, গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতিও তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু মনে রাখিবে যে, একচেটিয়া ব্যবসায় প্রায় সকল সময়েই সমাজ-বিরোধী। প্রতিযোগিতার চাবুক না থাকিলে উদ্যম, প্রেরণা ও নূতনত্বের প্রতি আকর্ষণ কমিয়া যায়, উৎপাদন ব্যয় কমানো বা বাজার-সৃষ্টির দিকে নজর থাকে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ পরিত্যাগ করিয়া নিজের লব্ধ একচেটিয়া শক্তিকে যে কোন মতে টিঁকাইয়া রাখার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, মাত্রা বৃদ্ধির দরুন যে ব্যয়-সঙ্কোচ সে লাভ করে দামের মারফত জনসাধারণের নিকটে তাহা পৌঁছায় না। একচেটিয়া ফার্ম দাম যথাসম্ভব উঁচুতে রাখিয়া জনসাধারণকে শোষণ করার চেষ্টা করে।

অসুবিধাসমূহ

তৃতীয়ত, একচেটিয়া ফার্মের দরকষাকষির শক্তি (Bargaining Power) অনেক বেশি, সুতরাং শ্রমিক ও কাঁচামালের যোগানদারদের সে বিশেষভাবে শোষণ করিতে পারে। যদি কোন কাঁচামালের শিল্পে কোন ফার্মের একচেটিয়া অধিকার থাকে, তাহা হইলে এইরূপ মূল্য-কাঠিন্যের (Price-rigidities) দরুন ব্যবসায়-সঙ্কটের সময়ে সেই সঙ্কট তীব্রতর হয়, কারণ অন্যান্য সকল শিল্পের স্বার্থহানি হইলেও একচেটিয়া কাঁচামালের কোম্পানি দাম কমায় না। সর্বোপরি, একচেটিয়া ফার্ম অনেক সময় নতুন ফার্মকে নিজের ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গুণ্ডামি, ঘুষ, রাজনৈতিক দল করায়ত্ত করা—এইরূপ সকল প্রকার অসৎ কাজ করিয়া সমাজ দেহ কলুষিত করে।

* "Some of the industries most criticised for monopolistic tendencies turn out to be most progressive and successful, both technically and commercially"—Benham, *Economics* P. 105.

যেমন, কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি একচেটিয়া স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে গুয়েতেমালার রাজনৈতিক বিপ্লবকে বানচাল করিয়া দিয়াছে।

একচেটিয়া-নিয়ন্ত্রণ (Control of Monopoly)

একচেটিয়া শক্তির ভিত্তি দুর্বল করিয়া উহার দৌরাত্ম্য কমাইবার জন্য কোন রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

প্রথমত, একচেটিয়া ব্যবসায়ী বিভিন্ন উপায়ে নূতন প্রতিযোগীদের নিজের শিল্পে প্রবেশ করিতে বাধা দেয় ও এইভাবে তাহার ক্ষমতা বজায় রাখা। নূতন ফার্ম একচেটিয়া শিল্পে প্রবেশের উপক্রম করিলেই সে তৎক্ষণাৎ দূর কমাইয়া দিয়া তাহাকে বাজার হইতে হটাইয়া দিয়ার চেষ্টা করে। পরে অবস্থা বুঝিয়া পুনরায় দাম বাড়াইয়া সেই লোকসান পূরণ করিয়া লয়। রাষ্ট্র যদি এইরূপ নিয়ম করে যে, একবার দাম কমাইলে আবার খুশিমত বাড়ানো চলিবে না, তাহা হইলে একচেটিয়া ব্যবসাদার কিছুটা নিরস্ত হইতে পারে এবং সেই শিল্পে প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহার অসুবিধা হইল, কোন ফার্ম পরীক্ষামূলকভাবেও দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে দাম কমাইতে চাহিবে না, সুতরাং ঐ দ্রব্যের দাম ভবিষ্যতে কোনদিনই হ্রাস না পাইবার সম্ভবনা রহিয়া যাইবে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র একচেটিয়া ব্যবসাদারদের উপর উচ্চহারে কর বসাইতে পারে এবং সেই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে নূতন ব্যবসাদারদের আর্থিক সাহায্য (subsidy or bounty) দিয়া একচেটিয়া শিল্পে প্রতিযোগিতার প্রসারে সহায়তা করিতে পারে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র সর্বোচ্চ দাম বা সর্বোচ্চ মুনাফার হার বাঁধিয়া দিয়া একচেটিয়া ব্যবসায়কে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে যাহাতে প্রতিযোগিতার বাজারে যে দাম থাকিতে পারিত, তাহা হইতে দাম বাড়িতে পারে না। সর্বোচ্চ দাম নির্ধারিত করিয়া দিলে একচেটিয়া ফার্ম দ্রব্যের গুণ ও উৎকর্ষ কমাইবার চেষ্টা করিবে; সুতরাং ইহার সহিত উৎকর্ষ-নিয়ন্ত্রণও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহার অসুবিধা হইল যে, সর্বোচ্চ মুনাফা কাহাকে বলে তাহা লইয়া দেশে মতবিরোধ থাকে, আর অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ মুনাফার হার পরিবর্তন করিতে হয়। সর্বোচ্চ দাম নিধারণের আরও অসুবিধা হইল যে, ব্যয় বা চাহিদার কোন পরিবর্তন হইলেই এই নির্ধারিত দাম পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়।

চতুর্থত, রাষ্ট্র আইন করিয়া একচেটিয়া সংগঠনগুলি ভাঙিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে পারে, এবং বহুস্থানে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে 'শ্যেরম্যান ট্রাস্ট বিরোধী আইন' এবং 'ক্লেটন আইন' পাস করা হইয়াছে। আইনবিদ্‌দের বুদ্ধি ও চাতুরির ফলে এই আইনগুলির প্রয়োগ সার্থক হয় নাই। অবশ্য ইহা মনে রাখা দরকার যে, এই আইনগুলি সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করিলেও ইহাদের ফলে দ্রব্যটির বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইবে এমন বলা চলে না।

সুতরাং দেখা যায় যে-বাস্তবক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সহজসাধ্য নহে। রাষ্ট্রের আইন এড়াইবার মত চাতুর্য একচেটিয়া ব্যবসাদারের আছে এবং বহুক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায় রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের উপর যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। দেশের জনমত যদি অত্যন্ত সচেতন ও প্রবল থাকে এবং একচেটিয়া ফার্মের কাজের উপর সর্বদা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখিতে পারে, একমাত্র তাহা হইলেই যথেষ্ট একচেটিয়া মুনাফা লাভে বাধা দেওয়া সম্ভব হয়। অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি যে রকম ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ, সেই রকম উহা ভোগকারীর স্বাধীনতার (Consumer's Sovereignty) রক্ষাকবচও বটে।

অনুশীলনী

1. Discuss the factors determining the size of business units.

2. Discuss the various motives which impel different firms to combine. Are all such motives anti-social ?

3. Discuss the factors determining the size of business units and state the conditions under which small-scale units may successfully compete with large scale units.

4. Distinguish between internal and external economies with suitable examples. Do these economies continue indefiniteiy ? Give reasons for your answer.

5. Expain carefully the factors which set a limit to the growth of a firm.

6. Distinguish between the chief types of industrial combinations, and indicate the factors which favour their growth.

7. 'Division of labour is limited by the extent of the market.' Discuss the statement and point out some other obstacles to the growth of business units.

8. Discuss the various economies that result from large-scale production.

9. What are the conditious under which small-scale production units are preferable to large units ?

10. Distinguish between vertical and horizontal combinations and examine their advantages.

11. Discuss the relative merits and demerits of cartels and trusts.

12. Discuss carefully the economies that are likely to result from the expansion of the size of a firm.

13 Distinguish between trusts and cartels. Are the motives that lead to their formation necessarily anti-social ?

14. Discuss the different types of industrial combinations in a modorn economy.

যোগান ও উৎপাদন-ব্যয়
Supply and Cost of Production

যোগান (Supply)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট দামে কোন উৎপাদক বাজারে যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করেন, তাহা সেই বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান। আর সেই সময়ে ও সেই দামে বাজারের সকল বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান যোগ দিলে, তাহা সেই বাজারে সেই দ্রব্যের মোট যোগান।

যোগান কাহাকে বলে

দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে অনেকে কোন পার্থক্য করেন না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। প্রথমত, যাহা উৎপন্ন হইল তাহার কিছু অংশ ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতারা মজুত করিয়া রাখিয়া দিতে পারে, এই অবস্থায় উৎপাদনের তুলনায় যোগান কম হইবে। অথবা, উদ্যোক্তারা পূর্বের মজুত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে ছাড়িয়া দিতে পারে, এই অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগান বেশি হইবে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্য উৎপন্ন হইলে তাহা বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিবেই এমন নহে, কারণ উৎপাদক নিজের ভোগের জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু পরিমাণ রাখিয়া দিতে পারে। তৃতীয়ত, অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া বাজারে যোগান হইবার পূর্বেই কিছু পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়, যেমন শাক, সবজি, দুধ, মাছ প্রভৃতি। এইরূপ ক্ষেত্রে, উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগানের পরিমাণ কম হইবে।

উৎপাদন ও যোগানে পার্থক

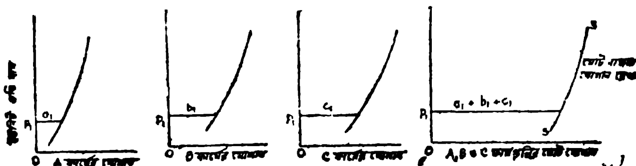
একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট দামে ফার্মটি কি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে উপস্থিত করিবে তাহা আলোচনা করা দরকার। আমরা ধরিয়া লইলাম যে, দামের উপর বিক্রেতার কোন প্রভাব নাই, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দামে সে যত খুশি পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারে। আমরা জানি নির্দিষ্ট দামে মোট উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইতে ফার্মের মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মোট উৎপাদন বাড়াইতে গেলে তাহার মোট ব্যয়ও বাড়ে। সুতরাং, কোন নির্দিষ্ট

দামে ফার্ম সেই পরিমাণ উৎপাদন ও যোগান করিবে যে-স্তরে মোট রেভিনিউ ও ব্যয়ের পার্থক্য সর্বাধিক ; অর্থাৎ যে-বিন্দুতে ফার্মের নীট রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি। অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা (economic rationality) মানিয়া চলিতে হইলে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া দরকার। তাই আমরা বলিতে পারি যে, উৎপাদন-সম্ভাবনার সকল দিক বিবেচনা করিয়া, দ্রব্য ও উৎপাদনের নির্দিষ্ট দামে ফার্মটি সেই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে যাহাতে সে সর্বাধিক নীট রেভিনিউ পায়।

নির্দিষ্ট দামে ফার্ম কত যোগান করিবে

বাজারে সকল ফার্ম যে নির্দিষ্ট এক দামে সমান পরিমাণ যোগান করিবে তাহা নয়। বরং বাস্তবে দেখা যায় যে, তাহাদের পৃথক পৃথক পরিমাণ যোগান করার সম্ভাবনা বেশি। স্বল্পকালে বিভিন্ন ফার্ম-এর সম্মুখে বিভিন্ন রূপ উৎপাদন-সম্ভাবনা থাকিতে পারে। ইহার কারণ অনেক। পূর্বে কারখানা ও যন্ত্রপাতির আয়তন সম্বন্ধে ধারণা ছিল পৃথক, কি ধরনের যন্ত্রপাতি ও টেকনিক ব্যবহার করিবে সেই সম্বন্ধে সিদ্ধান্তও ছিল ভিন্নরূপ, ইহা সম্ভবপর। পরিবর্তনীয় উৎপাদনগুলির গুণ ও যোগ্যতা একরূপ নয়, ইহাও হইতে পারে। হয়তো সকল শ্রমিককে একই হারে মজুরি দেওয়া হইতেছে, কিন্তু কোন একটি ফার্ম এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে সেই শ্রমিকদলের দক্ষ ইউনিট পাওয়া যায় না, এই অবস্থায় ফার্মটির খরচ বেশি পড়িবে। এই সকল কারণে নির্দিষ্ট দামে সকল ফার্ম সমান যোগান দিবে এমন কথা বলা যায় না।

বাজারের সকল ফার্মের ব্যক্তিগত যোগানের রেখা যোগ করিলে বাজার যোগান রেখা (market supply curve) পাওয়া যায়।* কি ভাবে এইরূপ যোগ দেওয়া চলে তাহা নীচের চিত্রে দেখানো হইল :



উপরের চিত্রটিতে p_1 দামে A ফার্ম যোগান দেয় a_1 পরিমাণ ; B ফার্ম যোগান দেয় b_1 পরিমাণ ও C ফার্ম যোগান দেয় c_1 পরিমাণ। p_1 দামে দ্রব্যটির মোট যোগান হইল $a_1+b_1+c_1$. চতুর্থ চিত্রটিতে p_1 দামে মোট যোগান দেখানো হইতেছে। এইরূপে p_1, p_2, p_3 বা বিভিন্ন দামে সকল ফার্মের মোট যোগান যোগ করিয়া আমরা বাজার যোগান-রেখা অঙ্কন করিতে পারি।

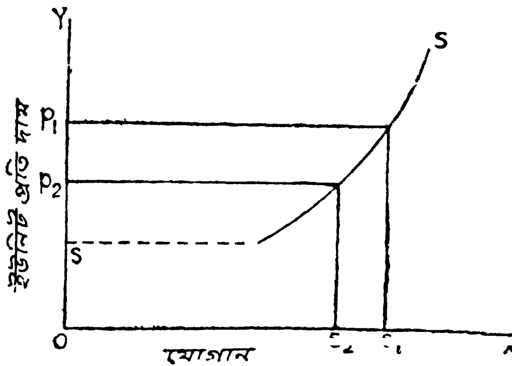
* যদি সকল পরিবর্তনীয় উপাদান সকলে সমান দামে কেনে।

যোগানের নিয়ম (Law of Supply)

"অন্যান্য সকল কিছু সমান থাকিলে" দাম বাড়িলে যোগান বাড়িয়া যাইবে এবং দাম কমিলে যোগান কমিয়া যাইবে। দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিবর্তনকে যোগানের নিয়ম বলা হয়।

যোগানের এই নিয়ম কার্যকরী হয় দুইটি কারণে: (ক) নীট রেভিনিউতে, ও (খ) ফার্মের সংখ্যায় পরিবর্তনের ফলে। দাম বাড়িলে বর্তমান ফার্মগুলির ইউনিট-প্রতি মুনাফা বেশি হইতে থাকে, তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। যদি তাহারা ধরিয়া লয় যে, দামের বৃদ্ধি অল্পকাল স্থায়ী হইবে, তবে স্থির মূলধনের পরিমাণ না বাড়াইয়া তাহারা উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করে। যদি দামের বৃদ্ধি অনেক কাল ধরিয়া চলে, তবে তাহারা সকল উপাদান বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া, উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইউনিট-প্রতি ব্যয় দামের সমান না হয়, ততক্ষণ তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ ও যোগান বাড়াইয়া চলে। (গ) দাম বাড়িলে সেই শিল্পে নূতন ফার্মের সংখ্যা বাড়িয়া যায়, দ্রব্যটির যোগান বৃদ্ধি পায়। মুনাফা বেশি থাকার জন্য শিল্প হইতে চলিয়া আসিয়া ফার্মগুলি সেই শিল্পে উৎপাদন শুরু করে। দাম কমিলে বহু ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে, যোগানের পরিমাণও কমিয়া যায়। যোগানের এই নিয়মকে নিচের রেখাচিত্রে প্রকাশ করা চলে।

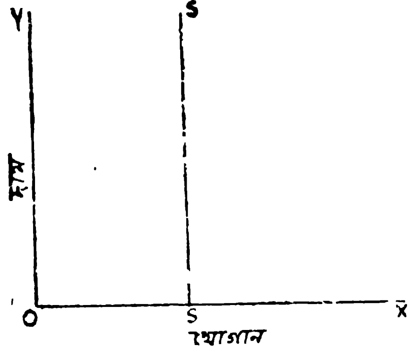
যোগানের নিয়ম ঘটে কেন



OY রেখা দামের এবং OX রেখা যোগানের পরিমাণ নির্দেশক; SS হইল যোগান-রেখা। দাম বাড়িলে যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দাম কমিলে যোগানও কমিতেছে।

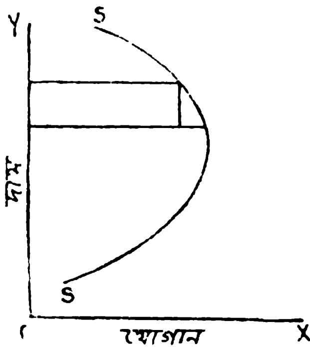
তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে :

(ক) যে সকল দ্রব্যের যোগান একেবারেই সীমাবদ্ধ (যেমন রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির আসল কপিগুলি), তাহাদের ক্ষেত্রে দাম বাড়িলে বা কমিলেও যোগানের পরিবর্তন হইবে না। পাশের ছবিতে দেখা যাইতেছে যে, যোগানের রেখা লম্বমুখী অক্ষের (Vertical axis অর্থাৎ Y-এর) সমান্তরাল. যোগানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে না। দাম কমিলে বা বাড়িলে যোগান সমানই থাকিতেছে।



অতি অল্পকালের মধ্যে যখন কোন ফার্ম উৎপাদনের কোনরূপ পরিবর্তন আনার মত সময় পাইতেছে না, সেই অবস্থাতেও যোগানের নিয়ম কার্যকরী হয় না।

(খ) অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বাড়িলে যোগান কমিয়া যায় এবং দাম কমিলে যোগান বাড়ে। যেমন মজুরি বাড়িলে শ্রমিকেরা কম কাজ করিয়া বেশিক্ষণ বিশ্রাম উপভোগ করিতে চাহে, শ্রমের যোগান কমে। মজুরি কমিলে বেশি শ্রম করিয়া পূর্বের ন্যায় মোট মজুরি পাইবার চেষ্টা করে, শ্রমের যোগান বাড়িয়া যায়। মূলধনের ক্ষেত্রেও, সুদের হার বাড়িলে কম সঞ্চয় করিয়া মোট সুদ বেশি পাওয়ায় মূলধনের যোগান কমিয়া যায়, সুদের হার কমিলে মোট সুদ একই পরিমাণে পাইতে হইলে বেশি মূলধন খাটাইবার প্রয়োজন হয়, উহার যোগান বাড়িয়া যায়। মজুরি কমিলে পরিবারের অন্যান্য লোকের চাকুরি করার প্রয়োজন হওয়ায় অনেক সময় তাহারাও শ্রমের বাজারে প্রবেশ করে, ফলে শ্রমের যোগান বাড়ে। মজুরি বাড়িলে তাহারা চাকুরি ছাড়িয়া দেয়, শ্রমের যোগান কমে। এই ছবিতে দেখা যাইতেছে, কি-ভাবে দাম বাড়িলেও যোগান কমিতেছে, এবং দাম কমিলেও যোগান বাড়িতেছে না। যোগানের নিয়ম এই ক্ষেত্রে কার্যকরী হইতেছে না।



যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply)

দামের পরিবর্তনের হার ও উহার ফলে যোগানের পরিবর্তনের হার—ইহাদের অনুপাতকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। দামে পরিবর্তনের ফলে যোগানে একই হারে পরিবর্তন হইলে তাহাকে সমহার স্থিতিস্থাপক যোগান বলে। দামে পরিবর্তনের তুলনায় উহা অপেক্ষা যোগানে পরিবর্তনের হার কম হইলে তাহাকে অস্থিতিস্থাপক যোগান বলে। দামে পরিবর্তনের তুলনায় উহা অপেক্ষা যোগানে পরিবর্তনের হার বেশি হইলে তাহাকে স্থিতিস্থাপক যোগান বলে।*

যোগানের উপর দাম-প্রভাব

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। (ক) যে উৎপাদন-পদ্ধতি খুবই নমনীয় ধরনের (Flexible), অর্থাৎ দাম-পরিবর্তনের ফলে নূতন অবস্থার সহিত বিনা কষ্টে অথবা খুবই কম ব্যয়ে খাপ খাওয়ানো সম্ভব, সেক্ষেত্রে যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে। বাজারে অধিক উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হইলে, উৎপাদন-পদ্ধতি শীঘ্র পরিবর্তন করার যোগ্য হইলে নূতন যন্ত্র এবং তাহা হইতে উৎপাদন শুরু করিতে কম সময়ের দরকার হইলে দাম বাড়িবার ফলে যোগান অধিক হারে বাড়িতে পারে এবং দাম কমিলে যোগান অধিক হারে কমিতে পারে। এক্ষেত্রে যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে। (খ) দ্রব্যটি অস্থায়ী ধরনের হইল (যেমন দুধ, মাছ ইত্যাদি) দাম কমিলে যোগান বেশি কমিবে না, কারণ তাহা জমাইয়া রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে, বাজার হইতে সরাইয়া গুদামে ফেলিয়া রাখা চলে না। এক্ষেত্রে যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবার সম্ভাবনা। (গ) বিক্রেতা যদি অনেক বাজারে দ্রব্যটি বিক্রয় করে, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে কোন একটি বাজারের দাম কমিলে সেই বাজার হইতে যোগান বেশি পরিমাণে কমাইয়া সে অন্য বাজারের বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে। যদি দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে অন্য বাজার হইতে মাল সরাইয়া সেই বাজারে যোগান বাড়াইয়া দিবে। এই রকম অবস্থায় প্রতিটি বাজারে যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে। (ঘ) ফার্মটি যদি বহুপ্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং একটি দ্রব্য হইতে অপর দ্রব্যটিতে অতি সহজে অপসারণ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে। (ঙ) দাম বাড়িলে যদি উৎপাদন বাড়ানো হয়, তাহা হইলে ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় সাধারণত বাড়িয়া যায়। কিন্তু দামের বৃদ্ধি কম

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

* 'The responsiveness of planned sales to changes in the expected selling prices is called the price-elasticity of supply."

হইলে (ধরা যাউক 50 প.), উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রে বাড়াইয়া লাভ নাই, ইউনিট-প্রতি ব্যয় অধিক পরিমাণে (যেমন 75 পয়সা) বাড়িতে পারে। এরূপ অবস্থায় দাম বাড়িলেও যোগান বাড়িবে না, যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবে। (চ) যতক্ষণ পর্যন্ত ফার্মের যন্ত্রপাতির উৎপাদনী ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় উৎপাদন না পৌছায় ততক্ষণ যোগান স্থিতিস্থাপক হইতে পারে (দাম বাড়িলে যন্ত্রের ক্ষমতার সীমা পর্যন্ত সহজেই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভবপর)। সেই সীমার পরে যোগান সাধারণত অস্থিতিস্থাপক হইবে। (ছ) ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম চলা অবস্থায় উৎপাদন বাড়ানো হইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়; সুতরাং দাম বাড়িলে বিক্রেতারা যোগান বাড়াইতে থাকে। এক্ষেত্রে যোগান স্থিতিস্থাপক। কিন্তু দাম কমিলে যোগান কমানো যায় না, কারণ উৎপাদন কমিলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া যায়। এক্ষেত্রে যোগান অস্থিতিস্থাপক।

দাম ব্যতীত অন্য বিষয়ে পরিবর্তন

বিভিন্ন দামে কোন ফার্ম একটি দ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণে যোগান দিবে। ইহা আমরা যোগানের নিয়ম হইতে জানিতে পারি। এই যোগানের নিয়ম আলোচনার সময়ে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, ফার্মের উৎপাদন সম্ভাবনা, উহার লক্ষ্য, বিভিন্ন উৎপাদনের মালিকের সহিত দাম বা অন্যান্য বিষয়ে চুক্তি, এবং পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির দাম, প্রভৃতি বিষয় অপরিবর্তিত আছে। যদি এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন আসে, তবে ফার্মটির যোগানও পরিবর্তিত হইয়া যায়। সমগ্র যোগান রেখা ডাহিনে বা বামে সরিয়া আসে।

প্রথমত, ফার্মের উৎপাদন-সম্ভাবনা বহু কারণে পরিবর্তিত হয়, যেমন নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণ করিলে, অথবা একই পদ্ধতি বজায় রাখিয়া ঘরবাড়ি বা কলকারখানার আয়তন বাড়াইলে বা কমাইলে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগান বাড়াইতে থাকিলে যোগান-রেখা ডাহিনে এবং যোগান কমাইতে থাকিলে উহা বামে সরিয়া আসে।

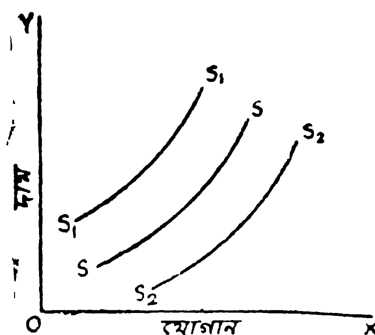
দ্বিতীয়ত, 'স্থির উপাদানগুলি'র সহিত ফার্মটির চুক্তিতে পরিবর্তন আসিলে ব্যয়-রেখা পরিবর্তিত হইতে পারে, তাই নূতন বিন্দুতে তাহার নীট রেভিনিউ সর্বাধিক হইতে পারে।

তৃতীয়ত, ফার্মটির লক্ষ্যে পরিবর্তন আসিলে তাহার যোগানের পরিমাণ বদল হইতে পারে। ফার্মটির লক্ষ্য থাকিতে পারে সর্বাধিক নীট রেভিনিউ, নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ নীট রেভিনিউ, অথবা কোন মতে খরচা তুলিয়া আনা। এইরূপ

কোন একটি লক্ষ্য পরিবর্তন হইলে তাহার যোগানের পরিমাণও পরিবর্তিত হইবে।

চতুর্থত, এক বা একাধিক পরিবর্তনীয় উপাদানের দামে পরিবর্তন হইলেও ফার্মের যোগান ভিন্নরূপ হইবে। পরিবর্তনীয় উপাদানের দাম হ্রাস পাইলে ফার্মটি যোগান বাড়াইয়া দিবে বা উহার দাম বৃদ্ধি পাইলে সে যোগান কমাইয়া দিবে।

এই সকল কারণে দ্রব্যটির যোগানে পরিবর্তন আসিলে উহার যোগান-রেখা কিরূপে ডাহিনে ও বামে চলাফেরা করে তাহা আমরা নীচের চিত্র হইতে জানিতে পারি।



উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production)

কোন ফার্মের মোট ব্যয়ের মধ্যে দুই ধরনের বিষয় থাকে : (i) এমন কতকগুলি ব্যয় যাহাতে ফার্মের নিজের তহবিল হইলে টাকা খরচা হয়। যেমন, মজুরি ও বেতন, কাঁচামালের দাম, জ্বালানি, বিক্রয়ের জন্য কেনা যন্ত্রপাতি, পরিবহনের খরচা, ধার টাকার উপর সুদ, জমি বা বড় কোনো যন্ত্রপাতি ভাড়া নেওয়ার জন্য সুদ, বিজ্ঞাপনের খরচা, সরকারকে কর দেওয়া—প্রভৃতি। এইগুলিকে আমরা খরচ-ব্যয় অথবা প্রকাশ্য-ব্যয় (Expenditure costs or Explicit costs) বলিতে পারি ইহাদের জন্য খরচ সাধারণত চুক্তিবদ্ধ (contractual) থাকে।

ফার্মের মোট ব্যয় দুই ধরণে বিভক্ত, প্রকাশ্য ও অব্যক্ত

মনে রাখা দরকার, ফার্ম যাহা খরচ করে উহার সবই ব্যয় নয়। মূলধনী দ্রব্য কিনিলে ফার্মের খরচ হয়, কিন্তু উহাকে ব্যয় বলে না, ইহা হইল ফার্মের সম্পত্তির রূপান্তরণ মাত্র। হিসাবের খাতায় ইহাদের মূলধনী খাতে (capital

account) ধরা হয়, এবং ঐ মূলধনের জীবদ্দশায় যাহাতে উহার দাম উঠিয়া আসে সেই উদ্দেশ্যে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য মুনাফা হইতে কিছু অংশ সরাইয়া রাখা হয়।

(ii) ফার্মের খরচাহীন ব্যয়, অর্থাৎ অপ্রকাশ্য বা অব্যক্ত ব্যয় (non-expenditure costs or implicit costs) এমন ধরনের বিষয় লইয়া গঠিত যাহাদের জন্য ফার্মকে চুক্তিবদ্ধ থাকিতে হয় না। ফার্মটি নিজে বা ফার্মের মালিকেরা নিজেরা যে সকল উপাদানের মালিক, উহাদের ব্যবহারের জন্য কোনো দাম দিতে হয় না, সাধারণত কোনো চুক্তি ছাড়াই উহারা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দ্রব্যের উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে উহাদের হিসাব করিয়া ধরা প্রয়োজন। অন্যত্র ব্যবহৃত হইলে যে দাম পাওয়া সম্ভব ফার্মের নিজস্ব উপাদানের উপর সেই দাম আরোপ করিয়া (imputed value) উহাদের ব্যয়ের হিসাবে আনিতে হয়। এই দুই ধরনের বিষয়: সুব্যক্ত ও অব্যক্ত খরচ—ইহাদের যোগ করিয়া পাওয়া যায় ফার্মের ব্যয়।

সাধারণত ফার্মগুলির টিপিকাল (typical) সংগঠন হইল যৌথ মূলধনী ধরনের। এই ধরনের ফার্মের দুইটি প্রধান খরচহীন ব্যয়ের বিষয় হইল, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ এবং শেয়ারহোল্ডারদের 'স্বাভাবিক' হারে লভ্যাংশ দান। ক্ষয়ক্ষতিপূরণ হিসাবে করা হয় কিভাবে? কোনো মূলধনী দ্রব্যের ক্রয়ে যে টাকা খরচ হইয়াছে তাহা ঐ দ্রব্যের জীবদ্দশায় পূর্ণ পরিমাণে তুলিয়া আনিলে ফার্মটির মূলধন অক্ষুণ্ণ থাকে (maintaining capital intact)। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অল্প অল্প করিয়া ক্ষয়ক্ষতিপূরণের ঐ টাকা তুলিয়া আনিতে হয়। এই বাবদ ফার্মের ব্যয় কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ থাকে না, এই টাকা তুলিয়া আনিয়া আবার অন্য কোনো উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা চলে। কিন্তু ইহা ফার্মের মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ঠিক এই রকমই, ফার্মের মালিকেরা, অর্থাৎ শেয়ারহোল্ডাররা, তাহাদের দেওয়া আর্থিক মূলধনের উপর কিছুটা "স্বাভাবিক" প্রতিদান নিশ্চয় পাইবে (normal return)। ঝুঁকির ব্যাপারে তুলনীয় অন্যান্য ফার্মে টাকা খাটাইলে সে যাহা পাইতে পারিত, এক্ষেত্রেও অন্তত সেইটুকু তাহাকে পাইতে হইবে। উহাই তাহার মূলধনের "স্বাভাবিক" প্রতিদান। ওই ফার্মে টাকা না খাটাইয়া সে বণ্ড কিনিয়া টাকা ধার দিতে পারিত বা অন্য কোনো ফার্মের শেয়ার ক্রয় করিতে পারিত, জমি বা বাড়ি কিনিতে পারিত। এই সকল অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে যে-প্রতিদান সে পাইতে পারে, অন্তত সেটুকু এক্ষেত্রে তাহাকে দিতে

হইবে। ইহা না পাইলে সে তাহার অর্থ অন্য কোথাও সরাইয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে।

ছোটো ছোটো ব্যবসায়ে, বিশেষভাবে অংশীদারী বা একক-মালিকানা ব্যবসায়ে আর একটি খরচাহীন ব্যয়ের কথা গুরুত্বপুর্ণ। মালিকেরা নিজেরা নিজেদের ব্যবসায় না চালাইয়া অন্যত্র নিজেদের সংগঠন ক্ষমতা বিক্রয় করিয়া যে মজুরি পাইতে পারিত, নিজেদের ব্যবসায় হইতে অন্তত সেই পরিমাণ আয় বা লাভ সে পাইতে চাহিবে। অল্পদিনের জন্য সে 'স্বাধীন' ব্যবসায় হইতে কম লাভ পাইলেও থাকিবে, কিন্তু দীর্ঘকালে ওইটুকু না পাইলে সে 'স্বাধীন' ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবে।

উৎপাদন ব্যয়ের আচরণ ও কাল বিশ্লেষণ (Output, cost behaviour and the time element)

কোনো ফার্ম উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইলে দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয় কিরূপে পরিবর্তিত হয় তাহাই ফার্মের আচরণ অনেকাংশে নিরূপণ করে। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ফার্মের ব্যয় কিরূপে পরিবর্তিত হইবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে উৎপাদনে এই পরিবর্তন কতদিন ধরিয়া চলিবে তাহার উপর। ব্যয়-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধনবিজ্ঞানীরা ফার্মের উৎপাদন পরিকল্পনায় পরিবর্তন ঘটাইবার মোট সময়কে দুইটি অংশে বিভক্ত করেন, স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল (Short run and Long run)। এই স্বল্পকাল বলিলে অত্যল্পকাল বা বাজার-কাল (Extremely short period or Market Period) বোঝায় না। ধনবিজ্ঞানে অত্যল্পকাল হইল এত অল্প সময় যখন দ্রব্যের যোগানে কোনো পরিবর্তনের সময় নাই। সুতরাং যাহা ব্যয় হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে আর উহাতে পরিবর্তন আসিবে না। ফার্মটি উৎপাদন কমাইবার বা বাড়াইবার সময় ও সুযোগ পাইতেছে না, তাহার মোট বা গড় উৎপাদন-ব্যয়ও সমান আছে। ব্যয়-বিশ্লেষণে অত্যল্পকাল তাই আলোচ্য নয়। আবার সেইরূপ অতি দীর্ঘকাল (Extremely long period or Secular period) আমাদের আলোচ্য নয়, উহা অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু। জনসংখ্যা, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী—এই সকল কিছুই অতি দীর্ঘকালে পরিবর্তিত হইয়া যায়। ব্যয় রেখার এই অতি দীর্ঘকালীন অপসরণ (secular shift) আমাদের আলোচনার ভিতরে আসিবে না। এই কারণে

ব্যয় বিশ্লেষণে দুইটি কালাংশ: স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল

ধনবিজ্ঞানীরা বাকি দুই কালাংশকে ব্যয় বিশ্লেষণে গুরুত্ব দেন, অর্থাৎ স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল।

স্বল্পকাল কাহাকে বলে ? যে সময়ের মধ্যে ফার্মটি কোনো কোনো বা কোনো-না-কোনো উপকরণের যোগান পরিবর্তন করিতে অক্ষম, উহাদের বা উহাকে স্থির ও পরিবর্তনীয় ধরিয়া লইয়া ফার্মটিকে উৎপাদন বাড়াইতে বা কমাইতে হইতেছে। নূতন মূলধনী যন্ত্রপাতি হঠাৎ যে-কোনো সময়ে পাওয়া যায় না বা তৈয়ার হয় না। অনেক সময় অতিরিক্ত দক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারী মেলে না, তাহাদের শিখাইয়া পড়াইয়া লইতে সময় অতিবাহিত হয়। ঠিক সেইরূপ, উৎপাদন সহসা কমাইলে, বিশেষত্বশীল (specialised) মূলধনী দ্রব্যসমূহ হঠাৎ বিক্রয় করা চলে না, করিলেও উপযুক্ত দাম পাওয়া সম্ভব হইবে না। দরকার না থাকিলেও এই অবস্থায় ফার্মটি নিম্ন উৎপাদনের স্তরে ওই যন্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। নির্দিষ্ট সময়ে চুক্তিতে ঋণ গ্রহণ করিলে হঠাৎ চুক্তিভঙ্গ করিয়া ঋণ শোধ করাও সম্ভব নয়, চুক্তিতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুদ টানিয়া যাইতে হয়।

স্বল্পকাল কাহাকে বলে

আমরা এমন একটি সময়ের কথা কল্পনা করিতে পারি (যেমন অত্যল্প কাল) যখন কোনো উপকরণই পরিমাণে বাড়ানো বা কমান সম্ভব নয়। সময় যত প্রসারিত হয়, ততই ফার্মটির পক্ষে কোনো-না-কোনো একটির পরিমাণ বাড়ান-কমান সম্ভব হইতে থাকে। সময়ের দীর্ঘতা আমরা যত বাড়াইতে থাকি, ততই উপকরণগুলির বেশির ভাগই পরিবর্তনশীল হইয়া উঠে, অবশেষে সকল উপকরণকেই আমরা পরিবর্তনীয় বলিয়া ধরিতে পারি। এই দুই সীমার মধ্যের সময় হইল স্বল্পকাল ; ইহার একদিকে অত্যল্পকাল, যখন কোনো উপকরণই বাড়ান যাইতেছে না, অপরদিকে দীর্ঘকাল, যখন সকল উপকরণই পরিবর্তনীয়।

বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণে পরিবর্তন আনা সম্ভব কি না তাহা নির্ভর করে ঐ সকল উপাদানের প্রকৃতি এবং উহাদের কি সর্তে ভাড়া লওয়া বা ক্রয় করা হইয়াছে তাহার উপর। কোনো কোনো উপাদান, যেমন জমি ও ঘরবাড়ী প্রভৃতি, হয়ত ফার্মটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া করিয়াছে। যদি সেইগুলির মালিক ফার্ম নিজেই হয় তবে আরও জমি ও ঘরবাড়ি যোগাড় করা বা বিক্রয় করিয়া দেওয়া উভয়ই বেশ কিছুটা সময়সাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে। আবার অপরদিকে দেখা যায় যে বিদ্যুৎশক্তি, শ্রমিক, পরিবহণ, কাঁচামাল এবং অর্ধনির্মিত দ্রব্য সামগ্রী প্রভৃতিতে পরিবর্তন আনিতে অনেক কম সময় দরকার হয়।

ঠিক কতটা সময়কে আমরা স্বল্পকাল বলিতে পারি তাহা বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন রকম। কোনো কোনো শিল্পে স্বল্পকাল বলিলে খুবই অল্প সময় বুঝা যাইবে। এই সকল শিল্পে ফার্মগুলি ছোট, ইহাতে স্থির বা নির্দিষ্ট উপকরণের পরিমাণ কম এবং অল্প সময়ের মধ্যে উহাদের কমানো-বাড়ানো যায়। আবার কতকগুলি শিল্পে স্বল্পকাল বলিলে অনেকটা সময় বোঝা যায়, কারণ সেখানে স্থির উপাদানের পরিমাণ বেশি এবং উহাতে পরিবর্তন আনিতে বেশ কিছু সময় দরকার।

কোনো ফার্ম যে পরিমাণ স্থির বা নির্দিষ্ট উপাদান ব্যবহার করে তাহার দ্বারাই ফার্মটির আয়তন বা মাত্রা (scale of the plan) বোঝা যায়। প্রত্যেকটি ফার্ম স্বল্পকালে নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ স্থির উপাদান ব্যবহার করে বলিয়া স্বল্পকালে তাহার একটা নির্দিষ্ট মাত্রা থাকে। এই মাত্রা হইল ঐ সময়ের মধ্যে তাহার উৎপাদন পরিমাণের সর্বোচ্চ সীমা। পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া কমাইয়া ঐ নির্দিষ্ট উৎপাদন মাত্রার মধ্যে ফার্মটি আউটপুট বাড়ায় বা কমায়। যেমন একটি যাঁতাকল আছে। কি পরিমাণ ডাল ভাঙ্গা হইবে তাহাতে পরিবর্তন আনিয়া উহার আউটপুটে কমানো বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু হাতে অনেক ডাল থাকিলে সর্বোচ্চ উৎপাদনের সীমা কতটা পরিমাণ তাহা ঐ যাঁতার আয়তনের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

অপরপক্ষে, দীর্ঘকাল বলিলে বোঝা যায় এমন পরিমাণ সময় যাহাতে সকল উপাদানের পরিমাণে রদবদল করা সম্ভবপর। সকল শিল্পের ক্ষেত্রে এই দীর্ঘকাল সমান নয়। স্থির বা নির্দিষ্ট উপাদানের পরিমাণ, তাহাদের আয়ুষ্কাল, বাহির হইতে এই সকল উপাদান ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা, মূলধনী দ্রব্য কতটা বিশেষত্বশীল অর্থাৎ কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ফার্মদ্বারা ব্যবহারযোগ্য কি না, এই সকল বিষয়ের উপর দীর্ঘকাল নিভর করে। এই সময়ের মধ্যে সকল উপকরণই পরিবর্তনীয়, এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করার কোনো প্রশ্ন এই সময়ে উঠে না। ফার্মের পক্ষে উহার মাত্রায় (বা scale) পরিবর্তন আনিতে যথেষ্ট সময় দেওয়া আছে। সে যে কোনো মাত্রায় পরিবর্তন করিতে পারে, আয়তনে অতিক্ষুদ্র পরিবর্তন আনিতে (infinitesimal variations in size), তত্ত্বের দিক হইতে তাহার সম্মুখে কোনো বাধা নাই।

ফার্মের স্বল্পকালীন ব্যয় ও উৎপাদন (Short run cost and output of the Firm)

উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি হইলে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের যেভাবে পরিবর্তন হয় তাহা বিশ্লেষণের জন্য উৎপাদনের সময় বিচার প্রয়োজন। অত্যল্পকাল (Extremely short period) বলিতে ধনবিজ্ঞানে এমন সময় বোঝা যায়, যখন দ্রব্যের যোগানে পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ব্যয় যাহা হইয়াছে, তাহার পরিবর্তনের কথা উঠিতে পারে না। যখন ফার্মসমূহ মোটেই উৎপাদন বাড়াইবার বা কমাইবার কোনো সময় পায় না, সেই সময়টুকুর নাম হইল অত্যল্পকাল। অত্যল্পকালের বিশ্লেষণে তাই উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠে না এবং অত্যল্পকালীন দাম প্রধানত চাহিদার উপর নির্ভরশীল।

অত্যল্প কাল উৎপাদন ব্যয় স্থির থাকে

কিন্তু যখন স্বল্পকালীন বিশ্লেষণ করা হয়, তখন উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন ঘটে। স্বল্পকাল বলিতে এমন সময় বুঝায় যখন ফার্মের স্থির ব্যয়ে পরিবর্তন হয় না, কেবল পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে বা উহা কমাইয়া উৎপাদন কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যন্ত্রের আকার, বাড়ি, ইত্যাদি নূতন করিয়া বাড়াইবার সময় নাই; শুধু কাঁচামাল, শ্রমিক প্রভৃতি বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়ানো চলে। প্রত্যেক ফার্মই একটি বিশেষ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার উপযোগী ক্ষমতার কাঠামো বা বনিয়াদ লইয়া শুরু করে। কিন্তু সে প্রথমেই সকল যন্ত্রপাতি বা উপাদানের পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারে না, বাজারের অবস্থা অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। উৎপাদনের মাত্রা স্থির রাখিয়া কি পর্যন্ত উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং তাহার ফলে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ে কি ধরনের পরিবর্তন হয় তাহার বিশ্লেষণই হইল স্বল্পকালীন ব্যয়-বিশ্লেষণ।

স্বল্প কাল ঃ স্থির ব্যয় স্থির থাকে

এই সময়ে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ে কিরূপ পরিবর্তন হয় তাহা পরবর্তী তালিকায় দেখানো হইয়াছে। স্থির ব্যয় সমান থাকে কারণ, তাহা বদলাইবার সময় নাই ইহাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রথমে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় অল্প বাড়াইলেই চলে, কিন্তু শ্রমিক, যন্ত্র বা পরিচালকের শক্তির পূর্ণ ব্যবহার হওয়ার পরে উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ক্রমশ তাহা অধিক পরিমাণে বাড়াইতে হয়। গড় স্থিরব্যয় প্রথমে দ্রুত কমে, তাহার পর ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রথমে কমে, তাহার পর দ্রুত বাড়িতে থাকে। ইহাদের

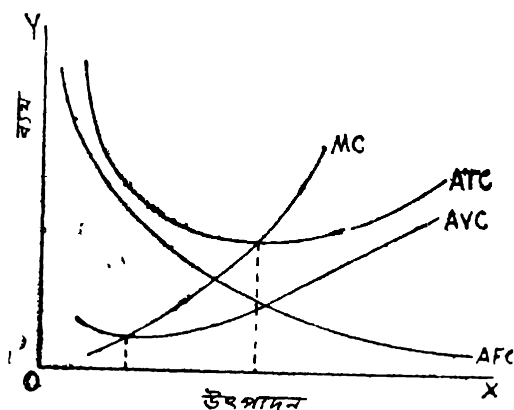
নীচের তালিকা হইতে স্বল্পকালীন উৎপাদন-ব্যয়ের বিভিন্ন বিভাগের গতিপ্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে।

(ভগ্নাংশ বাদ দিবার জন্য প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত হিসাব করা হইতেছে)

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট স্থির ব্যয়	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়	গড় স্থির-ব্যয়	গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়	গড় মোট ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়	গড় ও প্রান্তের সম্পর্ক
1	20	10	10	10	30	30	উভয়েই কমিতেছে ; প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের কম।
2	20	20	10	10	10	10	
3	20	25	6·6	8 4	15	5	
4	20	28	5	7	12	3	
5	20	30	4	6	10	2	প্রান্তিক ব্যয়, যখন গড় ব্যয় ছাড়াইয়া উপরে উঠিতেছে, তখন গড় ব্যয় সবচেয়ে কম।
6	20	51	3·3	8 7	12	12	
7	20	85	2 8	12·1	15	33	
8	20	140	2 5	17 5	10	55	উভয়েই বাড়িতেছে ; প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় হইতে বেশি।
9	20	250	1·1	27 8	30	110	
10	20	430	1	43	45	180	
একটি ইউনিট করিয়া বৃদ্ধি	স্বল্পকালীন হিসাব বলিয়া একই রহিয়াছে দীর্ঘকালীন হিসাবে ইহা বদলাইবে	5 পর্যন্ত পরিবর্তনীয় ব্যয় অল্প বাড়িয়া চলিতেছে কিন্তু তাহার পর ক্রমেই বাড়িতেছে	(প্রথমে 5 পর্যন্ত) দ্রুত কমিতেছে তাহার পর ধীরে ধীরে কমিতেছে	প্রথমে 5 পর্যন্ত কমিতেছে তাহার পর বাড়িতেছে এবং বৃদ্ধির হার দ্রুত	প্রথমে কমিতেছে (5 পর্যন্ত), তাহার পর বাড়িতেছে, এবং বৃদ্ধির হার দ্রুত	প্রথমে কমিতেছে (5 পর্যন্ত), তাহার পর বাড়িতেছে, বৃদ্ধির হার দ্রুত	

মিলিত ফলে গড় ব্যয় প্রথমে কমে, তাহার পর বাড়ে, ক্রমশ দ্রুত বাড়িতে থাকে। প্রান্তিক ব্যয় প্রথমে কমে (তখন সে গড ব্যয়ের কম), তাহার পর বাড়ে (তখন সে গড ব্যয়ের বেশি)। পরবর্তী চিত্রে উহাদের রেখা-রূপ দেখানো হইতেছে।

4 চিহ্নিত স্থান পর্যন্ত উৎপাদন করিলে গড় ব্যয় কমে, উহাই গড ব্যয়ের সর্বনিম্ন বিন্দু। তাহার পরেও উৎপাদন বাড়াইলে গড ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকর হইতে শুরু করে (কারণ যন্ত্রপাতি ঘর বাড়ি প্রভৃতিকে স্থির উপাদান হিসাবে রাখা হইয়াছে)। গড়ব্যয়ের আকৃতি অনেকটা ইংরেজী U শব্দের মত বা 'পিরীচের' মত।



স্বল্পকালীন গডব্যয়ের রেখার রূপ বিভিন্ন শিল্পে এবং বিভিন্ন ফার্মে পৃথক হয়। যন্ত্রপাতির প্রকৃতি, উৎপাদনের মাত্রা, বিনির্দিষ্ট উপাদান ব্যবহারের পরিমাণ, পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিমাণ প্রভৃতি অনেক কিছুর উপর ইহা নির্ভরশীল। কখনও পিরীচের ন্যায়, কখনও U-র, ন্যায় কখনও বা ইহা V-র ন্যায় হইবে। স্বাভাবিক উৎপাদন-ক্ষমতার পুর্বে স্থির উপাদান ও অবিভাজ্য উপাদানগুলির জন্য ব্যয় কত দ্রুত হ্রাস পাইতেছে এবং সেই সীমা অতিক্রম করিয়া পরিবর্তনীয় ব্যয় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহার উপর ইহা প্রধানত নির্ভর করে।

ফার্মের দীর্ঘকালীন ব্যয় (Longrun Average Cost)

দীর্ঘকাল বলিলে বোঝা যায় যে-সময়ের মধ্যে ফার্মের যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি প্রভৃতি স্থির ব্যয়ে পরিবর্তন আনা যায়, অর্থাৎ উৎপাদনের মাত্রা (scale)

বাড়ানো বা কমানো যায়। দীর্ঘকালে কোনো উপাদানের সহিত ফার্মটি কোনরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ নাই এবং নিজের খুশিমত উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করিবার উপযুক্ত সময় আছে, ঘরবাড়ির আয়তন ও যন্ত্রপাতির পরিমাণকে আর স্থির তথ্য (Fixed data) মনে করিয়া লওয়া চলে না।* অবাঞ্ছিত ঘরবাড়িগুলিকে বিক্রয় করিয়া বা ভাড়া দিয়া দেওয়া চলে। পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে বীমার পলিসিগুলি খাপ খাওয়াইয়া লওয়া চলে এবং কম বা বেশি উৎপাদনের উপযোগী ফার্মের পরিচালন ও বিক্রয় বিভাগ বাড়ানো বা কমানো যাইতে পারে। ইহার ফলে দীর্ঘকালে মোট স্থির ব্যয়ে গুরুতর পরিবর্তন আসিতে পারে। অর্থাৎ বলা চলে দীর্ঘকালে স্থির ব্যয়ের সংখ্যা খুব কম, বেশির ভাগই পরিবর্তনীয় (Variable)। ইহার তাৎপর্য এই যে দীর্ঘকালে ফার্মটি যে পরিমাণ উৎপাদন করিতে চাহিতেছে তাহা সর্বাধিক দক্ষতার সহিত উৎপাদন করিবার উপযোগী উৎপাদনমাত্রায় সে পৌছিতে পারে। স্বল্পকালে উৎপাদন কমাইলে গড় ব্যয় বাড়ে, কারণ তখন ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে স্থির ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। দীর্ঘকালে উৎপাদন কম করিলে কিছুটা স্থির ব্যয় কমানো যায়। তাই স্বল্পকালের তুলনায় দীর্ঘকালে গড় স্থির ব্যয় কম হয়।

দীঘকাল কাহাকে বলে

স্বল্পকালে উৎপাদনের স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দীর্ঘকালে ফার্মের আয়তন বা উৎপাদন-মাত্রা এমনভাবে বদলানো যায় যাহাতে সুচিন্তিত ও উপযুক্তভাবে বেশি পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভবপর। তাই স্বল্পকালের তুলনায় দীর্ঘকালে পরিবর্তনীয় ব্যয়গুলিতে ততটা দ্রুত বৃদ্ধি হয় না।

আরও বলা চলে যে দীর্ঘকালে অবিভাজ্য উপাদানগুলিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। ইহার কারণ হইল দীর্ঘকালে ইহারা কিছুটা পরিমাণে বিভাজ্য। স্বল্পকালে ফার্মের ব্যয়-রেখার আকৃতি প্রধানত নির্ভর করে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের কার্যকারিতার উপর—এই সময় মূলধন ও পরিচালনাকে স্থির (অবিভাজ্য) উপাদান হিসাবে ধরা হয়। দীর্ঘকালে ফার্মের ব্যয়-রেখার আকৃতি নির্ভর করে মাত্রা-বৃদ্ধির প্রতিদানের উপর (returns

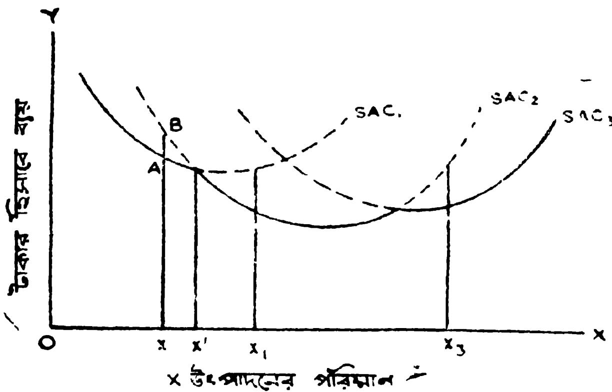
† "In laying plans for the long period, the problems that face us (and the firm) are more complex. First, the firm is not prevented by past agreement or by lack of time for varying the quantity of any output ; the size of the buildings and the quantity of equipment are no longer data."

to scale)। দীর্ঘকালে মূলধনের পরিমাণও বদ্‌লানো যায় এবং দরকার হইলে পরিচালন-ব্যবস্থা ভিন্নরূপে সাজানো চলে। ইহারা আর সম্পূর্ণ অবিভাজ্য নয়।

এইরূপে সকল উপাদানকে বিভিন্ন অনুপাতে ব্যবহার করা সম্ভব হইলে ফার্মটির উৎপাদন-মাত্রায় পরিবর্তন আনা চলে। একটি স্তরের পর অপর স্তর—এইরূপে উৎপাদন-মাত্রা বদ্‌লাইয়া ফার্মটি নিজের লক্ষ্য অনুযায়ী দীর্ঘকালীন উৎপাদনের পরিমাণে পৌছিতে চেষ্টা করে। প্রতিবার স্বল্পকালীন উৎপাদন-মাত্রা বদ্‌লাইলেই আমরা সেই ফার্মের একটি নূতন দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখার সন্ধান পাই। বিভিন্ন স্বল্পকালীন আচরণের মধ্য দিয়া তাহার দীর্ঘকালীন গতিপথ প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা হঠাৎ কখনো ফার্মের দিকে তাকাইলে উহার স্বল্পকালীন আচরণই দেখিতে পাই। কিন্তু ফার্মটিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে সে স্বল্পকালীন অবস্থায় পরিবর্তন আনিবার সুযোগ পাইয়াছে। খণ্ড খণ্ড স্বল্পকালীন চিত্রগুলি জোড়া দিয়া ফার্মের দীর্ঘ-কালীন আচরণের চলচ্চিত্র (motion picture) ফুটিয়া বাহির হয়।

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা (Long run Average cost curve)

মনে কর, ফার্মটি কতকগুলি বিকল্প মাত্রায় উৎপাদন করিতে পারে। এই মাত্রাগুলির নাম হইল হইল SAC_1, SAC_2, SAC_3। প্রত্যেকটি SAC curve সেই নির্দিষ্ট মাত্রায় এক একটি স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখা। দীর্ঘকালে ফার্মটি

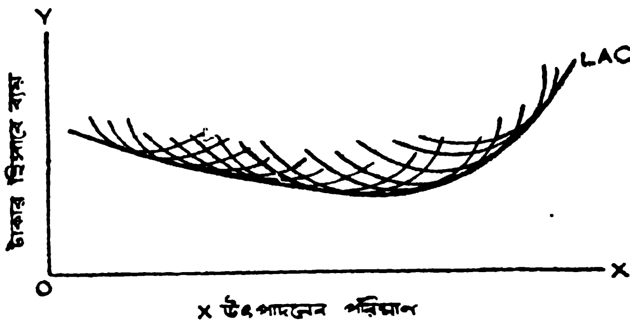


যে-কোনো মাত্রায় থাকিতে পারে অথবা একটি হইতে অপরটিতে অপসরণ করিতে পারে।

ফার্মটি কোন মাত্রায় অবস্থান করিবে ইহা নির্ভর করে দীর্ঘকালে কি পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইবে তাহার উপরে। আমরা ধরিয়া লইব যে উৎপাদনের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন সেখানে ফার্মটি বিশেষ কোনো উৎপাদন-পরিমাণের নিম্নতম গড ব্যয়ের বিন্দুতে উৎপাদন করিতে চায়। মনে কর উৎপাদনের পরিমাণ হইল X, এই অবস্থায় ফার্মটির উচিত SAC_1 চিহ্নিত মাত্রায় উৎপাদন করা, কারণ ইহাতে সে X পরিমাণ উৎপাদন সর্বাপেক্ষা কম ইউনিট-ব্যয়ে (XA) পাইতে পারে। ফার্ম যদি SAC_2 মাত্রায় উৎপাদন করে, তাহা হইলে ইউনিট প্রতি তাহার উৎপাদন-ব্যয় হইবে XB. X' পরিমাণ উৎপাদনে ফার্মটি SAC_1 এবং SAC_2-র মধ্যে নিরপেক্ষ থাকিবে, কিন্তু X_1 পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইলে ফার্মটি SAC_2 পছন্দ করিবে. X_3 পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইলে ফার্মটি SAC_3 দ্বারা প্রকাশিত উৎপাদনের মাত্রা ব্যবহার করিবে।

এই অবস্থায় ফার্মের দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখা কি হইবে? যখন ফার্মটি ইচ্ছামত কলকারখানার মাত্রা তৈয়ার করিতে সময় পায় সেই অবস্থায় বিভিন্ন মাত্রায় উৎপাদনের বিভিন্ন স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাগুলিকে পর পর সাজাইয়া আমরা এই দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখা পাইতে পারি। পূর্বের চিত্রের SAC রেখাগুলির ভাঙা দাগের অংশগুলি অপ্রয়োজনীয় অংশ, কারণ ফার্মটি দীর্ঘকালে কখনই ঐ ভাঙা দাগের অংশে উৎপাদন করিবে না, কারণ সে কলকারখানার মাত্রা বদলাইয়া উৎপাদন ব্যয় কমাইয়া দিতে পারে।

অসংখ্য ক্ষুদ্র মাত্রার উৎপাদন পার হইয়া ফার্মটির দীর্ঘকালীন রেখা দেখা দেয়. নীচের চিত্রে এইরূপ অসংখ্য SAC রেখা দেখা যাইতেছে, আরও অসংখ্য



SAC রেখা আঁকিয়া দেখানো সম্ভবপর। এই SAC রেখাগুলির তলার দিক

দিয়া যে মোটা দাগটি গিয়াছে উহাই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা বা LAC, ধরিয়া লওয়া হয় যে যত SAC রেখা রচিত হওয়া সম্ভব, উহাদের ছোট ছোট অংশ লইয়া LAC রেখাটি গঠিত। কলকারখানার (বা উৎপাদনের) বিভিন্ন মাত্রা প্রকাশ করে এই অসংখ্য SAC রেখাগুলি, ফার্ম যতগুলি মাত্রা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া দীর্ঘকালে উৎপাদন বাড়াইতে পারে। LAC রেখাটি ইহাদের সকলের স্পর্শক, গণিত শাস্ত্রের ভাষায় ইহা SAC রেখাগুলির এনভেলাপ রেখা (envelope curve)। প্রতি ক্ষেত্রেই ফার্মের লক্ষ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন যে-মাত্রার নিম্নতম ব্যয়ে সম্ভব ফার্মটি সেই মাত্রা বাছিয়া লইবে। তাই বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইলে কিরূপ বিভিন্ন পরিমাণ দীর্ঘকালীন ব্যয় দরকার হয় তাহা রেখাচিত্রে অঙ্কন করা সম্ভব। দীর্ঘকালে উৎপাদনের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইলে সকল উপাদানের যথাসম্ভব পরিবর্তন ঘটাইয়া উৎপাদন পরিমাণের প্রতিটি বিন্দুতে কিরূপ বিভিন্ন গড় ব্যয়গুলি দেখা দিবে তাহাই আমরা এইরূপ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা হইতে জানিতে পারি।

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখার আকৃতি কিরূপ হইবে তাহা নিভর করে আমরা কি-ধরনের স্বীকার্য বিষয় গ্রহণ করি তাহার উপর। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, উপাদানের দাম স্থির আছে, অর্থাৎ উপাদানের দামে পরিবর্তনের দরুন উৎপাদন-ব্যয়ে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিতেছে না।*

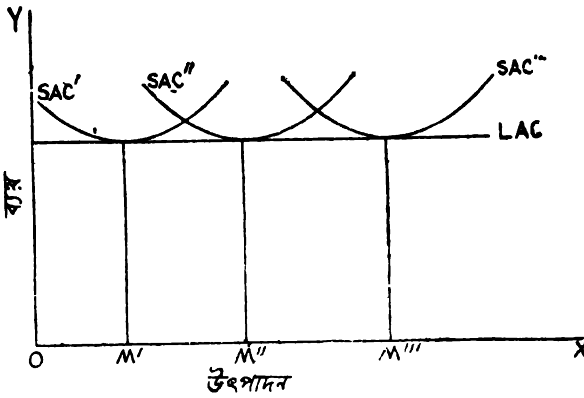
আকৃতি কিরূপ হইবে

এইরূপ অবস্থায় যদি আমরা ধরিয়া লই যে, সকল উপাদান পূর্ণরূপে বিভাজ্য এবং উৎপাদনের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিলে কোনরূপ ব্যয়সঙ্কোচ (economies) পাওয়ার সুবিধা নাই, তাহা হইলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় সমান থাকিবে এইরূপ মনে করা চলে। ইহার তাৎপর্য হইল দীর্ঘকালে যে-কোনো পরিমাণ উৎপাদন করিতে গেলে সকল উপাদানের সর্বোত্তম সম্মিলন সম্ভবপর।

তাহা নির্ভর করে আমরা কিরূপ স্বীকার্য বিষয় গ্রহণ করি

* উপাদানের বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ যতই কমবেশি হউক না কেন উহার দামে কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দামে উপাদানের যোগান অসীম স্থিতিস্থাপক ধরিয়া লইলেই ইহা সম্ভব।

পরবর্তী চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে। মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান হইল সমহার,



যদিও কোনো এক নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে স্বল্পকালে এই প্রতিদান পরিবর্তনীয়। OM′, OM′, বা OM″ উৎপাদন যাহাই হউক না কেন, ফার্মটি যে-কোনো মাত্রায় উৎপাদন করুক না কেন, উহার গড ব্যয় সমানই থাকিবে। এইরূপ অবস্থায় LAC বা দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখার আকৃতি উপরে দেখা যাইতেছে।*

কিন্তু বাস্তব জগতে এইরূপ স্বীকার্য বিষয় গ্রহণ করা খুবই অযৌক্তিক। দীর্ঘকালেও সকল উপাদান পূর্ণরূপে বিভাজ্য ইহা কিছুতেই মনে করা চলে না। তাহা ছাডা, উৎপাদনের মাত্রা বাডিলে, শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রের ব্যবহার প্রসারলাভ করিলে কিছু-না-কিছু ব্যয়সঙ্কোচ আমরা নিশ্চয় পাইতে পারি। কোনো-না-কোন উপাদান দীর্ঘকালেও অবিভাজ্য, বাস্তবজগতে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাই দীর্ঘকালীন ব্যয়-রেখা এইরূপ আকারের হয় না।

সকল উপাদান বিভাজ্য হইতে পারে না, ব্যয়সঙ্কোচও পাওয়া যায়

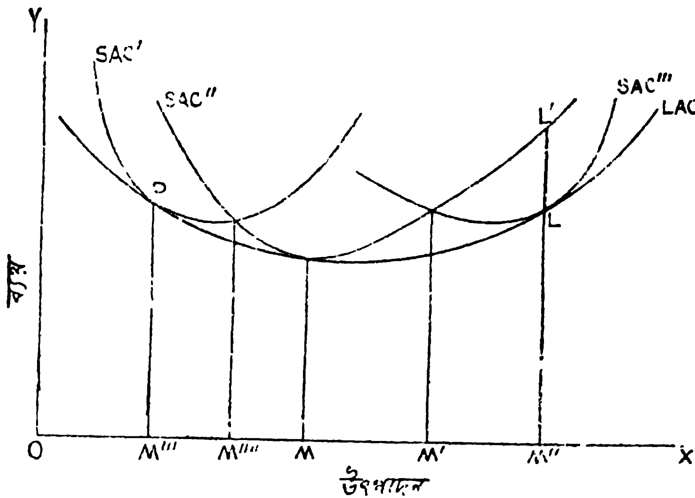
বিশেষভাবে পরিচালনব্যবস্থার কথা ধরা যাক, ইহা সম্পূর্ণ বিভাজ্য উপাদান হইতে পারে না। একজন পরিচালক যে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপাদান খুব ভালভাবে চালাইতেছে—উহার দ্বিগুণ পরিমাণ উৎপাদনও সে সমান দক্ষতার সহিত করিতে পারিবে, ইহা মনে হয় না। দীর্ঘকালে কোনো এক বিশেষ

* মার্শাল বলিয়াছেন, যে সকল ফার্মে কৃষিজাত ও শিল্পজাত উভয় প্রকার দ্রব্যই একত্রে উৎপন্ন হয়, সকল ক্ষেত্রে এই অবস্থা কার্যকরী হইতে পারে। ইহার কারণ, উৎপাদন মাত্রা বাড়াইলে ফার্মের শিল্প-অংশে ব্যয়সঙ্কোচ হয় এবং কৃষি-অংশে ব্যয় বাহুল্য ঘটে—উহার পরস্পর খণ্ডিত হইয়া ফার্মটির গড় ব্যয় দীর্ঘকালেও সমান থাকে।

মাত্রার পরে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে পরিচালন-ব্যবস্থা ক্রমশ অযোগ্য হইয়া উঠে, ইহা মনে রাখা দরকার। তাই দীর্ঘকালে এমন একটি বিশেষ মাত্রা আছে, যে-মাত্রায় দীর্ঘকালীন সর্বনিম্ন গড় ব্যয় বিন্দু খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যেহেতু দীর্ঘকালেও পরিচালন-ব্যবস্থা একটি স্থির ও অবিভাজ্য উপাদান সেইজন্য দীর্ঘকালেও এরূপ পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম কার্যকরী হয়।

বিশেষভাবে উদ্যোক্তা হইল অবিভাজ্য উপাদান

অন্যান্য সকল উপাদানই বিভাজ্য ও পরিবর্তনীয়, যে-কোনো অনুপাতে এইসকল উপাদান সম্মিলিত করার যোগ্য, কিন্তু যে এই পরিবর্তন ও সম্মিলন ঘটাইবে সেই উদ্যোক্তাও উৎপাদনের একটি উপাদান, ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। অন্যান্য উপাদান যে অনুপাতে বাড়ে এই উপাদানটিকে সেই অনুপাতে বাড়ানো যায় না। ফলে একটি নির্দিষ্ট উপাদানের, অর্থাৎ পরিচালন-ব্যবস্থার সহিত অন্যান্য পরিবর্তনীয় উপাদানের সম্মিলনে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা চলিতে থাকে। এই অবস্থায় প্রথমে কিছুদূর পর্যন্ত পরিবর্তনীয় উপাদানগুলি হইতে অধিক হারে প্রতিদান আসে। কিন্তু উহার পরে ইহাদের প্রতিদানের হার হ্রাস পাইতে থাকে।



যেহেতু স্থির উপাদানের সহিত পরিবর্তনীয় উপাদানের মিশ্রণ ঘটে সেইজন্য বিভিন্ন উৎপাদন মাত্রায় ফার্মটি বিভিন্ন নিম্নতম ব্যয়ের বিন্দু পাইতে পারে। উপরের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

এই চিত্রে স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখা SAC″-র নিম্নতম বিন্দু অন্যান্য রেখা অর্থাৎ SAC′ এবং SAC‴র নিম্নতম বিন্দুগুলি হইতে নীচুতে অবস্থিত। এই মাত্রার সর্বোন্নত উৎপাদন নিম্নতম ব্যয়ে পাওয়া যায়। সকল স্বল্পকালীন রেখার স্পর্শক রূপে এই দীর্ঘকালীন ব্যয়রেখা পাওয়া যায়। ইহার আকৃতি তাই U-র মতই বটে, কিন্তু ইহা স্বল্পকালীন রেখার তুলনায় অধিকতর বিস্তৃত বা চেটাল (flatter)। যেহেতু ইহা স্বল্পকালীন রেখাগুলিকে গ্রাস করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বা ঘিরিয়া রাখিয়াছে সেইজন্য ইহাকে বলে এন্‌ভেলাপ বা খাম (envelope)।

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা কেন স্বল্পকালীন ব্যয়রেখা হইতে অধিকতর বিস্তৃত বা চেটাল (flatter) তাহা আলোচনা করা দরকার। স্বল্পকালীন ব্যয়রেখার ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় দ্রুত হ্রাস পায় এবং পরিবর্তনীয় ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দীর্ঘকালীন ব্যয়রেখার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রায় সকল ব্যয়ই স্থির ব্যয় সুতরাং দীর্ঘকালে গড় স্থির ব্যয় খুব দ্রুত নামে না, উপাদানের পরিমাণ বাড়িলে উহা ধীরে ধীরে নামে। তাহা ছাড়া, দীর্ঘকালে প্রায় সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় ব্যয়, তাই পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিক হারে না বাড়াইয়া উৎপাদনের হার বাড়ানো চলে। এই কারণে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখার তুলনায় ধীরহারে নামে এবং বাড়ে, অর্থাৎ ইহা অধিকতর বিস্তৃত বা চেটাল (flatter)।

কেন দীর্ঘকালীন রেখা চেটাল

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার সম্পর্ক (Relation between short run and long run average cost curve)

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার মধ্যে সম্পর্কের কয়েকটি দিক জানা দরকার। ইহা অতি স্পষ্ট যে কোনো নির্দিষ্ট উৎপাদন-পরিমাণের দীর্ঘকালীন গড়ব্যয় উহার স্বল্পকালীন গড়ব্যয় হইতে বেশি হইতে পারে না। তাহার কারণ সহজ। যে-সকল পরিবর্তন দ্বারা স্বল্পকালে ব্যয় হ্রাস পায়, উহারা দীর্ঘকালেও সম্ভব। কিন্তু স্বল্পকালে কতকগুলি বিষয় পরিবর্তন করা চলে না, দীর্ঘকালে সেই সকলও বদল করা যায়। অনেক সময়ে তাই যথাসম্ভব কম ব্যয়ে স্বল্পকালে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই দীর্ঘকালীন রেখা কোনো স্বল্পকালীন রেখার মধ্য দিয়া কাটিয়া বাহির হইয়া যায় না, উহাকে স্পর্শ করিয়া যাইতে পারে মাত্র।

227 পৃষ্ঠার চিত্রটি হইতে আর একটি বিষয় বোঝা দরকার। ধরা যাউক, ফার্মটি OM পরিমাণ উৎপাদন করিতেছে। এই অবস্থায় সে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার নিম্নতম বিন্দুতে উৎপাদন করিতেছে, ঐ বিন্দুই ঐ মাত্রার স্বল্পকালীন রেখার অর্থাৎ SAC''-র নিম্নতম বিন্দু। নিম্নতম ব্যয়ে OM উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে সে এমন মাত্রা গ্রহণ করিয়াছে যাহাকে আমরা SAC'' রেখা দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। ফার্ম যদি OM'' পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে চায় তবে স্বল্পকালে তাহাকে SAC' রেখা ধরিয়া আগাইতে হইবে, এবং OM'' পরিমাণের গড় ব্যয় হইবে M''L' টাকা। দীর্ঘকালে এই ফার্মটি এই পরিমাণ দ্রব্য, অর্থাৎ OM'' উৎপাদন করিতে পারে M''L টাকা গডব্যয়ে। এই কারণেই সে দীর্ঘকালে উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তন করিয়া থাকে, নূতন মাত্রায় উত্তরণ করে, সেখানকার ব্যয়রেখা হইল SAC'''। এই অবস্থায় পূর্বের স্বল্পকালীন ব্যয়রেখা SAC''-র আর কোনরূপ গুরুত্ব নাই। ফার্মটি উৎপাদনে পরিবর্তন করিতে চাহিলে এখন তাহাকে SAC''' ব্যয়রেখার উপরে বিচরণ করিতে হইবে। নির্দিষ্ট কোনো এক সময়ে একটি ফার্ম কেবল একটিমাত্র স্বল্পকালীন ব্যয়রেখা অনুসরণ করিয়া উৎপাদন করিতে পারে, কারণ কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও সংগঠন একটি নির্দিষ্ট আয়তনের। দীর্ঘকালে অবশ্য ফার্মটি সর্বাধিক সুবিধাজনক স্বল্পকালীন ব্যয়রেখার সর্বাধিক সুবিধাজনক বিন্দুতে উৎপাদন করে এবং উহা নিশ্চয় দীর্ঘকালীন ব্যয়রেখার উপরেও অবস্থিত।

আরও দুইটি বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথমত, কেবলমাত্র একটি ছাডা অপর কোনো স্বল্পকালীন রেখার নিম্নতম বিন্দুতে দীর্ঘকালীন রেখা স্পর্শক হয় না। সেই রেখাটি হইল এমন স্বল্পকালীন রেখা যাহা দীর্ঘকালীন রেখাটির নিম্নতম বিন্দুতে স্পর্শক। 227 পৃষ্ঠার চিত্রেই ইহা দেখা যাইতেছে। OM পরিমাণ উৎপাদন-কালে স্বল্পকালীন রেখা SAC'' দীর্ঘকালীন রেখার নিম্নতম বিন্দুতে স্পর্শক। M বিন্দুর বাম দিকে অর্থাৎ OM পরিমাণের কম উৎপাদনকালে নিম্নতম দীর্ঘকালীন ব্যয় পাওয়া যায় যে-অংশে স্বল্পকালীন ব্যয়রেখা নীচে নামিতেছে। যেমন, দীর্ঘকালে সবচেয়ে ভালভাবে OM''' পরিমাণ উৎপাদন করা যায় স্বল্পকালীন SAC' রেখার P বিন্দুতে। কিন্তু এই আয়তনের কারখানাতে সর্বোন্নত উৎপাদন পরিমাণ অর্থাৎ OM'''' হইতে ইহা কম। দীর্ঘকালে সবচেয়ে কম ব্যয়ে OM উৎপাদনের কম যে-কোন পরিমাণ উৎপাদন করা যায় যদি স্বল্পকালীন ব্যয়রেখার নিম্নতম বিন্দুর পূর্বে উৎপাদন হয়, অর্থাৎ সেই কারখানা সর্বোন্নত স্তরে পৌছিবার পূর্ব পর্যন্ত উৎপাদন করিতে থাকে।

অনুরূপভাবে, OM পরিমাণের বেশি উৎপাদন করিতে গেলে উহা নিম্নতর ব্যয়ে করা সম্ভব যদি ছোট মাত্রার কারখানাকে উহার সর্বোন্নত স্তরের অধিক খাটানো হয়।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার সঙ্গে দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখার আকৃতিও আমরা জানিতে পারি। প্রতিটি স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখা (SMC) যেমন স্বল্পকালীন গড ব্যয়রেখার নিম্নতম বিন্দু পার হইয়া উপরে উঠে, দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখাও (LMC) সেইরূপ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার নিম্নতম বিন্দু পার হইয়া উহার উর্ধ্বে উঠে।

প্রতিদানের নিয়মসমূহ (Laws of Returns)

যখন একই মাত্রায় উৎপাদন করিতে থাকিয়া এক বা একাধিক উপাদান স্থির রাখিয়া অন্যান্য উপাদানের প্রয়োগ বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা হয় তখন পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম কার্যকরী হয়। প্রথমে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশি, ক্রমশ এই বৃদ্ধির হার কম।

আধুনিক লেখকেরা বলেন যে, ইহারা একই নিয়মের দুইটি অংশ

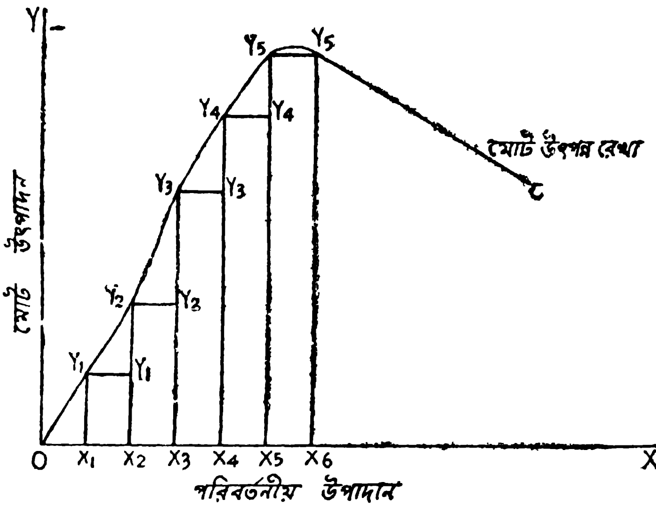
যখন উপাদান-নিয়োগের বৃদ্ধির হারের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশি তখন সেই অবস্থাকে অনেকে বলেন ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম। আর যখন উপাদান-নিয়োগের বৃদ্ধির হারের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম তখন সেই অবস্থাকে অনেকে বলেন ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম। প্রথম দিকে একটি উপাদানের অধিক ইউনিট ক্রমাগত নিয়োগ করিতে থাকিলে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কার্যকরী হয়। সেইরূপে ফার্মটি সেই উৎপাদন মাত্রার সর্বোত্তম বিন্দুতে (optimum point) পৌঁছায়। তাহার পরেও পরিবর্তনীয় উপাদানটি বাড়াইতে থাকিলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান কার্যকরী হইতে থাকে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান হইল একটি ব্যাপক ও সাধারণ নিয়মের দুইটি অংশ। ক্লাসিকাল ও নয়াক্লাসিকাল লেখকদের মতে শিল্পজাতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে উৎপাদন-ধারায় মানুষের ভূমিকা প্রধান, সেখানে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হয়। আবার, কৃষিজাতীয় উৎপাদন-ধারায় অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতির ভূমিকা প্রধান, সেখানে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম দেখা যায়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ কৃষি ও শিল্প—এই দুই ধরনের উৎপাদন ক্ষেত্রে দুইটি নিয়ম আছে (Neo-classical dichotomy) তাহা মানেন না। তাঁহাদের মতে ইহারা একটি নিয়মের দুইটি অংশ মাত্র (মোট

উৎপাদন রেখার সর্বোন্নত বিন্দুর বামে ও ডাহিনের দুইটি অংশ)। আমরা পৃথকভাবে একে একে দুই অংশকে, অর্থাৎ দুইটি নিয়মকে আলোচনা করিব।

(ক) ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Increasing Returns):

এই নিয়মে বলা হয় যে, টেক্‌নোলজির অবস্থা বা অন্যান্য সকল কিছু সমান থাকিলে একটি স্থির উপাদানের (fixed factor) সহিত পরিবর্তনীয় উপাদানটি বা উপাদানগুলি ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে কিছুদূর পর্যন্ত গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। যে-হারে পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রয়োগ বাড়ানো হয়, মোট উৎপাদন উহা অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রব্যটির প্রান্তিক গড় ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে। একটি বা কয়েকটি উপাদান স্থির রাখিয়া পরিবর্তনীয় উপাদানে (বা উপাদানগুলিতে) বৃদ্ধির হার এবং ফলে

পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা যখন বাড়ে



মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার—ইহাদের মধ্যে অনুপাত 1 হইতে বেশি হইলে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকর হইতেছে এইরূপ বলা হয়।

এই নিয়মটিকে আমরা উপরের রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। Y অক্ষে মোট উৎপাদন ও X অক্ষে পরিবর্তনীয় উপাদানের ইউনিটগুলি পরিমাপ করা হইতেছে। OC হইল মোট উৎপাদন রেখা (total product curve)। পরিবর্তনীয় উপাদানটি বাড়াইলে উৎপাদন কিরূপে পরিবর্তিত

হইতেছে তাহা আমরা OC হইতে দেখিতে পাইতেছি। OX_1 পরিমাণ নিয়োগ করিলে মোট উৎপন্ন হইল X_1Y_1। অন্যান্য সকল কিছু সমান থাকা অবস্থায় X উপাদানটির এক ইউনিট বাড়ানো হইল। মোট উৎপন্ন বাড়িয়া হইল X_2Y_2, অর্থাৎ Y_1Y_2 পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। ইহাকেই বলে X উপাদানের X_1X_2 ইউনিটের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা। আর এক ইউনিট নিয়োগ করিলে মোট উৎপন্ন হইল X_3Y_3, অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল Y_2Y_3। চিত্রে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে Y_1Y_2 হইতে Y_2Y_3 অনেক বড।

সর্বোন্নত উৎপাদন-বিন্দুতে পৌছাইবার আগের অবস্থা

X_3 বিন্দুর পরে আরও নিয়োগ করিলে X উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়া আসে, মোট উৎপাদন বাড়ে বটে, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে (Y_3Y_4)। OX_3 বিন্দুতে উপাদানের সর্বোত্তম সম্মিলন (optimum combination of factors) ঘটে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে প্রান্তিক উৎপাদনের দিক হইতে বিচার করিলে OX_3 পরিমাণ নিয়োগ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কার্যকর হইতেছে।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, অন্যান্য সকল কিছু স্থির রাখিয়া একটি উপাদানের ইউনিটসমূহ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে প্রান্তিক উৎপন্নের ন্যায় গড উৎপন্নও (average product) বাড়িতে থাকে। কিন্তু ইহারা একই বিন্দু হইতে বৃদ্ধি পায় না। যে বিন্দু পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধি পায়, আর যে বিন্দু পর্যন্ত গড উৎপন্ন বৃদ্ধি পায়—উহারা সমান নয়। পর পৃষ্ঠার চিত্র হইতে ইহা কিছু পরিমাণে বোঝা যাইবে।

X_3 হইতে X_2 পর্যন্ত পরিবর্তনীয় উপাদানটির পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলে প্রান্তিক উপাদান বৃদ্ধি পায়; পরিবর্তনীয় উপাদানটি X_3 পরিমাণ নিয়োগ করিলে M_3 হইল সর্বাধিক প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা। গড

প্রান্তিক ও গড উৎপন্নের সর্বোন্নত বিন্দু এক নয়

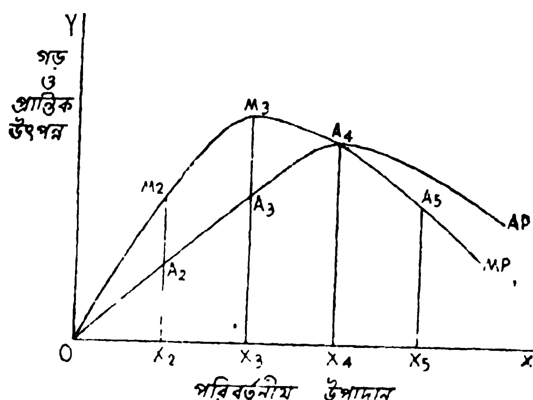
উৎপাদনও X_2A_2 হইতে X_3A_3-তে বৃদ্ধি পাইতেছে। আর এক ইউনিট X উপাদান নিয়োগ করিলে গড উৎপাদন বাড়িয়া X_4A_4 হইতেছে। X_4-এর পরে পরিবর্তনীয় উপাদান আরও নিয়োগ করিলে গড উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকিবে। সুতরাং X_3M_3 হইলে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বোন্নত বিন্দু (optimum point)।

ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কেন দেখা দেয় তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। মোটামুটি তিনটি কারণের ফলে এই নিয়মটি ঘটে: ইহারা হইল, (ক) সাংগঠনিক

সুবিধা, (খ) উপাদানের ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহার (fuller utilisation of the previously engaged factors or their reserve power) এবং (গ) উপাদানের অবিভাজ্যতা (Indivisibility of the factors)। পরিবর্তনীয় উপাদানটির নিয়োগ বাড়াইলে অনেক ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সংকোচের সুবিধা কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়, ক্রমবর্ধমান প্রতিদান ঘটিতে থাকে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় দেখা যায় কোন বিশেষ উপাদান যত পরিমাণ নিযুক্ত হইতেছে তাহাতে উহার প্রতিটি ইউনিটের উৎপাদন শক্তি পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে না। উপাদানগুলির ক্ষমতার ভাণ্ডার যতদিন পর্যন্ত শূন্য না হয় ততদিন এইরূপ ক্রমবর্ধমান প্রতিদান দেখা দিতে পারে। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন-সূত্র বা উপাদান-সম্মিলনের মধ্যে অবিভাজ্য উপাদান নিয়োগ করিতে হয়। অবিভাজ্য, বৃহদাকার, অনেক শক্তিসম্পন্ন কোন উপাদান নিয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে একবার উহাকে নিয়োগ করিয়া অনেক দূর পর্যন্ত উহার

মোটামুটি তিনটি কারণ

ইহা দীর্ঘকালে কার্যকরী নয়



সাহায্যে উৎপাদন বাড়ানো যায়। অবিভাজ্য উপাদানের দাম ও চালাইবার খরচা ক্রমশ অধিক পরিমাণে দ্রব্যের উপর বিভক্ত হওয়ায় ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া আসে।

মনে রাখা দরকার, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম প্রধানত স্বল্পকালীন ঘটনা, কারণ দীর্ঘকালে কোন উপাদানকে স্থির বা অবিভাজ্য ধরিয়া লওয়া যায় না,

উপাদানের যোগানও অস্থিতিস্থাপক নয়। যদি দীর্ঘকালে সকল উপাদানের সকল ইউনিট সমান গুণসম্পন্ন থাকে উপাদানের বাজারে উহার দাম না বাড়ে তবে মাত্রা-বৃদ্ধির দরুন আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচের ফলে মাত্রাবৃদ্ধিজনিত ক্রমবর্ধমান প্রতিদান (Increasing returns to scale) দেখা দিতে পারে।

(খ) ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns)

যখন এক বা একাধিক উপাদান স্থির রাখিয়া অন্যান্য উপাদানের প্রয়োগ বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা হয় তখন কোন এক স্তরের পরে পরিবর্তনীয় উপাদানের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কমে। পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রয়োগ যে-হারে বাড়ানো হয়, মোট উৎপাদন উহা অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রব্যটির প্রান্তিক ও গড় ব্যয় বাড়িতে থাকে। যন্ত্রকৌশলগত এবং অন্যান্য বিষয় সমান অবস্থায় একটি বা কয়েকটি উপাদান স্থির রাখিয়া পরিবর্তনীয় উপাদানটিতে (বা উপাদানগুলিতে) বৃদ্ধির হার এবং ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার—ইহাদের মধ্যে অনুপাত 1 হইতে কম হইলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে এইরূপ বলা হয়।

পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা যখন কমে

এই নিয়মটি আমরা 232 পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটি হইতে প্রকাশ করিতে পারি। Y অক্ষে মোট উৎপাদন এবং X অক্ষে পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিমাণ পরিমাপ করা হইতেছে। OC হইল মোট উৎপন্ন-রেখা। OX_1 হইতে OX_2 পর্যন্ত উপাদানটি বাড়াইলে মোট উৎপাদন X_1Y_1 হইতে X_2Y_2 পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় প্রান্তিক উৎপন্ন হইল Y_2Y_1। পরিবর্তনীয় উপাদান আর এক ইউনিট বাড়াইলে মোট উৎপন্ন বাড়িয়া হইল X_3Y_3 এবং প্রান্তিক উৎপন্ন হইল Y_3Y_2. Y_2Y_1 হইতে Y_3Y_2 বেশি, সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে, প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িতেছে। OX_3 বিন্দুর পরে পরিবর্তনীয় উপাদান আর একটু বাড়াইলে মোট উৎপন্ন হইল X_4Y_4 এবং এখন প্রান্তিক উৎপাদন হইল Y_4Y_3. Y_3Y_2 হইতে প্রান্তিক উৎপাদন Y_4Y_3 কম; সুতরাং বোঝা যাইতেছে OX_3 ইউনিটের পরে পরিবর্তনীয় উপাদানের নিয়োগ বাড়াইলে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। আরও নিয়োগ করিলে পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ কমিবে, Y_4Y_3 হইতে Y_5Y_4 কম। সর্বোত্তম

সর্বোন্নত উৎপাদন বিন্দুতে পৌঁছাইবার পরের অবস্থা

সম্মিলনের বিন্দু OX_3 হইতে উপাদানের প্রান্তিক প্রতিদান হ্রাস পাইতেছে, বা ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে, এইরূপ বলা যায়।

পান্তিক ও গড় কিন্তু এক বিন্দু হইতে কমে না

সর্বোন্নত বিন্দু পার হওয়ার পরে কেবল প্রান্তিক উৎপাদনই নয়, গড় উৎপাদনও কমিয়া আসিতে থাকে। অবশ্য যে-বিন্দু হইতে প্রান্তিক উৎপাদনের হ্রাস শুরু হয়, তাহার পর হইতে গড় উৎপাদন কমে। ইহাও আমরা ঐ চিত্রটি হইতে দেখিতে পাই। M_2 বিন্দু হইতে প্রান্তিক উৎপাদনের হ্রাস শুরু হয়, কিন্তু X_4 বিন্দুর পর হইতে গড় উৎপাদন কমে।

কেন দেখা দেয়

অনেক কারণে এইরূপ ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান দেখা দেয়। উৎপাদনধারায় স্থির উপাদানের প্রদান-ক্ষমতা ক্রমশ করিতে থাকে। পরিবর্তনীয় উপাদানের যত বেশি ইউনিট নিয়োগ করা হইতেছে, ততই উৎপাদন সূত্রে উপাদান মিশ্রণের অনুপাত ভুল হইতেছে। একটি উপাদানের বদলে আর একটি উপাদানের ব্যবহার বা উপাদান-পরিবর্ততা দীর্ঘকাল চলিতে পারে না, কারণ কোন একটি উপাদান অপর কোন উপাদানের নিখুঁত পরিবর্ত-দ্রব্য নয়। মিসেস রবিন্‌সনের ভাষায় বলিতে গেলে উপাদান-গুলির মধ্যে পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতা 1 হইতে কম (Elasticity of substitution between factors is less than one)।*

এই তত্ত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব বেশি

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফিজিয়োক্রাটিক লেখক টুর্গো (Turgot) প্রথমে এই নিয়মের কথা বলেন। রিকার্ডো এই নিয়মের ভিত্তিতে তাহার খাজনা-তত্ত্ব আলোচনা করেন। ম্যালথাস্-এর তত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল এই নিয়ম। সমগ্র ক্লাসিকাল লেখকদের মধ্যে একমাত্র কার্ল মার্ক্‌স্‌ই এই নিয়মকে তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকালে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে ক্লাসিকাল ধারণা এই তত্ত্বের সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। নয়া ক্লাসিকাল লেখকগণ পর্যন্ত মনে করিতেন যে, কৃষিতে এই নিয়মের প্রভাব দেখা যায়, শিল্পে নহে। প্রথমে

* উপাদান-এর সংজ্ঞা হইতেই তাই ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম দেখা দেয়। যদি একটির পরিবর্তে অপর একটির ব্যবহার করা যাইত তবে উহাদের মধ্যে পার্থক্য না করিয়া উহাদের একটি উপাদানই বলা চলিত। উৎপাদন-ধারায় কাজের ধরন পৃথক বলিয়া ইহাদের পৃথক এক একটি উপাদান বলা হইয়াছে। তাই একে অন্যের কাজ করিতে পারে না। এই কারণেই চলে যে, উপাদানের সংজ্ঞার মধ্যেই ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে।

এজওয়ার্থ (Edgeworth) দেখান যে,শিল্প বা কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই ইহা কার্যকরী। তদুপরি, তিনি গড় ও প্রান্তিক প্রতিদানের কথাও বলিয়া গিয়াছিলেন। বর্তমানে ইহাকে অসমানুপাতিক প্রতিদানের নিয়মের একটি অংশ বলিয়া মনে করা হয়।

যন্ত্রকৌশলের উন্নতি ঘটিলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম-এর কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে ; এইরূপ উন্নতি মোট উৎপাদনের রেখাকে উপরে উঠাইয়া দেয় এবং যে সর্বোন্নত বিন্দুর পরে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান দেখা দিবে তাহাকে ডাহিনে সরাইয়া দেয়। দীর্ঘকালে কোন উপাদানকেই স্থির ও অবিভাজ্য ধরা চলে না, সকল উপাদানকেই বাড়ানো যায় এইরূপ মনে করা হয়। কিন্তু যদি উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয় অথবা পূর্বের ন্যায় সমদক্ষতাসম্পন্ন উপাদান পাওয়া না যায়, এবং মাত্রাবৃদ্ধিজনিত আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচ যদি খুব বেশি দেখা না দেয়, তবে দীর্ঘকালে উৎপাদনের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটিলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান দেখা দিবে। সাধারণভাবে দেখা যায়, দীর্ঘকালে উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপনা স্থির উপাদানে পরিণত হয়, তাই উৎপাদন বাড়াইতে থাকিলে দীর্ঘকালে গড় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখা উর্ধ্বমুখী হইয়া উঠে।

দীর্ঘকালে মাত্রা বৃদ্ধি-জনিত ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান

10

মূল্য-নিরূপণ

Price-Determination

মূল্য ও দাম (Value and Price) : ধনবিজ্ঞানে মূল্য বলিলে সাধারণত বিভিন্ন দ্রব্যের পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের অনুপাতকে বোঝায়। যদি 1টি ঘোড়ার বিনিময়ের 4টি গরু বা 8টি ঘোড়া পাওয়া যায় তাহা হইলে ঘোড়াটির বিনিময় মূল্য হইবে হয় 4টি গরু অথবা 8টি ভেড়া। অথবা বলা চলে যে, একটি গরুর বিনিময়-মূল্য $\frac{1}{4}$টি ঘোড়ার সমান বা 2টি ভেড়ার সমান ; 1টি ভেড়ার বিনিময় মূল্য $\frac{1}{2}$টি গরু বা $\frac{1}{8}$টি ঘোড়ার সমান। বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের এই সকল অনুপাতকে বিনিময়মূল্য (Exchange value) বা মূল্য (Value) বলা হয়।

মূল্য হইল পারস্পরিক দ্রব্য বিনিময়ের অনুপাত

যখন অর্থ নামক একটি দ্রব্যের সহিত সকল দ্রব্যের বিনিময় হয় তখন প্রত্যেকটি দ্রব্যের বিনিময়ে যে-পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে দ্রব্যটির দাম (Price) বলে। অর্থের হিসাবে রূপায়িত দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য হইল দাম। অর্থভিত্তিক সমাজে (Money-economy) প্রধানত অর্থের হিসাবে সকল বিনিময় চলে। বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে অর্থ এই সমাজে মানদণ্ড (Standard of value) হিসাবে কাজ করে। সুতরাং এইরূপ সমাজে বিনিময়-মূল্য নির্ধারণ হইল প্রকৃতপক্ষে অর্থের হিসাবে বিভিন্ন দ্রব্যের তুলনামূলক দাম নির্ধারণ।

দাম হইল অর্থের মাধ্যমে বিনিময় মূল্যের প্রকাশ

অর্থের দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য পরিমাপ করার প্রধান অসুবিধা হইল যে, ইহার নিজের মূল্যেরই পরিবর্তন হইতে পারে ; যদি ঘোড়ার, গরুর এবং ভেড়ার দাম একই সঙ্গে দ্বিগুণ হইয়া যায়, তাহা হইলে অর্থের হিসাবে উহাদের দাম বাড়িয়াছে বলা হয়, কিন্তু পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত ঠিকই থাকে অর্থাৎ দামের স্তরে পরিবর্তন হইল, মূল্যের স্তর ঠিকই রহিল ; কেবল অর্থের বিনিময়-মূল্য

মূল্যতত্ত্ব ও দামতত্ত্ব পৃথক

কমিয়া গেল (কারণ অর্থের বিনিময়ে এখন কম দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে)। এই কারণে ক্লাসিকাল ও নয়া ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ দুইটিকে পৃথকভাবে আলোচনা করিতেন : মূল্যতত্ত্ব (Theory of value) এবং অর্থ ও দামতত্ত্ব (Theory of money and Prices)।

ইহাদের পৃথক করা চলে না, কারণ অর্থের মূল্য পরিবর্তন পারস্পরিক দ্রব্য বিনিময়ের আনুপাতিক হিসাব, অর্থাৎ দামকে বদলাইয়া দেয়

কিন্তু আজকাল ধনবিজ্ঞানিগণ এই দুই তত্ত্বকে পৃথক করেন না। অষ্ট্রিয়ান ও সুইডিশ মতবাদের প্রভাবে তাঁহারা বলেন, যে-সমাজে অর্থের মাধ্যমেই দ্রব্য বিনিময় হয়, সেখানে মূল্যকে সর্বদাই অর্থের হিসাবে প্রকাশিত বিভিন্ন দ্রব্যের দামের অনুপাত হিসাবে ধরিতে হইবে। কেইন্‌সও বলিয়াছেন যে, এইরূপ ক্লাসিকাল ধারণা (মূল্যতত্ত্ব এবং অর্থ ও দামতত্ত্ব) সম্পূর্ণ কৃত্রিম , অর্থ কি ভাবে মূল্যকে প্রভাবিত করে, দ্রব্যসমূহের পারস্পরিক বিনিময়-মূল্যের পরিবর্তন সাধন করে, তাহা জানিতে হইলে আজকাল অর্থকে বাদ দিয়া মূল্যতত্ত্ব আলোচনায় লাভ নাই ; অর্থের ভিত্তিতে দামতত্ত্ব আলোচনাই-বিধেয়।

রেভিনিউ (Revenue)

দাম নিরূপণের আলোচনা সুরু হইবার পূর্বে আমাদের আর কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি দামতত্ত্ব বিশ্লেষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার (tools)। কোনো ফার্মের সম্মুখে, দ্রব্যের দাম নির্ধারণের সময়ে, তাহার দ্রব্যের চাহিদা নিজেকে প্রকাশ করে রেভিনিউর আকারে।

রেভিনিউ সম্পর্কে আলোচনার তাৎপর্য

রেভিনিউ হইল নির্দিষ্ট দামে ফার্মটির দ্রব্যের জন্য যে পরিমাণ চাহিদা হইতেছে উহা যোগান দিয়া মোট কত টাকা সে পাইতে পারে। দ্রব্যের উৎপাদন করিতে গিয়া ফার্মটি কিছু টাকা খরচা করিয়াছে , দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অন্তত সেই পরিমাণ টাকা তাহাকে তুলিতে হইবে। যত বেশি টাকা সে তুলিতে পারে, তাহার মুনাফা তত বেশি। ধনবিজ্ঞানীরা ধরিয়া লন যে প্রতিটি ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করিতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ ব্যয় ও রেভিনিউর পার্থক্য সে সর্বাধিক রাখে। অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করেন যে মোট রেভিনিউ সর্বাধিক করাই ফার্মের লক্ষ্য, মোট মুনাফা নয়। আমরা তাই রেভিনিউ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করিব।

গড়, প্রান্তিক ও মোট রেভিনিউ (Average, Marginal and Total Revenue)

ফার্মের দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদার অর্থই হইল রেভিনিউ। ফার্মের নিকট বিক্রয় তালিকা হইল রেভিনিউ তালিকা। এই বিক্রয় তালিকাই প্রকাশ করে তাহার গড় দাম বা গড় রেভিনিউ। আমরা যখন বলি টুপির দাম 5 টাকা থাকিলে কোনো ফার্ম সপ্তাহে 1000 টুপি বিক্রয় করিতে পারে, অথবা 6 টাকা দাম থাকিলে সে 900টি টুপি বিক্রয় করে, তখন প্রতি ক্ষেত্রেই দাম হইল গড় দাম বা ইউনিট-প্রতি দাম। প্রতিটি টুপি বিক্রয় করিয়া সে যে-পরিমাণ পাইবে উহা গড় রেভিনিউ। অর্থাৎ গড় রেভিনিউ এবং দাম সমানই। যেমন প্রতিটি 5 টাকা দামে সে 1000 টুপি বিক্রয় করিল। তাহার মোট রেভিনিউ 5000 টাকা। আর গড় রেভিনিউ 5000 ÷ 1000 = 5 টাকা, অর্থাৎ দাম।

গড় রেভিনিউ বা AR

কিন্তু সকল ফার্মই চেষ্টা করে আর একটু বেশি বিক্রয় করা যায় কি না, আর একটু বেশি মুনাফা বা রেভিনিউ বাড়ান যায় কি না। নিজের অবস্থায় কেহই সন্তুষ্ট থাকে না। ফার্মগুলিও দাম বাড়াইয়া বা কমাইয়া সমান দামে বিক্রয় বাড়াইয়া লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করে, ইহাতে তাহার লাভ বাড়ে বা কমে বা সমান থাকে। সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, বাজারে টোপ ফেলিয়া দেখে অবস্থা তাহার অনুকূলে বা প্রতিকূলে।

এই বিষয়ে সে প্রধান যাহা লক্ষ্য করে উহা হইল প্রান্তিক রেভিনিউ। অল্প একটু বেশি, বা এক ইউনিট বেশি বিক্রয় করিয়া ফার্মের মোট রেভিনিউ পূর্বাপেক্ষা যতটুকু বাড়ান যায় উহাই তাহার প্রান্তিক রেভিনিউ। এই বাড়তি ইউনিটটি উৎপাদন করিতে তাহার যে বাড়তি খরচা হয় (প্রান্তিক ব্যয়) উহাপেক্ষা প্রান্তিক রেভিনিউ বেশি হইলে সে উৎপাদন করিতে থাকে। কিন্তু প্রান্তিক রেভিনিউ উহাপেক্ষা কম হইলে এই বাড়তি উৎপাদনটুকু তাহার পোষায় না। প্রান্তিক রেভিনিউ হইল একটি অনুপাত, উৎপাদনে অল্প বৃদ্ধি এবং ইহার ফলে মোট রেভিনিউতে বৃদ্ধি—এই দুই-এর অনুপাত। R যখন রেভিনিউ এবং O যখন উৎপাদন, তখন প্রান্তিক রেভিনিউ হইল $\Delta R/\Delta O$.

প্রান্তিক রেভিনিউ বা MR

বাজার (Market)। কোন ফার্মের পক্ষে উপাদান ক্রয়ের জন্য এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উপাদানের বিক্রেতা ও উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা উভয়

দলের সহিত সংযোগ সাধন করিতে হয়। আবার উপাদানের মালিক এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা, এই উভয় দলকেই ক্রয় ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ফার্মগুলির সহিত দর-কষাকষি ও লেনদেনের ব্যাপারে মিলিত হইতে হয়। কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জটিল সম্পর্কজাল—ইহাকে ধনবিজ্ঞানে সেই দ্রব্যের বাজার বলে। কোন দ্রব্যের বাজার নিয়মিত ও সংগঠিত, কোন দ্রব্যের বাজার (যেমন পুরানো বেহালার) অনিয়মিত ও অসংগঠিত।

ক্রয় ও বিক্রয়ের ঊর্ণনাভ

ব্যক্তি-উদ্যোগী অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রধান (Private enterprise economy) সমাজে এই বাজারকে কেন্দ্র করিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে, ইহাই অর্থনৈতিক কাজকর্মের বা অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি। বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হয়; ব্যক্তির আয় এইরূপ বাজারে তাহার কার্যের জন্য বা তাহার মালিকানায় বিভিন্ন উপাদানের জন্য চাহিদার উপর নির্ভর করে। একটি বিরাট অদৃশ্য শক্তিরূপে এই বাজার সদাসর্বদা মানুষের জীবনকে, তাহার আয়, ব্যয় এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Markets): বাজারকে তিনটি মানদণ্ড অনুযায়ী নানাভাবে বিভক্ত করা যায়—(ক) স্থান, (খ) কাল, এবং (গ) প্রতিযোগিতার রূপ ও গভীরতা। স্থান অনুযায়ী বিস্তৃতির দিক হইতে দ্রব্যের বাজার চারি প্রকার হইতে পারে—স্থানীয়, আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার। বাজারের আয়তন কিরূপ হইবে তাহা প্রধানত সেই দ্রব্যটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সাধারণত সেই সকল দ্রব্যের বাজার খুবই বিস্তৃত হইবে, (ক) যদি তাহার জন্য ব্যাপক চাহিদা থাকে, (খ) যদি দূর হইতে তাহাকে সহজে কেনাবেচা করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ নমুনা প্রেরণের বন্দোবস্ত এবং গুণ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে, (গ) যদি দ্রব্যটি দীর্ঘস্থায়ী ধরণের হয় এবং (ঘ) যদি আয়তনের তুলনায় উহা অধিক মূল্যবান হয় (যেমন, সোনা, রূপা ইত্যাদি)। বাজারের আয়তন যত বড় হইবে দ্রব্যটির দামে হঠাৎ উঠানামার ঝুঁকি তত কম।

কি-কারণে কোন দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয়

সময়ের দিক হইতে, বাজারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—অত্যল্পকালীন, স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন। এই 'সময়' বলিতে ঘড়ির সময় বা ক্যালেণ্ডারের

সময় বুঝিলে চলিবে না; ইহা হইল ফার্মসমূহের কার্যোপযোগী সময় (operational time)। যে-সময়ের মধ্যে উৎপাদন সম্পূর্ণ স্থির, উহাকে বাড়ানো বা কমানো সম্ভবপর নহে, তাহাকে অত্যল্পকালীন বাজার বলে। যখন স্থির ব্যয় সমান রাখিয়া পরিবর্তনীয় ব্যয় কমাইয়া বাড়াইয়া উৎপাদনের ও যোগানের পরিমাণ বাড়ানো ও কমানো সম্ভব তাহাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে। যখন ফার্মগুলির স্থির ও পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়াইয়া বা কমাইয়া উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো ও কমানো সম্ভব তখন তাহাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে।

ফার্মসমূহের কার্যপরিধি পরিবর্তনের উপযোগী সময় অনুযায়ী বাজারের বিভাগ

সময় অনুযায়ী কোন দ্রব্যের বাজার কিরূপ হইবে তাহা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। দাম কি-পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং তাহা কতদিন পরিবর্তিত অবস্থায় থাকা সম্ভব, তাহার উপাদানসমূহ পাওয়া সম্ভব কি না, পরিচালকদের দ্রুত উৎপাদন কমাইবার বাড়াইবার উপযোগী যোগ্যতা আছে কি না, যন্ত্রসম্পর্কীয় ব্যবস্থা কিরূপ, মাত্রাজনিত ব্যয়সঙ্কোচ ও ব্যয়বাহুল্যের তুলনামূলক সম্ভাবনা ইত্যাদি নানা বিষয়ের দ্বারা দ্রব্যের বাজারী-সময় (Market time) নির্ধারিত হয়।

অত্যল্পকালীন বাজারে যে-দাম চালু থাকে তাহাকে বাজার-দর বা বাজার-দাম (Market price) বলা হয়। স্বল্পকালীন বাজারে যে দাম প্রচলিত থাকে তাহাকে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (Short-run Normal price) বলে। দীর্ঘকালীন বাজারে যে-দর স্থির হয় তাহাকে স্বাভাবিক দাম (Normal price) বলা হয়।

প্রতিযোগিতা রূপ ও বাজার: প্রতিযোগিতার তীব্রতা অনুযায়ী বাজারকে প্রধানত তিন ধরনে বিভক্ত করা যায়; পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজার।

বিশুদ্ধ ও পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Pure & Perfect Competition)

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাজারের অবস্থা এরূপ আছে যে, কোন বিক্রেতা-ফার্ম বাজারের চল্‌তি দামে কম বেশি যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে, তাহার একার বিক্রয়ের পরিমাণ কমিলে বা বাড়িলে দ্রব্যটির দাম সমানই থাকে। এইরূপ অবস্থায় ফার্মের বিক্রয়রেখা বা নিজ দ্রব্যের জন্য চাহিদা-রেখা অসীম স্থিতিস্থাপক (infinitely elastic)। তাহার গড় ও প্রান্তিক

রেভিনিউ-রেখা X অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা। তিনটি অবস্থা বজায় থাকিলে সেই দ্রব্যের বাজারে বা সেই শিল্পে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা (Pure Competition) আছে এইরূপ বলা চলে।

প্রথমত, সেই শিল্পে অসংখ্য বিক্রেতা-ফার্ম থাকিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য হইল যে, অধিকসংখ্যক ফার্ম থাকিলে তবেই বিশেষ কোনো একটি ফার্ম কম বা বেশি বিক্রয় করিলে দ্রব্যটি দাম প্রভাবিত হয় না। মোট উৎপাদন ও বিক্রয়ের এত ক্ষুদ্র অংশ প্রতিটি ফার্ম উৎপাদন করিতেছে যে, বাজারের দাম স্থির থাকিবে ধরিয়া লইয়াই ফার্ম বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। ফার্মগুলি দাম স্থির ধরিয়া লইয়া বিক্রয়ের পরিমাণ নিজের সুবিধামত কম-বেশি করে (Price-taker and quantity-adjuster)। শুধু তাহাই নহে। সেই দ্রব্যটির বাজারে ক্রেতার সংখ্যাও অগণ্য ; প্রতিটি ক্রেতা মোট চাহিদার এত ক্ষুদ্র অংশ ক্রয় করে যে তাহাদের একার কাজকর্মের ফলে দাম প্রভাবিত হয় না। কোনো দ্রব্যের বাজারে কি সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকিবে, সেই সংখ্যা যোগ করা বা পরিমাপ করা যায় না। মোট কথায়, ফার্মের এবং ক্রেতার সংখ্যা অন্তত তত বেশি হইতে হইবে যাহাতে এককভাবে কোন ফার্মের কাজের ফলে বাজার চাহিদা ও যোগান-রেখা পরিবর্তিত হয় না, অর্থাৎ দাম প্রভাবিত হয় না।*

ক্রেতা ও বিক্রেতা অসংখ্য

দ্বিতীয়ত, যে-দ্রব্যটি কেনাবেচা হইতেছে উহার সকল ইউনিট সমজাতীয় (homogeneous) হওয়া চাই। ক্রেতাদের মনে এরূপ ধারণা বর্তমান যে, দ্রব্যটির সকল ইউনিট সমান, উহাদের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই। ইহার অর্থ হইল কোনো বিক্রেতা দাম বাড়াইলে কোনো ক্রেতা তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিবে না, কারণ একই দ্রব্য সে অন্য বিক্রেতার নিকট হইতে কম দামে পাইবে। ক্রেতা সকল বিক্রেতা সম্পর্কে সমান পছন্দশীল, বিক্রেতাদের সম্পর্কে সে নিরপেক্ষ— এইরূপ হইলেই দ্রব্যের ইউনিটগুলি সমজাতীয়, এক বিক্রেতার দ্রব্য অন্য বিক্রেতার দ্রব্যের নিখুঁত পরিবর্ত সামগ্রী (perfect substitute)। ভৌগোলিকভাবে বিক্রেতাদের দূরত্ব এমন নয় যে, ক্রেতা কাছের বিক্রেতাকে

ক্রেতার চক্ষে দ্রব্যগুলি সমজাতীয়

* "This number is incapable of being expressed cardinally, we can define it operationally : the number of sellers must be so large that any practicable variation in the planned sales of any seller will not shift the market demand curve by enough to cause a change in the price in the given condition of demand."

অধিক পছন্দ করে। সকল বিক্রেতার ব্যবহারই সমান ভদ্র বা সমান অভদ্র—একজনের তুলনায় অপরজনকে পছন্দ বা অপছন্দ করার কিছু নাই।

তৃতীয়ত, শিল্পে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকার অপর শর্ত হইল যে-কোনো ফার্ম ইচ্ছা করিলে শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে বা শিল্প হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে। ইহার অর্থ হইল কিছু সংখ্যক ফার্ম উঠিয়া গেলে বা শিল্প হইতে বাহির হইয়া গেলেও ফার্মের সংখ্যা মোটামুটি বেশিই থাকিবে। শিল্পের মধ্যে অবাধ অনুপ্রবেশ (free entry) ঘটিতে পারিলে তবেই ইহা সম্ভবপর।

শিল্পের মধ্যে অবাধ অনুপ্রবেশ

এই তিনটি শর্ত বা অবস্থা মানিয়া লইলে বলা চলে, বাজারে বিশুদ্ধ প্রতি-যোগিতা আছে, অর্থাৎ এই বাজারে একচেটিয়ার কোনো ছোঁয়াচ নাই। এই সকল অবস্থার মিলিত ফলেই নির্দিষ্ট দামে ফার্মের গড় রেভিনিউ-রেখা X অক্ষের সমান্তরাল এবং AR = MR = Price, এই অবস্থাগুলি না থাকিলে প্রতিযোগিতা আর বিশুদ্ধ থাকে না, উহা অশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় পরিণত হয় (Impure Competition)।

প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক চেম্বারলেন (Chamberlin) এইভাবে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে আরও দুইটি শর্ত পূরণ হইলে বা আরও দুইটি অবস্থা স্বীকার লইলে আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition) পাইয়া থাকি। প্রথমত, ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই, কোথায় দ্রব্যটি কম দামে ক্রয় বা বিক্রয় করা চলে সেই সম্বন্ধে জানাশোনা থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যটির দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে

প্রথমত, বাজারে একটিমাত্র দাম চলতি আছে, ইহা আমরা ধরিয়া লই। কিন্তু তাহা সম্ভব হইতে হইলে বাজারের চালু দাম এবং সম্ভাব্য দাম সম্পর্কে সকল ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার। আর, আমরা যদি এই জ্ঞান স্বীকার করিয়াই লই, তবে সেই বাজারে ভারসাম্য না থাকিয়া পারে না, উহা আপনাআপনি স্বীকার করিয়া লওয়াই হইল। বিষয়টি আর একটু গভীরভাবে বোঝা যাউক। X দ্রব্যের জন্য প্রতিটি ক্রেতার রুচিবোধ, প্রতিটি বিক্রেতার সম্মুখে উৎপাদন সম্ভাবনার ক্ষেত্র*, প্রতিটি পরিবর্তনীয় উপাদানের

পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে আপনাআপনি আদর্শ ভারসাম্য

* ইহা নির্ভর করে যে-উপাদানগুলি প্রযোগ করা হইতেছে তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতার (physical productivities) উপর।

দাম এবং X ব্যতীত অপর যে-কোনো দ্রব্যের দাম—এই সকল বাস্তব বিষয় লইয়া গঠিত হয় X দ্রব্যের বাজারের পরিবেশ (environment of the market for X)। এই বাজারে যে কোনো ভারসাম্য এই বাস্তব পরিবেশ গুলির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে। যে ভারসাম্য সত্যই উদ্ভূত হইতেছে তাহা নির্ভর করে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের এই সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের উপর। প্রতি ক্রেতাকে জানিতে হইবে (ক) তাঁহার নিজের রুচি, (খ) দ্রব্যের দাম, (গ) বিভিন্ন দ্রব্যের অভাব মিটাইবার আপেক্ষিক ক্ষমতা। প্রতিটি বিক্রেতাকে জানিতে হইবে (ক) বিভিন্ন উপাদান সম্মিলন হইতে সে কত পরিমাণ X পাইতে পারে, (খ) প্রতিটি উপাদানের দাম। এই সকল বিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে তবেই ভারসাম্যের দাম দেখা দেয়—ইহাই আদর্শ ভারসাম্য। এই ভারসাম্য আদর্শ ধরনের (ideal type), কারণ এই অবস্থাতে সকল ক্রেতা স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া নিজের সঙ্গতির মধ্যে থাকিয়া পূর্ণ তৃপ্তি পাইতেছে এবং দ্রব্যটির সকল বিক্রেতা স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বাধিক নীট রেভিনিউ পাইতেছে।*

দ্বিতীয়ত, দ্রব্যটির দীর্ঘকালীন যোগান রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হওয়া দরকার। ইহা সম্ভব হইতে হইলে প্রতিটি উপাদানের যোগান প্রচুর হইবে যাহাতে শিল্পটির প্রসার হইলেও উপাদানগুলির দাম না বাড়ে, ভৌগোলিক বা কাজের দিক হইতে উপাদানের সকল ইউনিট সম্পূর্ণ চলনশীল, প্রতিটি উপাদান পূর্ণরূপে বিভাজ্য, প্রত্যেক উপাদান জানে তাহার সম্মুখে অপর কি কি সুযোগ খোলা আছে, প্রত্যেক উদ্যোক্তা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। এই সকল অবস্থা বজায় থাকিলে X উৎপাদনকারী সকল ফার্মই সমান আয়তনের হইবে, অর্থাৎ প্রতিটি ফার্ম সমান প্রকার ও সমান পরিমাণ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবে; সকল ফার্ম প্রত্যেক উপাদান সমান পরিমাণে ব্যবহার করিবে। সকল ফার্ম সমান পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিবে এবং প্রতিটি ফার্মের মোট রেভিনিউ তাহার মোট ব্যয়ের সমান হইবে।

দামের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক

* "This assumption is certainly necessary if we are concerned with the efficiency with which a market in which conditions (i) to (ii) are fulfilled transforms productive services into products and distributes the produces among households—that is if our interest lies in welfare economics rather than in positive economics—if we are trying to answer the question : how well does the price system work ? And not simply the question : how does it work ?"

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition)

বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বহু সংখ্যক বিক্রেতা থাকে, ফলে কেহই দামের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বাজারের চলিত দামেই তাহারা দ্রব্য বিক্রয় করে। একচেটিয়ার ক্ষেত্রে একচেটিয়া ফার্ম একাই বিক্রেতা ও সমস্ত যোগানের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা, তাহার সিদ্ধান্তেই দাম নির্ধারণ হয়।

প্রকৃত অবস্থা অপূর্ণ প্রতিযোগিতা

বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা বা বিশুদ্ধ একচেটিয়া উভয় অবস্থার মাঝামাঝি বাজারের যে-অবস্থা থাকে তাহাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বলে। আধুনিক কালে বিভিন্ন দ্রব্যের বাজারের যে-রূপ তাহা বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা বা বিশুদ্ধ একচেটিয়া নয়। ইহা হইল অপূর্ণ প্রতিযোগিতা।

এইরূপ অবস্থায় বাজারের বহুসংখ্যক বিক্রেতা না থাকিয়া কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা থাকে (অথবা কয়েকজন ক্রেতা থাকে) অথবা বহু বিক্রেতা থাকিলেও সম্পূর্ণ এক জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে না, আসল বা কাল্পনিক যেরূপই হউক না কেন ক্রেতাদের মনে ধারণা থাকে যে বিভিন্ন ফার্মের দ্রব্যগুলি সমজাতীয় নয়।

কি অবস্থায় অপূর্ণ প্রতিযোগিতা দেখা দেয়

কমসংখ্যক ক্রেতা বা বিক্রেতা থাকায় প্রত্যেকেই বাজারের বৃহৎ অংশ আয়ত্তে রাখে, কেহ ক্রয়-বিক্রয় বাড়াইলে বা কমাইলে দামের উপর তাহার প্রভাব পড়ে। বেশি পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়, অর্থাৎ ফার্মের গড় রেভিনিউ-রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক নয়। এইরূপ অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একই দ্রব্যের বিভিন্ন দাম থাকে। একই দ্রব্য সম্বন্ধে ক্রেতাদের পছন্দ শুধুমাত্র রং ও আকৃতি অনুযায়ী পৃথক হইতে পারে। বিক্রেতা খাতির করে বা হাসিয়া কথা বলে, বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেয় বা সুন্দর বাক্সে ও সুন্দর ফিতায় দ্রব্যটি বাঁধিয়া দেয়, ধার দেয় এবং সহসা ফেরৎ চাহে না, জন্মদিনে উপহার পাঠায়, দোকান হইতে বাহির হইবার সময় নমস্কার করে, চালাক চতুর ভাবে ঘোরাফেরা করে, বাড়ির কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—এইরূপ যে-কোন কারণে, কোনো এক বিশেষ বিক্রেতা কোনো ক্রেতাকে অন্যান্য বিক্রেতার তুলনায় অধিকতর আকৃষ্ট করিতে পারে। ক্রেতা অন্য দ্রব্যের বা অন্য বিক্রেতার খবর রাখে না, অথবা একটু খবর রাখিয়া বা একটু হাঁটিয়া গিয়া সস্তায় ক্রয় করিতে চাহে না একই স্থান হইতে ক্রয় করাকে আভিজাত্য বলিয়া মনে করে, অথবা দোকানের মধ্যে বসিয়া দৈনিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ পায়—এই সকল নানা কারণে একই দ্রব্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় হইতে পারে। ইহাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বলে।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি বিশেষ অবস্থার নাম হইল এক-চেটীয় প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition)। অধ্যাপক চেম্বারলেন বলেন যে, আধুনিক শিল্পোন্নত দেশসমূহে বেশির ভাগ দ্রব্যের বাজারেই এইরূপ একচেটীয় প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা অসংখ্য, তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও তীব্র, কিন্তু সেই ফার্মগুলি ঠিক "সমজাতীয়" দ্রব্য বিক্রয় করে না, অন্তত ক্রেতাদের মনে ধারণা যে, এই দ্রব্যগুলি একে অন্য হইতে পৃথক। প্রত্যেকটি বিক্রেতা ফার্ম নিজ দ্রব্যের পৃথক "নাম" (trade name) ব্যবহার করে বা অন্য ফার্মের দ্রব্য হইতে পৃথক করিবার জন্য ভিন্ন মার্কা ব্যবহার করে। রঙ বা গন্ধ বা মোড়কের আকৃতি পৃথক রাখিয়া ফার্মগুলি নিজের উৎপন্নকে পৃথক দ্রব্য বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করে। ইহাকে বলে দ্রব্য-পৃথকীকরণ (Product-differentiation)। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মারফত নিজের দ্রব্যটিকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিটি ফার্ম এক-প্রকার মোটামুটি স্থায়ী ধরনের ক্রেতার দল গড়িয়া তোলে, যাহারা সেই "দ্রব্যটির" দাম অন্য দ্রব্যের তুলনায় অল্প একটু বাড়িলেও ক্রয় করা ছাড়িয়া দেয় না। এই ফার্মগুলি ছোট ছোট এক-একটি অংশের একচেটিয়া অধিকারে কোনো বিশেষ শিল্পের সমগ্র বাজার ছাইয়া ফেলে, তবুও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।* মার্গো, লাক্স, হামাম, লাইফবয়, পিয়ারস্ প্রভৃতি সাবান, "দ্রব্য" বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কম নয়।

একচেটিয়া ও প্রতি-যোগিতার মিশ্রিত রূপ

দ্রব্য পৃথকীকরণের ফলে একচেটিয়া অধিকারের উদ্ভব হয়, যত বেশি এই পৃথকীকরণ ব্যাপক ও গভীরতর হয় একচেটিয়া অধিকার তত বাড়িতে থাকে। আবার এই একচেটিয়া অধিকার বাড়াইবার জন্যই পৃথকীকরণের পালা চলে। অনেকগুলি ফার্ম থাকিলেও তাহারা ঠিক একজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে না, খুব দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্যও বিক্রয় করে না, তাহাদের বিক্রীত দ্রব্যগুলি পরস্পরের অতি দূরবর্তী পরিবর্ত দ্রব্য নয়। এইরূপ একটি দ্রব্য অপর দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ অথচ অপূর্ণ পরিবর্ত-

দ্রব্য পৃথকীকরণ হইতে দেখা দেয়

* "With differentiation appears monopoly, and as it proceeds further the element of monopoly becomes greater. Where there is any degree of differentiation whatever, each seller has an absolute monopoly of his own product, each is monopolist, and yet has competitors, we may speak of them 'competitive monopolists' and with peculiar appropriateness, of the forces at work as those of monopolistic competition." Chamberlin. P. 9.

সামগ্রী (close and imperfect substitutes)। প্রায়-কাছাকাছি রকমের দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতাও কম হইতে পারে না। তাহারা একই সঙ্গে প্রতিযোগীও বটে আবার একচেটিয়াদারও বটে, আমরা ইহাদের 'প্রতিযোগী একচেটিয়া' বলিতে পারি, আর বাজারের এই অবস্থাকে বলা যায় 'একচেটীয় প্রতিযোগিতা'।*

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার আর একটি বিশেষ রূপ হইল অলিগোপলি (oligopoly)। যখন বাজারে উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজ কয়েকটি ফার্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন প্রত্যেকটি ফার্ম কিছুটা একচেটিয়া অধিকারের ক্ষমতা পায়। এইরূপ অলিগোপলীয় অবস্থায় প্রতিটি ফার্ম কি-দামে দ্রব্য বিক্রয় করিবে তাহা নিজেরা কিছুটা পরিমাণে সিদ্ধান্ত করিতে পারে। আবও কয়েকটি ফার্ম একই দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় করিতেছে বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের দাম-নির্ধারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রতিটি অলিগোপলীয় ফার্মই পরস্পরনির্ভরশীল দাম-নির্মাতা বা দাম-নির্ধারক (interdependent price-marker or price-setter)। প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াই প্রতিটি ফার্মের দাম-নিরূপণের ক্ষমতা প্রয়োগ করা চলে। আবার বিপরীত ভাবে, অসংখ্য বিক্রেতা আর মাত্র কয়েকজন ক্রেতা থাকিলে তাহাকে বলা হয় অলিগোপসনি (oligopsony)। আবার, যখন কয়েকটি হইতে কমিয়া বিক্রেতা ফার্মের সংখ্যা দুইটিতে দাড়ায়, এবং পরস্পর তীব্র প্রতিযোগিতা বা সমঝোতা (collusion) করিয়া দ্রব্যের দাম ও বিক্রয়ের পরিমাণ তাহারা স্থির করে, সেই অবস্থাকে বলে ডুয়োপলি (Duopoly)।

বিশুদ্ধ অলিগোপলি ও ডুয়োপলি

অনেক সময় দেখা যায় বাজারে দ্রব্য-পৃথকীকরণ আছে, কিন্তু অধিক সংখ্যক বিক্রেতা নাই, কয়েকটি ফার্ম মিলিয়া বাজার দখলে রাখিয়াছে। এইরূপ অবস্থার নাম হইল দ্রব্য পৃথকীকৃত অলিগোপলি (oligopoly with product differentiation)। যেমন, কোনো দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া ফার্ম মিলিয়া উহার ঠিক সমজাতীয় দ্রব্য নয় বটে, তবে উহার অনুরূপ ঘনিষ্ঠ পরিবর্তদ্রব্য

* "Where product is differentiated, each seller is truely both a monopolist and a competitor. It may also be used, however, in a more general sense merely to describe the blending of monopolistic and competitive elements, thus embracing both types of hybrid problems." Chamberlin. *The Theory of Monopolistic Competition.* P. 9. Foot note.

উৎপাদন করিতে শুরু করিল। বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দ্বারা ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে সেই বাজারে একচেটিয়া ফার্মের অধিকার খর্ব হইল এবং বাজারের রূপ পরিবর্তিত হইয়া দ্রব্য পৃথকীকৃত অলিগোপলি দেখা দিল। ইহারা কেহ একচেটিয়া ফার্ম নয়, কারণ প্রতিটি ফার্ম নিজে একা দাম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লইতে পারে না, অপর ফার্মের দাম ও উৎপাদন-নীতি (price and output policy) তাহাকেও প্রভাবিত করে।

দ্রব্য পৃথকীকৃত অলিগোপলি

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একক ফার্মের ভারসাম্য (Equilibrium of an Individual Firm under Perfect Competition)

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য (Short run equilibrium of the firm under perfect competition)

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের নিজস্ব কোনো দামনীতি (Price policy) নাই ; কারণ প্রতিটি ফার্ম বাজারের মোট যোগানের অতি নগণ্য অংশ উৎপাদন ও বিক্রয় করে। এককভাবে কোনো ফার্ম উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইলে বা কমাইলে বাজারের দামকে প্রভাবিত করিতে পারে না। বাজারের মোট যোগান ও মোট চাহিদার ঘাত প্রতিঘাতে নির্ধারিত চল্‌তি দামেই সে তাহার উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। দাম স্থির ধরিয়া লইয়া নিজের উৎপাদন বাড়াইয়া বা কমাইয়া সে ভারসাম্যের বিন্দুতে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে থাকে, ইহাই তাহার উৎপাদন-নীতি (Output-policy)। নিজের প্রান্তিক ব্যয়-রেখার গতি অনুযায়ী সে উৎপাদন বাড়ায় বা কমায়। নিজের পক্ষে যতখানি উৎপাদন ও বিক্রয় করা সম্ভবপর সেই সম্ভাব্য পরিধির মধ্যে তাহার দ্রব্যের বিক্রয়-রেখা উৎপাদনের পরিমাণ-রেখার সমান্তরাল, (একই দামে বেশি বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া) দাম, প্রান্তিক রেভিনিউ ও গড় রেভিনিউ সমান।

দামের সম্মুখে চাহিদা-রেখা সমান্তরাল

এইরূপ একটি ফার্ম স্বল্পকালে কি পরিমাণ উৎপাদন করিবে, উৎপাদনের কোন বিন্দুতে সে ভারসাম্যে পৌঁছিবে ? স্বল্পকাল বলিলে আমরা বুঝি কোনো বিশেষ মাত্রায় পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির পরিমাণ বাড়াইয়া বা কমাইয়া সে তাহার উৎপাদন পরিমাণ বদলাইতে পারে ; স্থির উপাদানগুলির পরিমাণ বদল করার সময় তাহার হাতে নাই, অর্থাৎ তাহার উৎপাদনের মাত্রা (বা scale) সে সমান রাখিয়াছে। আমরা ধরিয়া লই যে এই সময়ে

শিল্পের মধ্যে নূতন কোনো ফার্ম প্রবেশ করে না। আমরা আরও ধরিয়া লই যে সকল ফার্মের অবস্থা সমান (indentical cost conditions)। এই অবস্থায় আমরা বিশেষ কোনো একটি ফার্মের ভারসাম্যের অবস্থা ব্যাখ্যা করিলে, শিল্পের মধ্যে অন্যান্য ফার্মের ক্ষেত্রেও এই বিশ্লেষণ সমান ভাবে প্রযোজ্য হইবে। ফার্মগুলির ব্যয়ের অবস্থা সমান বলিলে বোঝা যায় উহাদের সকলের গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখাগুলি একই রূপ। সকল ফার্মের দক্ষতা সমান স্তরের। বিভিন্ন ফার্ম যে উপাদানগুলি ব্যবহার করে তাহা সমজাতীয় (homogereous) এবং নির্দিষ্ট ও স্থির দরে (at given and constant prices) তাহারা উহাদের কিনিতে পারে।

স্বল্পকালীন MC ও AC রেখায় সকল ফার্মই আছে

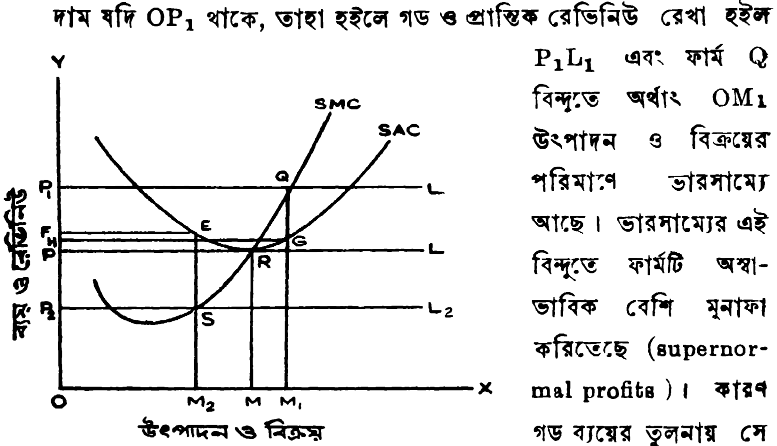
এই অবস্থায় ফার্মের স্বল্পকালীন উৎপাদন-নীতি ও ভারসাম্যের অবস্থা 269 পৃষ্ঠায় চিত্রে দেখান হইয়াছে।

OP দামে PL হইল ফার্মের বিক্রয় রেখা, পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলিয়া উহা AR ও MR রেখা। MC তাহার প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা। OP দাম নির্দিষ্ট থাকিলে ফার্মটি সর্বোচ্চ মুনাফার বিন্দুতে উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে থাকিবে। আমরা জানি ফার্মের ভারসাম্যের দুইটি শর্ত: (i) MR=MC, এবং (ii) MC রেখা MR রেখাকে তলার দিক হইতে কাটিয়া উপরে উঠে। T বিন্দুতে MR=MC হইতেছে, কিন্তু MC রেখা MR রেখাকে উপরের দিক হইতে কাটিতেছে। সুতরাং T তাহার ভারসাম্যের বিন্দু হইতে পারে না। R বিন্দুতে, যেখানে ফার্মের উৎপাদন OM, সেখানে এই দুইটি শর্তই একযোগে পূরণ হইতেছে। R বিন্দুতে MR=MC এবং MC রেখা তলার দিক হইতে MR-কে কাটিয়া ওঠে। এই বিন্দুতে, অর্থাৎ OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্তরে সে ভারসাম্যের অবস্থায় পৌছিবে। MC কেবলমাত্র MR-এর সমান নয়, AR বা দামেরও সমান, কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতায় MR ও AR একই। সুতরাং এইরূপ বাজারে ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত হইল, উৎপাদনের যে পরিমাণে: (i) MC=MR=Price (AR), (ii) MC রেখা MR রেখাকে তলার দিক হইতে কাটিয়া উপরে উঠে।

ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের এই আলোচনা হইতে ফার্মের মুনাফা কতটা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। স্বল্পকালে ফার্মের কেবল যে মুনাফা হয় তা-ও নয়; তাহার ক্ষতিও হইতে পারে। সেই ক্ষতির পরিমাণ কত, উপরের আলোচনা হইতে তাহার আমরা জানিতে পারি না। স্বল্পকালে ফার্মের

অস্বাভাবিক মুনাফা হইতে পারে, স্বাভাবিক মুনাফা হইতে পারে, আবার ক্ষতিও হইতে পারে। আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা করিব। স্বল্পকালীন ভারসাম্যে ফার্মের লাভ বা ক্ষতি কি হইতেছে, এবং কতটা হইতেছে, তাহা আমরা নীচের চিত্র হইতে জানিতে পারি।

দাম যদি OP_1 থাকে, তাহা হইলে গড় ও প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা হইল



P_1L_1 এবং ফার্ম Q বিন্দুতে অর্থাৎ OM_1 উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণে ভারসাম্যে আছে। ভারসাম্যের এই বিন্দুতে ফার্মটি অস্বাভাবিক বেশি মুনাফা করিতেছে (supernormal profits)। কারণ গড় ব্যয়ের তুলনায় সে বেশি দাম পাইতেছে, প্রতি ইউনিটে গড় ব্যয়ের তুলনায় GQ পরিমাণ বেশি দাম পাইতেছে। এই অস্বাভাবিক মুনাফার মোট পরিমাণ হইল $QG \times OM_1$ অর্থাৎ $QGHP_1$ আয়তক্ষেত্র। শিল্পের মধ্যে সকল ফার্মের সমান ব্যয়রেখা থাকায় সব ফার্মেই এই অস্বাভাবিক বেশি মুনাফা করিতেছে ধরিতে হইবে। অন্যান্য শিল্প হইতে নূতন নূতন ফার্ম এই শিল্পে আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু স্বল্পকাল এতটা দীর্ঘ নয় যে নূতন ফার্ম প্রবেশ করিতে পারে, তাই চলতি বা পুরাণো ফার্মগুলিই OP_1 দামে স্বল্পকালে এই অস্বাভাবিক পরিমাণ মুনাফা পাইতে থাকিবে। অর্থাৎ OP_1 দামে ফার্মগুলির পৃথক পৃথক ও নিজের ভারসাম্য ঘটিলেও সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য ঘটে নাই, কারণ নূতন নূতন ফার্মগুলি শিল্পে প্রবেশের উদ্দেশ্যে বাহিরে সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

স্বল্পকালে অস্বাভাবিক বেশি মুনাফা পাইতে পাবে

মনে কর, বাজারের চলিত দাম হইল OP, এই দামে AR ও MR রেখা হইল PL. ফার্মটি এক্ষেত্রে R বিন্দুতে ভারসাম্যে আছে। R বিন্দুতে MR =MC, এবং MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক হইতেই কাটিতেছে। R বিন্দুর বৈশিষ্ট্য যে এখানে AR এবং AC সমান। OP দামে R বিন্দুতে,

অর্থাৎ OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্তরে ফার্মটি ভারসাম্যে আছে। এই বিন্দুতে সে (এবং সকল ফার্মই) কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাইতেছে (স্বাভাবিক মুনাফা গড় ব্যয় রেখারই অন্তর্ভুক্ত)। শিল্পের সকল ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায় বলিয়া (অর্থাৎ অন্য শিল্পে গেলে সে যতটুকু পাইতে পারিত) শিল্পের বাহির হইতে কোনো নূতন ফার্ম এই শিল্পে প্রবেশের কোনো চেষ্টা করিতেছে না, কোনো ফার্ম বাহিরও হইতেছে না। এইরূপে দেখা যায় স্বল্পকালে ফার্ম এবং শিল্প উভয়ই OP দামে ভারসাম্যে আছে। অর্থাৎ স্বল্পকালেও পূর্ণ ভারসাম্য ঘটিতে পারে যেখানে সকল ফার্ম এবং সমগ্র শিল্প ভারসাম্যে পৌঁছে না, যদিও তত্ত্বগত দিক হইতে ইহাতে কোনো বাধা নাই। সাধারণত, দীর্ঘকালে ফার্মের এবং চলতি ফার্মগুলির উৎপাদন-মাত্রায় অনেক রদবদল হইয়া শিল্পে ভারসাম্য আসে।

স্বাভাবিক মুনাফাও পাইতে পারে, তখন শিল্পেও ভারসাম্য থাকে

স্বল্পকালে ফার্মটির ক্ষতিও হইতে পারে। মনে কর স্বল্পকালীন দাম হইল OP_2, এই অবস্থায় MR রেখা হইল P_2L_2, MC রেখা S বিন্দুতে MR রেখার সহিত মিলিত হইতেছে। MC রেখা নীচের দিক হইতে MR কে কাটিয়া উপরে উঠিতেছে, ইহাও সত্য। স্বতরাং ফার্মের ভারসাম্য ঘটিতে বাধা নাই। তবে এই S বিন্দুতে, OP_2 দামে, OM_2 উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণে সে ভারসাম্যে থাকিলেও তাহার আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। এই বিন্দুতে AC অপেক্ষা AR কম। প্রতি ইউনিটে তাহার ES ক্ষতি, মোট ক্ষতি হইল $ES \times OM_2 = ESP_2F$ আয়তক্ষেত্র।

স্বল্পকালে ফার্মের ক্ষতিও হইতে পারে

দাম যদি OP_2 থাকে, তবে ফার্মটিকে উৎপাদন করিতে হইলে ইহাই তাহার নিম্নতম ক্ষতি। S ছাড়া অন্য কোনো বিন্দুতে উৎপাদন করিতে গেলে তাহার ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়া যাইত। স্বতরাং ভারসাম্যের এই বিন্দুটি (দাম-ব্যয় কাঠামো অপরিবর্তিত অবস্থায়) তাহার পক্ষে সর্বোত্তম (optimal)। মুনাফা ঋণাত্মক হইলেও ইহা সর্বোত্তম, কারণ এখানে ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন (minimum loss)। শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মের ব্যয়রেখা সমান ধরিয়া লওয়া হইতেছে, ফলে সকল ফার্মই লোকসানের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। তাহাদের চেষ্টা হইবে এই শিল্প ছাড়িয়া অন্য কোনো শিল্পে প্রবেশ করা, যেখানে অন্তত স্বাভাবিক মুনাফাটুকু পাওয়া সম্ভব। কিন্তু স্বল্পকালে শিল্প হইতে

তখন সে সর্বনিম্ন ক্ষতির বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকিবে

ফার্ম চলিয়া যায় না, সেরূপ সুবিধা তাহার নাই। এই S বিন্দুতে, ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও, ফার্মগুলি ভারসাম্যে আছে, কিন্তু সমগ্র শিল্পে ভারসাম্যের অবস্থা নাই, কারণ ফার্মগুলি শিল্পটি পরিত্যাগ করার মত সময় খুঁজিতেছে।

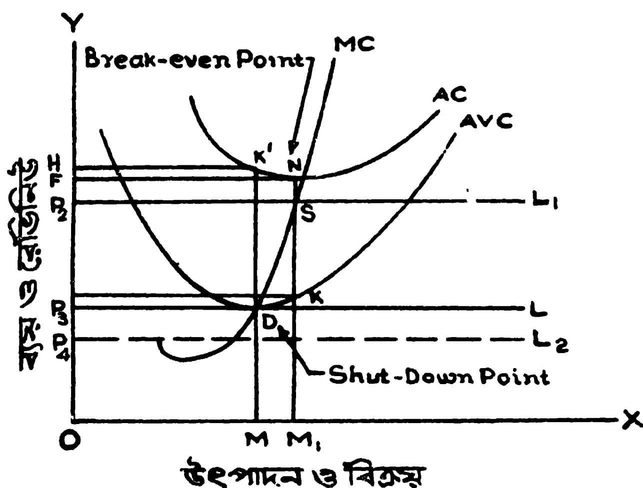
ক্ষতি হইলে ফার্ম উৎপাদন স্থগিত রাখে না কেন?

স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিবে, যদি ক্ষতিই হইতে থাকে তবে ফার্মগুলি উৎপাদন ও বিক্রয় চালাইতেছে কেন, কেন তাহারা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতেছে না? যদি তাহারা শিল্প ছাড়িয়া চলিয়া না-যায়, তবুও স্বল্পকালে ফার্মটি বন্ধ করিয়া রাখিলে (shut down) লোকসানের হাত হইতে তো বাঁচিতে পারে। এইরূপ বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধা কি? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বল্পকাল হইল এমন সময় যখন কোনো ফার্ম তাহার স্থির উপাদান (fixed capital equipments) বদলাইতে পারে না। উৎপদন ও বিক্রয় স্থগিত রাখিলেও তাহাকে স্বল্পকালে এই স্থির ব্যয়গুলি চালাইয়া যাইতেই হয়। ফলে ফার্মটি দরজা বন্ধ করিয়া উৎপাদন ও বিক্রয় স্থগিত রাখিলে কেবলমাত্র পরিবর্তনীয় ব্যয়টুকু বাঁচাইতে পারে। বন্ধ করিলেও তাহাকে উৎপাদনের নিম্নতম ব্যয়ের অংশ বহন করিতে হয়, ওই পরিমাণ ক্ষতি তাহার হইবেই। সুতরাং বন্ধ না করিয়া, উৎপাদন ও বিক্রয় চালাইতে থাকিয়া, যদি সে পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা কিছু বেশি রেভিনিউ আয় করিতে পারে তবে সে উৎপাদন বন্ধ করিবে না। স্থির ব্যয়ের সবটা সে তুলিতে পারিতেছে না ঠিকই, কিন্তু সেই জন্য উৎপাদন স্থগিত রাখা তাহার যুক্তিসঙ্গত আচরণ বলা যায় না। ফার্মটি তাই যদি স্বল্পকালে পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সবটা এবং স্থির ব্যয়ের কিছুটাও তুলিতে পারে, তবে সে কোনোমতে চালাইয়া যাইবে। কিন্তু দাম যদি এত কম থাকে যে তাহার পক্ষে পরিবর্তনীয় ব্যয়টুকু তোলাও সম্ভব হইতেছে না, তবে ক্ষতির পরিমাণ কমাইবার জন্য ফার্মটি বন্ধ করিয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা তাই এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে ক্ষতি যদি মোট স্থির ব্যয়ের পরিমাণ হইতে বেশি হয়, অর্থাৎ তাহার রেভিনিউ মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষাও কম, তখন ফার্মটি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াইবার জন্য নিশ্চয় দরজা বন্ধ করিবে। উহাই তাহার উৎপাদন-বন্ধের বিন্দু বা shut-down point.

আর কখনই বা সে উৎপাদন স্থগিত রাখিবে?

উপরের এই বক্তব্যটিকে আমরা নীচের চিত্রে প্রকাশ করিতে পারি: AC ও MC হইল গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা, AVC হইল গড় পরিবর্তনীয়

ব্যয়ের রেখা। দাম যদি হয় OP_2 তবে ফার্মটি S বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকে এবং তাহার P_2SNF পরিমাণ লোকসান হইতেছে। কিন্তু ফার্মটি মোট



পরিবর্তনীয় ব্যয় তুলিতে পারিতেছে, এবং মোট স্থির ব্যয়ের কিছু অংশও তাহার উঠিয়া আসিতেছে। সে প্রতি-ইউনিটে দাম পাইতেছে M_1S, কিন্তু তাহার পরিবর্তনীয় ব্যয় হইল প্রতি ইউনিটে M_1K. স্থির ব্যয়ের মধ্যে প্রতি ইউনিটের KS অংশটুকু সে তুলিয়া আনিতে পারিতেছে, SN অংশটুকু পারিতেছে না। সুতরাং স্বল্পকালে OP_2 দামে OM_1 পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় সে করিতে থাকিবে। কিন্তু দাম যদি কমিয়া OP_3 হইয়া পড়ে তখন ফার্মের MC=MR হইল D বিন্দুতে। এখানে ফার্মটি মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় তুলিতে পারিলেও স্থির ব্যয়ের কোনো অংশ সে পাইতেছে না। কারণ OM উৎপাদনের পরিমাণে দাম OP_3 গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় MD-র সমান। কিন্তু OP_3 দামের কম দাম পাইলে, অর্থাৎ দাম যদি AVC রেখার নিম্নতম বিন্দুর তলায় চলিয়া যায়, তখন সে নিশ্চয় উৎপাদন বন্ধ করিবে, কারণ দাম যেহেতু গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা কম, সেইজন্য সে উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া পরিবর্তনীয় ব্যয়টুকুও পাইতেছে না। D বিন্দুটি তাই উৎপাদন স্থগিত রাখা বা বন্ধ রাখার বিন্দু (shutdown point)। যেমন OP_4 দামে ফার্মটি স্থির ব্যয়ের কোনো অংশ তো পাইতেছেই না উপরন্তু পরিবর্তনীয় ব্যয়ের কিছুটাও সে ফেরৎ পায় না। OP_4 দামে ফার্মের ক্ষতি হইল মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়েরও কিছু অংশ। এই অবস্থায় সে কোনো মতে

উৎপাদন ও বিক্রয় চালাইতে পারে না। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, স্বল্পকালে ফার্মটি উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে, যদি দাম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা নীচুতে থাকে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (Longrun equilibrium of the Firm Under Perfect Competition)

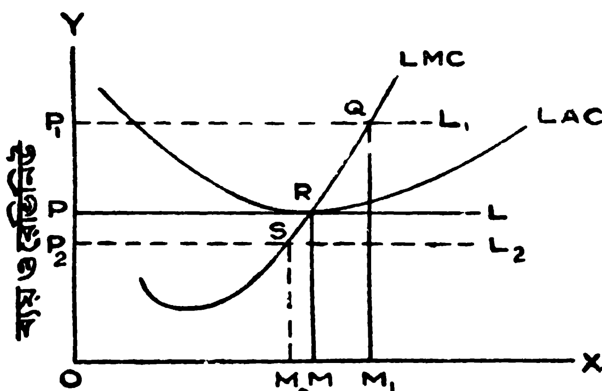
দীর্ঘকাল হইল এত বিস্তৃত সময় যাহার মধ্যে ফার্ম তাহার উৎপাদনের মাত্রা বদল করিয়া স্থির উৎপাদন ও পরিবর্তনীয় উপাদান উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনিবার সুযোগ পায়। দীর্ঘকালে কোনো উপাদানই স্থির নয়, সকল উপাদানই পরিবর্তনীয়। দীর্ঘ সময় পাইলে ফার্ম স্থির উপাদানগুলি বাড়াইয়া উৎপাদনের নূতন মাত্রায় পৌছিয়া উৎপাদন বাড়াইতে পারে। পুরাতন কলকব্জা ফেলিয়া দিতে পারে এবং অতিরিক্ত নূতন যন্ত্রপাতি ঘরবাড়ি সংযোজন করিতে পারে। উপরন্তু, দীর্ঘকালে নূতন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে। আবার অপরদিকে, সে ক্ষয়ক্ষতি পূরণ না করিয়া পুরাতন যন্ত্রপাতি ও ঘরবাড়িকে সম্পূর্ণ বাতিল করিতে পারে, অথবা শিল্প হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতেও পারে। এইরূপে দীর্ঘকালে যত রকমের প্রয়োজন, সর্বপ্রকার পরিবর্তন আনিয়া সে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে। দীর্ঘকালে সে কতটা উৎপাদন করিবে তাহা আলোচনার জন্য দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা ও (LAC) এবং দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা গুরুত্বপূর্ণ (LMC)। উপরন্তু, দীর্ঘকালে, পরিবর্তনীয় ব্যয়ের গুরুত্ব ততটা নাই। তাহার সম্মুখে প্রধান বিষয় হইল গড় ব্যয় (AC) কারণ দীর্ঘকালে সকল ব্যয় পরিবর্তনীয় এবং স্থির ব্যয় বলিয়া কিছু নাই।

দীর্ঘকাল কাহাকে বলে

আমরা দেখিয়াছি স্বল্পকালে ফার্মের ভারসাম্যের বিন্দু হইল যে-উৎপাদন পরিমাণে MR = MC. দীর্ঘকালেও ইহা সত্য। কিন্তু দীর্ঘকালে কোনো ফার্মকে ভারসাম্যে থাকিতে হইলে ইহার সহিত আর একটি বিষয়কে সমান করা দরকার, তাহা হইল AC. দাম যদি AC হইতে বেশি হয় তবে ফার্মটি অস্বাভাবিক বেশি মুনাফা করিতেছে। এই অস্বাভাবিক বেশি মুনাফার লোভে নূতন নূতন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করিবে। শিল্পের মোট যোগান বাড়িবে, যোগান রেখা ক্রমশ ডানদিকে সরিবে, দাম কমিয়া আসিয়া মুনাফার স্বাভাবিক পরিমাণে ফার্মগুলিকে আনিয়া দিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুলনীয় অন্যান্য শিল্পের অনুরূপ স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা বেশি এই শিল্পে পাওয়া যায়, ততক্ষণ নূতন

নূতন ফার্ম প্রবেশ করিবে এবং শিল্পের যোগান রেখা ডানদিকে সরিতে থাকিবে। অবশেষে দাম AC রেখার সমান হইলে সকল ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফার কম বা বেশি কিছুই পাইবে না। আবার বিপরীত পক্ষে, স্বল্পকালে সকল ফার্মে দাম যদি AC রেখার তলায় থাকে, তখন ফার্মগুলির লোকসান দেখা দিবে। শিল্পের মধ্য হইতে কোনো কোনো ফার্ম অন্য শিল্পে স্বাভাবিক মুনাফার লোভে চলিয়া যাইবে। শিল্পের যোগান হ্রাস পাইবে এবং যোগান রেখা বামদিকে সরিয়া আসিতে থাকিবে। অবশেষে দীর্ঘকালে দাম AC-র সমান হইবে, এবং যে ফার্মগুলি শিল্পে রহিয়া গেল তাহারা অন্তত স্বাভাবিক মুনাফাটুকু পাইতে থাকিবে। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালে কোনো ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত হইল: Price = MC = AC. আমরা জানি যে, AC যখন নামে MC তখন উহার নীচে, আবার AC যখন উঠে MC তখন উহার উপরে। সুতরাং AC ও MC সমান হইতে পারে একমাত্র AC-র নিম্নতম বিন্দুতে, যেখানে AC নামিতেছে না বা উঠিতেছে না। সুতরাং AC-র নিম্নতম বিন্দুতেই MC উহাকে ছুঁইতে পারে, অপর কোনো স্থানে সম্ভব নয়। একমাত্র AC-র নিম্নতম বিন্দুতেই তাই AC ও MC পরস্পর

দীর্ঘকালে ভারসাম্যের শর্ত কি



সমান বা AC = MC. সুতরাং উপরের ভারসাম্যের শর্তটিকে আমরা এইভাবে লিখিতে পারি: Price = MC = AC-র নিম্নতম বিন্দু। নীচের চিত্রের দিকে তাকাইলে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে শর্তগুলি আমরা ভালভাবে বুঝিতে পারিতেছি। LAC হইল দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা, LMC হইল দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা। OP_1 দামে ফার্মের

দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঘটে না। কারণ যদিও Q বিন্দুতে LMC রেখা MR রেখার (P_1L_1) সহিত সমান হয় (OM_1 উৎপাদনে), তবুও ইহা LAC রেখা হইতে বেশি বা উঁচুতে। এই অবস্থায় ফার্মটি অস্বাভাবিক বেশি মুনাফা করিতে পারে। ফলে শিল্পের মধ্যে নূতন ফার্মের প্রবেশ ঘটিতে থাকিবে, শিল্পের যোগান বাড়িবে এবং দাম কমিয়া ক্রমে OP-তে আসিয়া পৌছিবে। ফার্মটি R বিন্দুতে, OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্তরে, ভারসাম্যে পৌছিবে। R বিন্দুতে বা ভারসাম্যের পরিমাণ (OM) উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্তরে, দাম AC-র সমান, ফলে ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা পাইতেছে। OP দামে শিল্পে নূতন ফার্ম প্রবেশের কোনো আকাঙ্ক্ষা দেখা দিতেছে না।

আবার বিপরীত পক্ষে, দীর্ঘকালে কোনো ফার্ম OP_2 দামে ভারসাম্যে থাকিতে পারে না। যদিও OP_2 দাম S বিন্দুতে MC-র সমান তবুও এই দাম গড় ব্যয়ের কম বলিয়া ফার্মের লোকসান হইতেছে। শিল্পের সকল ফার্মের ব্যয়-রেখা সমান, তাই সকলেই ক্ষতি স্বীকার করিতেছে। এই ক্ষতি এড়াইবার জন্য কোনো কোনো ফার্ম নিশ্চয় শিল্পটি পরিত্যাগ করিয়া অন্য শিল্পে চলিয়া যাইতে থাকিবে। শিল্পের যোগান কমিয়া আসিবে, যোগান-রেখা বাম দিকে সরিবে, দাম বৃদ্ধি পাইবে। দাম বাড়িয়া ক্রমে OP-তে পৌছিবে, যেখানে সকল ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফা করিতে পারিতেছে। OP দামে কোনো ফার্মের আর শিল্পটি পরিত্যাগ করার কোনো ঝোঁক দেখা দিবে না।

আমরা তাই এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কোনো ফার্ম দীর্ঘকালে ভারসাম্যে পৌছিবার শর্ত হইল : Price = MC = AC-র নিম্নতম বিন্দু।

OP দামে ফার্ম তো ভারসাম্যে আছেই, প্রত্যেকেই OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিতেছে : কেবল তাহাই নহে সমগ্র শিল্পটিও ভারসাম্যে আছে, কারণ নূতন নূতন ফার্মের প্রবেশের ঝোঁক নাই, অথবা পুরাতন ফার্মগুলির শিল্পটি পরিত্যাগ করার কোনো চেষ্টা নাই। সকলেই এই বিন্দুতে স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতেছে। দীর্ঘকালে তাই এই অবস্থায় পূর্ণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে অর্থাৎ প্রতিটি ফার্ম ও সমগ্র শিল্প একযোগে ভারসাম্যে রহিয়াছে। আর একটি কথা। প্রতিযোগিতার চাপে দীর্ঘকালে প্রতিটি ফার্মের আয়তন সর্বোত্তম হইতেছে (optimum size)। ইহা ক্রেতাদের দিক হইতে সুবিধাজনক, কারণ কোনো ফার্মের লোকসান নাই, অথচ সর্বনিম্ন ব্যয়ে দ্রব্যটি উৎপন্ন হইতেছে। সমাজের দিক হইতেও ইহা সর্বোত্তম

কারণ কোনো ফার্ম উপকরণের অপচয় ঘটাইতে পারে না, প্রতিযোগিতার দরুণ সর্বনিম্ন ব্যয় তাহাকে করিতেই হইবে।

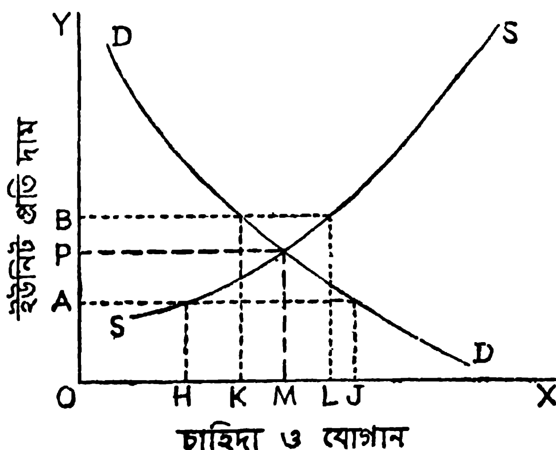
সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য (Equilibrium of the Industry)

চাহিদা, যোগান ও সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য (Demand, Supply and the equilibrium of the Industry as a whole)

ক্রেতার ভারসাম্য তত্ত্ব হইতে জানিতে পারি, বিভিন্ন দামে কোনো ক্রেতা একটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে। ইহাকে আমরা সেই ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা বলি। বাজারের সকল ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা যোগ দিলে আমরা বাজার-চাহিদা-তালিকা পাই এবং দ্রব্যটির চাহিদা-রেখা গঠন করিতে পারি। যে-সকল অন্যান্য বিষয় (cetera) এই সময়ের মধ্যে সমান (paria) থাকিবে বলিয়া আমরা মনে করি তাহারা হইল ক্রেতার রুচি ও পছন্দ (অর্থাৎ নিরপেক্ষ মানচিত্র), তাহার আয় বা পরিকল্পিত ব্যয়, অন্যান্য দ্রব্যের দাম এবং সর্বাধিক তৃপ্তি পাওয়ার লক্ষ্য। বাজার-চাহিদা-রেখা গঠনের পর ক্রেতার নিজস্ব ভূমিকা নিশ্চল হইয়া পড়ে, দাম-নির্ধারণে তাহার পৃথক অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া যায়। বাজার-চাহিদা তাহাদের প্রত্যেকের কাজের সম্মিলিত অভিব্যক্তি।

একক ক্রেতা হইতে বাজার চাহিদার উদ্ভব

বিক্রেতার ভারসাম্য তত্ত্ব হইতে আমরা জানিতে পারি, বিভিন্ন দামে কোনো এক বিক্রেতা একটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয় করে। ইহাকে



আমরা বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান তালিকা বলি। বাজারের সকল বিক্রেতার

এইরূপ ব্যক্তিগত যোগান তালিকা যোগ দিলে আমরা বাজার-যোগান-তালিকা পাই এবং দ্রব্যটির যোগান-রেখা গঠন করিতে পারি। যে-সকল অন্যান্য বিষয় (cetera) এই সময়ের মধ্যে সমান (paria) থাকিবে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহারা হইল উৎপাদন-সম্ভাবনার মানচিত্র (isoquant map), পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির দাম এবং সর্বাধিক মুনাফা কবার লক্ষ্য। বাজার-যোগান-রেখা গঠনের পর বিক্রেতার নিজস্ব ভূমিকা নিশ্চল হইয়া পড়ে, দাম নির্ধারণে তাহার পৃথক অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া যায়। বাজার-যোগান তাহাদের প্রত্যেকের কাজের সম্মিলিত অভিব্যক্তি।

একক বিক্রেতা হইতে বাজার যোগানের উদ্ভব

এই বাজার চাহিদা তালিকা ও বাজার-যোগান-তালিকা দুইটিকে পাশাপাশি রাখিলে আমরা এমন একটি দাম পাই যে-দামে বাজারে চাহিদার পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণ সমান। এই অবস্থায় সেইরূপ দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং এই দামকে বলা হয় ভারসাম্যের দাম।

পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রে দেখান হইয়াছে :

OY অক্ষে আমরা দ্রব্যটির ইউনিট-প্রতি বিভিন্ন সম্ভাব্য দাম পরিমাপ করি এবং OX অক্ষে আমবা নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগান পরিমাপ কবি। এই দুইটি অক্ষেব মধ্যে চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখা উভয়কেই স্থাপন করা হইয়াছে। OP হইল ভারসাম্যের দাম, এই দামে OM পরিমাণ চাহিদা হইতেছে এবং ঐ পবিমাণই বিক্রয় হইতেছে। অন্য কোনো দাম থাকিলে চাহিদা ও যোগানের সমতা আসিতে পারে না, দ্রব্যটির বাজারে ভারসাম্য স্থাপিত হয় না। যেমন, দাম যদি OA হয় তবে সকল ফার্ম মিলিয়া OH পরিমাণ যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু সকল ক্রেতা মিলিয়া OJ পরিমাণ চাহিদা করিতে থাকে। এই অবস্থায় HJ পরিমাণ চাহিদা মেটে না। অপরপক্ষে, দাম যদি OB হয়, তবে সকল ক্রেতা মিলিয়া মাত্র OK চাহিদা করে, কিন্তু সকল ফার্ম মিলিয়া যোগান দেয় OL পরিমাণ। এই অবস্থায় KL পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ কোনো অবস্থাতেই বাজারে ভারসাম্যের দাম পাওয়া গিয়াছে, এমন বলা চলে না। একমাত্র OP দামে যোগান ও চাহিদা সমান, ঐ দামই ভারসাম্যের দাম। যতক্ষণ পর্যন্ত যোগান বা চাহিদায় পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যোগান-রেখা বা চাহিদা রেখার অবস্থান এবং আকৃতি (position and shape) সমান থাকে, ততক্ষণ OP দামে OM পরিমাণ ক্রয় ও বিক্রয় হইতে থাকে।

সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য বলিলে কি বোঝা যায়? ইহা দ্বারা আমরা বুঝি যে শিল্পটির মোট উৎপাদন বাড়িবার বা কমিবার দিকে কোনো ঝোঁক দেখা যাইতেছে না। সমগ্র শিল্পের মোট উৎপাদন বাড়িতে বা কমিতে পারে কি ভাবে? উহার দুইটি পথ আছে: প্রথমত, একক ফার্মগুলির প্রসারণ বা সঙ্কোচন, এবং দ্বিতীয়ত, নূতন নূতন ফার্মের প্রবেশ অথবা বর্তমান ফার্মগুলির মধ্য হইতে কোনো কোনো ফার্মের বহির্গমন।

শিল্পের ভারসাম্য কাহাকে বলে

এইরূপে দেখা যায় কোনো শিল্পে ভারসাম্য আছে, যখন (i) একক ফার্মগুলির কাহারও নিজের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা নাই, অর্থাৎ ফার্মগুলির প্রত্যেকে ভারসাম্যে আছে, এবং (ii) নূতন ফার্মগুলির প্রবেশের বা বর্তমান ফার্মগুলির বহির্গমনের কোনো ঝোঁক দেখা যাইতেছে না, অর্থাৎ ঐ শিল্পের বাহিরে তাহাদের বেশি মুনাফা নাই, বা বাহির হইতে ঐ শিল্পে ঢুকিয়া বেশি মুনাফা করিতে পারে না। শিল্পের ভারসাম্য থাকিতে হইলে এই দুইটি শর্ত পূরণ হইতে হইবে। একক ফার্মটি কখন ভারসাম্যে থাকে? যখন সেই ফার্ম এমন পরিমাণে উৎপাদন করে যে তাহার MR=MC, এবং MC সেই বিন্দুতে MR-কে তলার দিক হইতে কাটিয়া উপরে ওঠে। এই দুইটি অবস্থা থাকিলে তখনই ফার্ম ভারসাম্যে পৌঁছিবে। আর সমগ্র শিল্পটি ভারসাম্যে কখন থাকে? যখন সেই শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলি "স্বাভাবিক মুনাফা" আয় করিতেছে, উহার বেশি নয় বা কম নয়। যতটুকু মুনাফা পাইলেই ফার্মগুলি ঐ শিল্পে থাকিয়া যাইবে, বাহিরে চলিয়া যাইবে না, কারণ বাহিরের কোনো শিল্পে গেলে উহাপেক্ষা বেশি মুনাফা সে আশা করিতেছে না, তাহাই স্বাভাবিক মুনাফা। বাহিরের কোনো ফার্মও আশা করে না যে এই শিল্পে প্রবেশ করিলে সে স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা পাইবে।

(i) প্রতিটি ফার্মের ভারসাম্য
(ii) শিল্পে ফার্মের সংখ্যায় পরিবর্তন নাই

প্রতিটি ফার্মের ভারসাম্যের দুইটি শর্ত

তাই দেখা যায় শিল্পের ভারসাম্য বুঝিতে হইলে স্বাভাবিক মুনাফার পরিমাণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আমরা যদি মনে করি কোনো শিল্পের অন্তর্গত প্রতিটি উদ্যোক্তার পরিবর্ত-আয় সমান (same transfer earnings), অর্থাৎ তাহারা শিল্প হইতে বাহির হইয়া অন্য শিল্পে গেলে সেখানে মোটামুটি (ধরা যাউক) 8% মুনাফা পাইবে বলিয়া মনে করিতেছে, তবে তাহাদের এই শিল্পে টানিয়া রাখিতে হইলে অন্তত 8% মুনাফা পাইতে

হইবে। প্রত্যেকটি উদ্যোক্তা পরিবর্ত-আয় অর্থাৎ অন্য শিল্পে মুনাফার হার সম্পর্কে চিন্তা করে। পরিবর্ত-আয় সম্পর্কে সকলের ধারণা সমান হইলে, ওই শিল্পটিতে স্বাভাবিক মুনাফার হার মোটামুটি নির্দিষ্ট (অর্থাৎ 8%-ই হইবে)। এই স্বাভাবিক মুনাফা পাইতে থাকিলে কেহ শিল্পটি ছাড়িয়া যাইবে না। যদি এই শিল্পে এই স্বাভাবিক মুনাফার হারের তুলনায় বেশি হার থাকে, তবে অন্যান্য শিল্পের উদ্যোক্তারা আকৃষ্ট হইবে এবং শিল্পে প্রবেশ করিবে। আবার অপর দিকে, যদি শিল্পের মধ্যে কোনো কোনো উদ্যোক্তা স্বাভাবিকের তুলনায় কম হারে মুনাফা করিতে থাকে, (অর্থাৎ 8% হইতে কম পায়), তাহা হইলে এই শিল্প ছাড়িয়া তাহারা অন্য শিল্পে প্রবেশের চেষ্টা করিতে থাকিবে। শিল্পে ফার্মের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত যোগান কমিয়া, দাম বাড়িয়া, মুনাফার হার স্বাভাবিক হয়, ততদিন এই বহির্গমনের স্রোত চলিতে থাকিবে। তাই সংক্ষেপে বলা চলে, শিল্পের ভারসাম্য বা পূর্ণ ভারসাম্যের দুইটি শর্ত : (i) ফার্মগুলির প্রত্যেকের ভারসাম্য, এবং (ii) শিল্প হইতে বহির্গমন বা শিল্পের মধ্যে নূতন ফার্মের আগমন—কোনো ঝোঁক যখন দেখা যাইতেছে না।

শিল্পে ফার্মের সংখ্যা নির্ভর করে স্বাভাবিক মুনাফার হারের উপর

স্বাভাবিক মুনাফার ধারণা এবং শিল্পের ভারসাম্যে ইহার তাৎপর্য (The concept of normal profit and its significance in the equilibrium of the industry)

কোনো ফার্ম কোনো একটি শিল্পে থাকিবে কি থাকিবে না তাহা কেবল সে নিজের গড় ব্যয়টুকু তুলিতে পারিল কি না, তাহারই উপর নির্ভর করে না। ওই গড় ব্যয়ের মধ্যে যতটুকু মুনাফা যোগ করা আছে সেই মুনাফা 'স্বাভাবিক' স্তরে আছে কি না তাহাও সে চিন্তা করে। ফলে এই স্বাভাবিক মুনাফার পরিমাপ সে গড় ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লয়। গড়ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা ধরিয়া লইয়া তখন সে দাম = গড় ব্যয় এই পর্যন্ত উৎপাদন করে। দাম যদি গড় ব্যয়ের সমান থাকে তবে ফার্মগুলি উৎপাদনের খরচ-খরচা তুলিতেছে এবং স্বাভাবিক মুনাফার পরিমাণটুকুও তুলিতে পারিতেছে। আমরা তখন বলিতে পারি যে, শিল্পটি ভারসাম্যে আছে, কারণ শিল্প হইতে বাহির হইবার কোনো ইচ্ছা ফার্মগুলির নাই। 'স্বাভাবিক' হইল অন্যত্র গেলে সে যাহা পাইতে পারিত, অর্থাৎ অন্যত্রও এই মুনাফার হারই চলিতেছে। ওই শিল্পে সে উৎপাদন ও

বিক্রয় করিতেছে, ফলে ওই মুনাফা পাওয়াই তাহার স্বাভাবিক, না-পাওয়াই অস্বাভাবিক। ফলে অন্য শিল্প হইতে সেখানকার ফার্মদেরও এই শিল্পে আসার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না। দাম যদি গড় ব্যয় (স্বাভাবিক মুনাফা সহ) অপেক্ষা বেশি থাকে, তখন আমরা বলি যে বর্তমান ফার্মগুলি অস্বাভাবিক বেশি বা স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা করিতেছে (super-normal profits)। এই অবস্থায় বাহিরের উদ্যোক্তারা এইদিকে আকৃষ্ট হইবে, নূতন নূতন ফার্ম এই শিল্পে প্রবেশ করিতে থাকিবে, যোগান বাড়িবে, দাম কমিবে। যতদিন পর্যন্ত স্বাভাবিকের অতিরিক্ত অংশ মুনাফা ধুইয়া মুছিয়া শেষ না হয়, উহার পূর্ণ অবলোপ না ঘটে, ততদিন নূতন নূতন ফার্মের অনুপ্রবেশ চলিতেই থাকিবে। আবার বিপরীত দিকে দেখা যায়, দাম যদি (স্বাভাবিক মুনাফা সহ) গড় ব্যয়ের কম থাকে, তখন ফার্মগুলি স্বাভাবিকের কম মুনাফা করিতেছে (sub-normal profits), অর্থাৎ তাহাদের লোকসান হইতেছে। এই অবস্থায় কোনো কোনো ফার্ম শিল্প হইতে বাহির হইয়া যাইবে, যোগান কমিবে, দাম বাড়িবে। যতদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক অপেক্ষা ঘাট্‌তিটুকু পূরণ না হয়, ততদিনই শিল্প হইতে বহির্গমন চলিতে থাকিবে। অর্থাৎ বাজারে স্বাভাবিক মুনাফা সহ গড় ব্যয়ের সমান দাম বজায় থাকাই শিল্পের ভারসাম্যের মূল কথা। গড় ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা যোগ না করিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে, সমগ্র শিল্পের ভারসাম্যের শর্ত রচনা করা চলে না।

'স্বাভাবিক' কেন এবং কেন উহা গড়ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত

কোনো শিল্পের স্বাভাবিক মুনাফা বলিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু টাকা বুঝাইতে পারে। এই স্বাভাবিক মুনাফা হইল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা, অর্থাৎ উহা উৎপাদনের পরিমাণ-নিরপেক্ষ। ওই টাকা উদ্যোক্তার পাওয়া চাই, তাহা না হইলে সে শিল্প ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। যেহেতু স্বাভাবিক-মুনাফা বলিলে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বুঝায়, সেইজন্য উৎপাদন যত বাড়ে ইউনিট-প্রতি স্বাভাবিক মুনাফা তত কমে। অর্থাৎ স্থির ব্যয়ের মতই মুনাফার পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইয়া উৎপাদন বাড়াইলে, প্রথম দিকে, গড়ব্যয়ের রেখা নীচের দিকে নামে। গড় ব্যয়ের রেখার এইরূপ আকৃতির ইহাও একটি কারণ। বিষয়টিকে আমরা নীচের চিত্রে দেখাইতে পারি।

ACP রেখা হইল উৎপাদনের গড় খরচ এবং ইহার মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা

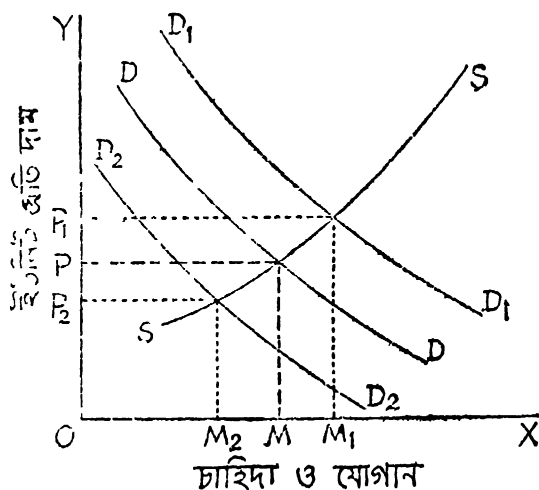
ধরা হয় নাই। ACP-র সঙ্গে প্রতি-ইউনিটে স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করিলে আমরা AC রেখা পাই। উৎপাদন যত বাড়ে ইউনিট-প্রতি স্বাভাবিক মুনাফা তত কমে। তাহার কারণ মোট এক নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদনের অধিকতর ইউনিটের মধ্যে ক্রমশ বিভক্ত হইতে থাকে। সেইজন্য ACP ও AC রেখার মধ্যে উচ্চতাগত দূরত্ব (vertical distance) ক্রমশ কমিতেছে, কিন্তু দুইটি রেখা কখনও মিলিত হইতেছে না। যেমন, OM উৎপাদনের পরিমাণে ইউনিট-প্রতি স্বাভাবিক মুনাফা হইল FG, আবার ON উৎপাদনের পরিমাণে ইউনিট-প্রতি স্বাভাবিক মুনাফা হইল RS. মনে রাখা দরকার যে EFGH এবং QRST প্রভৃতি আয়তক্ষেত্রগুলি সমান পরিমাণ মুনাফা প্রকাশ করে বলিয়া আয়তনে সমান হইবে।

চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তন : ভারসাম্যের বিন্দুর অপসারণ (Change in demand and supply: Shift in the equilibrium point)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ের বিন্দুতে, বাজারের ভারসাম্য নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের বর্তমান অবস্থাগুলি সমান থাকে কি না তাহার উপর। চাহিদা ও যোগানের চলতি অবস্থা সমান থাকা-ই ভারসাম্য বজায় থাকার শর্ত। কিন্তু ইহা ছাড়াও ভারসাম্য বলিলে বোঝা হয় কিছু সময়ের জন্য শান্ত অবস্থা, কিছুটা কাল কোনো পরিবর্তন না-আসা। এই অর্থে ধরিতে গেলে, বাজারে ভারসাম্যের অবস্থা ততক্ষণ ধরিয়া চলে যতটা সময়ের মধ্যে চাহিদা ও যোগানের অবস্থা বদলায় না। চাহিদার অবস্থা (অর্থাৎ চাহিদা রেখার অবস্থান ও গড়ন) অথবা যোগানের অবস্থা, কোনো একটি বা উভয়ই বদলাইলে ভারসাম্যের পুরানো বিন্দু সরিয়া গিয়া বাজারে ভারসাম্যের নূতন বিন্দু দেখা দেয়। বাজার যেন ভারসাম্যের একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দুতে অপসরণ করে। কিরূপে ইহা ঘটে তাহা চিত্রের সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর।

চাহিদা-রেখার বর্তমান অবস্থান ও আকৃতি ব্যাখ্যার সময়ে আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ, তাহাদের আয় বা পরিকল্পিত ব্যয় তাহাদের লক্ষ্য, এবং এই দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের দাম সমান আছে। ইহাদের কোন একটিতে পরিবর্তন আসিলে চাহিদা পরিবর্তিত হয়। যেমন আয় বাড়িয়া গেলে দ্রব্যটির চাহিদা বাড়িবে, অথবা এই দ্রব্যটির উপর পছন্দ বা অগ্রহ হ্রাস পাইলে চাহিদাও হ্রাস পাইবে; চাহিদা বাড়িয়া গেলে চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া যাইবে, চাহিদা কমিয়া গেলে চাহিদা-রেখা বামদিকে সরিয়া আসিবে। যোগান স্থির অবস্থায় চাহিদা বাড়িলে ভারসাম্যের দাম বাড়ে এবং চাহিদা কমিলে ভারসাম্যের দাম কমে। নিচের চিত্র হইতে ইহা দেখা যাইতেছে; OP ছিল ভারসাম্যের দাম এবং এই দামে OM

চাহিদার পরিবর্তন কেন এবং উহার ফল কি

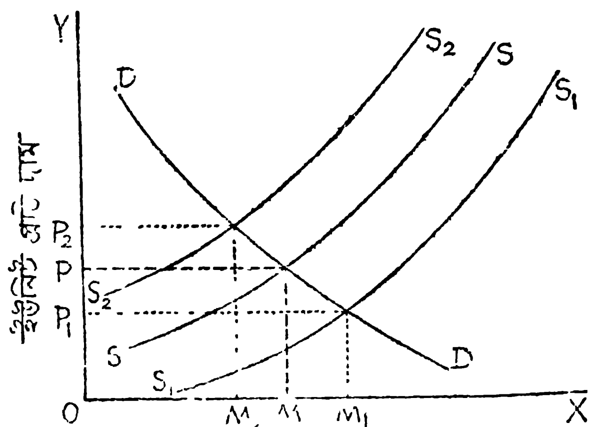


পরিমাণ ক্রয় ও বিক্রয় হইতেছিল। চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় নূতন চাহিদা-রেখা D_1 D_1 দেখা দিয়াছে, OP_1 দামে নূতন ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে, এই দামে OM_1 পরিমাণ যোগান ও চাহিদা হইতেছে। চাহিদা কমিয়া গেলে

নূতন চাহিদা-রেখা D_2D_2 দেখা দিয়াছে, এবং OP_2 দামে OM_2 পরিমাণ যোগান ও চাহিদা হইতেছে।*

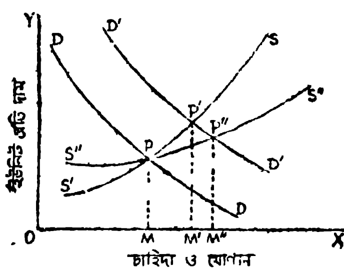
যোগানে পরিবর্তন কেন এবং উহার ফল কি

যোগান-রেখার বর্তমান অবস্থান ও আকৃতি ব্যাখ্যার সময়ে আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম বিক্রেতাদের উৎপাদন সম্ভাবনা, পরিবর্তনীয় উপাদানের দাম এবং তাহাদের লক্ষ্য সমান আছে। ইহাদের কোনো একটিতে পরিবর্তন আসিলে যোগানে পরিবর্তন হয়। যেমন, পরিবর্তনীয় উপাদানের দাম কমিলে যোগান বাড়িবে বা উহাদের দাম বাড়িলে যোগান কমিবে। যোগান বাড়িয়া গেলে যোগান-রেখা



ডানদিকে সরিয়া যায়, যোগান কমিয়া গেলে যোগান-রেখা বামদিকে সরিয়া

* চাহিদা বাড়িলে দাম কতখানি বাড়িবে তাহা নির্ভর করে যোগান-রেখার আকৃতির উপর। যোগান-রেখা যত বেশি খাড়া আকৃতির হইবে (steeper) অর্থাৎ যোগান যত অস্থিতিস্থাপক হইবে, চাহিদা বাড়িলে দাম তত বেশি বাড়িবে। আবার যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক যোগান-রেখা তত কম খাড়া, তত বেশি চেটাল (flatter)—এইরূপ অবস্থায় চাহিদা বাড়িলে দাম তত বেশি বাড়িবে না। পাশের ছবি হইতে ইহা দেখা যাইতেছে।

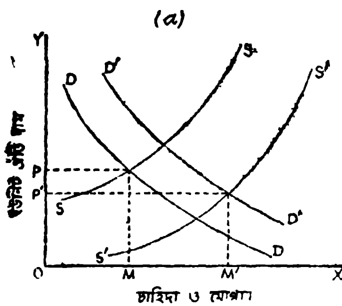


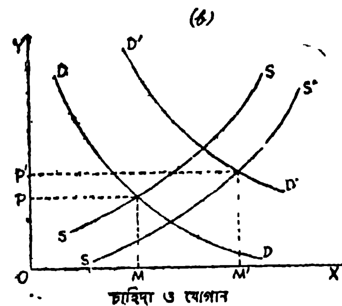
S S′ যোগান-রেখা অপেক্ষা S S′ যোগান-রেখা অধিকতর খাড়া। উহার স্থিতিস্থাপকতাও S′S″ হইতে কম। নূতন চাহিদা-রেখা D′D′ হইলে S S′ রেখার P′ বিন্দুতে এবং S″S″ রেখার P″ বিন্দুতে মিলিত হইতেছে। দেখা যায় M P দাম, M′P′ দাম হইতে বেশি। প্রথমক্ষেত্রে বিক্রয়ের পরিমাণ কম, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেশি, ইহাও লক্ষ্য করা যায়।

আসে। চাহিদা স্থির অবস্থায় যোগান বাড়িলে ভারসাম্যের দাম কমে, এবং যোগান কমিলে ভারসাম্যের দাম বাড়ে। পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।

OP ছিল ভারসাম্যের দাম এবং এই দামে OM পরিমাণ ক্রয় ও বিক্রয় হইতেছিল। যোগান বাড়িয়া নূতন যোগান-রেখা S_1S_1 দেখা দিয়াছে, OP_1 দামে নূতন ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে, এই দামে OM_1 পরিমাণ যোগান ও চাহিদা হইতেছে। যোগান কমিয়া গেলে নূতন যোগান-রেখা S_2S_2 দেখা দিবে, বর্ধিত OP_2 দামে নূতন ভারসাম্য স্থাপিত হইবে।*

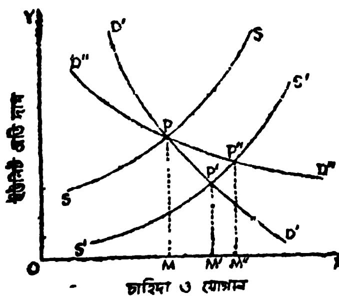
চাহিদা ও যোগানের একযোগে পরিবর্তন হইলে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণও





বদলাইয়া যাইবে। দামে কিরূপ পরিবর্তন আসিবে, তাহা নির্ভর করে উভয়ের পরিমাণে তুলনামূলক পরিবর্তনের উপর। যদি পুরানো দামে চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় যোগান বেশি বাড়ে, তবে নূতন ভারসাম্যের দাম পূর্বাপেক্ষা কম হইবে। যদি পুরানো দামে চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় যোগান কম বাড়ে, তবে নূতন ভারসাম্যের দাম পূর্বাপেক্ষা বেশি হইবে। উপরের চিত্র দুইটিতে ইহা দেখা যাইতেছে :

উভয়ের একযোগে পরিবর্তন

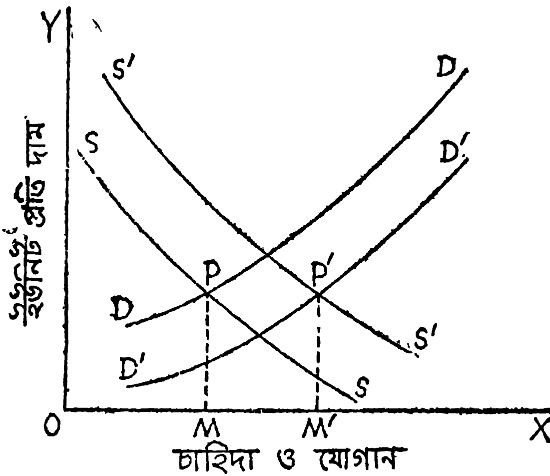


চাহিদা-রেখা যত অস্থিতিস্থাপক হইবে যোগান বাড়িলে দাম তত বেশি কমিবে, চাহিদা-রেখার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হইলে যোগান বাড়িলেও দাম তত বেশি কমিবে না। পাশের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

D D চাহিদারেখা অপেক্ষা D D'' চাহিদারেখা কম খাড়া, অর্থাৎ তুলনায় ইহার স্থিতিস্থাপকতা বেশি। P M' হইতে P' M'' বেশি।

(a) চিত্রে OP দামে ভারসাম্য ছিল ; যোগান ও চাহিদা উভয়ে একযোগে বৃদ্ধি পাইয়াছে, যথাক্রমে D'D' রেখা এবং S'S' রেখার উদ্ভব হইয়াছে। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার নূতন ভারসাম্যের দাম OP' পূর্বের ভারসাম্যের দাম OP হইতে কম। (b) চিত্রে চাহিদার তুলনায় যোগান কম বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই নূতন ভারসাম্যের দাম OP' পূর্বের দাম অপেক্ষা বেশি।

যদি চাহিদা ও যোগানের বৃদ্ধি সমান হয় তবে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু ভারসাম্যের দাম সমানই থাকিবে। নীচের চিত্রে ইহা



দেখা যাইতেছে। ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া OM হইতে OM' হইয়াছে। দাম কিন্তু সমানই আছে MP=M'P'. এই অবস্থায় ভারসাম্যের দাম সমানই রহিল কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় পরিমাণের নূতন বিন্দুতে চাহিদা ও যোগানে সমতা আসিবে।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যেখানে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা নিজে দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না এবং বাজারে একটি দামই বিরাজ করে, সেইখানে এই দাম বাজার-যোগান ও বাজার চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে উহাদের সমতার বিন্দুতে স্থির হয়। প্রতি মুহূর্তে বাজারে যোগান ও চাহিদা আপনা-আপনি নিজেদের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু বাজারে যোগান ও চাহিদা নির্ধারণকারী কোনো না কোনো বিষয়ে অবিরাম পরিবর্তন ঘটে, তাই ভারসাম্যের দামও সর্বদা নূতন নূতন

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় এই রূপেই দাম স্থির হয়

বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। দামে উঠানামার অন্তরালে গভীরে তাকাইলে দেখা যায় প্রতিটি বিন্দুতেই নূতন হইলেও তৎক্ষণাৎ যে-দাম প্রচলিত উহাই সেই মুহূর্তের ভারসাম্যের দাম, অতি অল্পক্ষণের জন্য হইলেও সেই দামেই যোগান ও চাহিদার ক্ষণকালীন সমতা ঘটিয়া যাইতেছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার চক্ষুর অন্তরালে হইলেও, তাহাদেরই ব্যক্তিগত লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা বাজার-চাহিদা ও বাজার-যোগানের রূপ লইয়া কোনো একটি দ্রব্যের বাজারে সর্বক্ষণ ভারসাম্যের দাম বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

ভারসাম্যের দামে অপসরণের গতিপথ : কালবিশ্লেষণ (The process of shift in Equilibrium Price : Analysis of Time element in Pricing) :

আমরা দেখিয়াছি, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে ভারসাম্যের দাম স্থির হয়। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, যদি ইহাদের পরিবর্তন হয় তবে দামেও পরিবর্তন আসিবে, নূতন ভারসাম্যের দাম প্রতিষ্ঠিত হইবে। যেমন, যোগান স্থির অবস্থায় যদি চাহিদা বাড়ে, তবে নূতন বিন্দুতে বর্ধিত দামে এক নূতন ভারসাম্য দেখা দিবে। ইহাই সাধারণ সূত্র। কিন্তু

সময় বিশ্লেষণের গুরুত্ব

পুরানো দাম হইতে নূতন দাম পর্যন্ত যে পথ অতিবাহিত হইবে সেই ভারসাম্যের গতি-পথ (Equilibrium Path) সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। চাহিদা বাড়িলে বিক্রেতারা দাম বাড়াইয়া দিল, সেই নূতন দামে যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য হইল। কিন্তু ঘটনার স্রোত এই পর্যন্ত আসিয়া স্তব্ধ হইয়া যায় না। সকল বিক্রেতা তখন পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম পাইতেছে, সুতরাং এই দাম বৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগান বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। উপরন্তু, একই শিল্পে স্বাভাবিক মুনাফার তুলনায় বেশি মুনাফা পাওয়া যাইতেছে, তাই নূতন নূতন ফার্মও সেই শিল্পে প্রবেশ করিতে থাকিবে। এইরূপে যোগান-রেখা অস্থির হইয়া উঠিবে, যোগানের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা ডানদিকে সরিতে থাকিবে। ফার্মগুলির কলকারখানা, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি ও উপাদানের মালিকদের সঙ্গে চুক্তি প্রভৃতি সবই বদলাইতে হইবে। এই সকল কাজে কিছুটা সময় অতিবাহিত হইতে থাকিবে। সুতরাং, সময়-বিশ্লেষণ না করিলে ভারসাম্যের দাম সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

এই কারণে চাহিদার স্থায়ী পরিবর্তন হইলে যোগানে কোন পথে এবং কিরূপে পরিবর্তন আসে তাহা আলোচনা করা দরকার। চাহিদার পরিবর্তন হয় নিজস্ব কোনো কারণে। ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ, আয় বা পরিকল্পিত ব্যয়, অন্যান্য দ্রব্যের দাম প্রভৃতি বদলাইলে চাহিদায় স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন কিন্তু যোগানে পরিবর্তনের ফল নয় —যোগানে পরিবর্তনের ফলে কালক্রমে চাহিদায় পরিবর্তন হয় না। বরং চাহিদায় পরিবর্তন প্রথমে ভারসাম্য হইতে দামকে বিচ্যুত করে, এবং তখনই ফার্মগুলি উৎপাদনের টেকনিকাল বিষয় বদলাইতে শুরু করে। চাহিদায় পরিবর্তন স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে মোটামুটি সমানই, পৃথক হওয়ার কোনো কারণ নাই। চাহিদা একবার নিজের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, তাহাতে দাম বাড়িয়া গিয়াছে। এখন কথা হইল যোগান এই নূতন অবস্থায় নিজেকে বদলাইবে কি না, অথবা কিরূপে বদলাইবে। কিছুটা সময় পাইলে ফার্মগুলি উৎপাদনের খুঁটিনাটি দিক যথাযথ পরিবর্তন করিয়া নূতন চাহিদা ও দামের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করে। তাই যোগানের ক্ষেত্রে কালক্রমে দাম পরিবর্তনের প্রভাব কি দাঁড়াইবে তাহা জানা দরকার।

যোগানের পরিবর্তনের প্রকৃতি সময়ের উপর নির্ভরশীল

দাম নিরূপণ তত্ত্বে কাল-বিশ্লেষণের আরও তাৎপর্য আছে। দাম নিরূপণের ক্ষেত্রে চাহিদা বা যোগান কে প্রধান শক্তি, কাহার প্রভাব অপরের তুলনায় অধিক, ইহা লইয়া ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে এককালে বিতর্কের অন্ত ছিল না। অ্যাডাম্ স্মিথ, রিকাডো প্রমুখ ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ বলিতেন যে, দ্রব্যটির উৎপাদন-ব্যয়ই উহার দাম নির্ধারণ করে। জুতাজোড়ার দাম 15 টাকা কারণ উহা তৈয়ারীর খরচ হইল 15টি টাকা। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা আরও একটু গভীর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মতে এই 15টি টাকার পিছনে আছে শ্রমিকদের দুঃখকষ্ট, ভোগ হইতে বিরত থাকার জন্য পুঁজিপতির মানসিক যন্ত্রণাবোধক এবং মালিকদের ত্যাগ। দ্রব্যোৎপাদনের এই সকল প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ হইল টাকার হিসাবে 15 এবং উহাই হইবে সেই দ্রব্যটির দাম। ঠিক বিপরীত ধরনের যুক্তি উপস্থিত করিতেন মেঙ্গার, ওয়ালরাস, জেভনস্ প্রমুখ ধনবিজ্ঞানী। তাঁহাদের মতে দাম কখনও উৎপাদন-ব্যয়ের উপর নির্ভর করে না, ইহা নির্ধারিত হয় প্রান্তিক উপযোগিতা দ্বারা। ইহার অনেক কারণ তাঁহারা দর্শাইয়াছিলেন; (ক) ক্রেতারা যদি দাম দিতে না রাজি থাকে

তবে উৎপাদন-ব্যয় কত হইল তাহাতে কিছু আসে যায় না। উৎপাদক যদি 20 টাকা ব্যয় করে, কিন্তু ক্রেতারা যদি 15 টাকার বেশি দিতে না চায়, তবে দাম 15 টাকার বেশি হইতে পারে না। (খ) ব্যয় নির্ভর করে দামের উপর কিন্তু দাম ব্যয়ের উপর নয়। দাম বেশি পাইলে বেশি ব্যয় করা চলে। দাম কম পাওয়ার আশঙ্কা থাকিলে উৎপাদক বেশি ব্যয় করে না। (গ) কতকগুলি দ্রব্য আছে, যেমন দুষ্প্রাপ্য ছবি, বই প্রভৃতি, ইহাদের উৎপাদন-ব্যয় হিসাব করা যায় না। ক্রেতাদের প্রান্তিক উপযোগিতা অনুযায়ী ইহাদের দাম স্থির হয়। অধ্যাপক মার্শাল সর্বপ্রথম নিরূপণ-তত্ত্ব সময়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন যে, এই তর্ক সঠিক নহে, উভয়ের পারস্পরিক প্রভাবের ফলেই দাম নিরূপিত হইয়া থাকে। তবে স্বল্পকালীন দামের উপর চাহিদার প্রভাব বেশি, দীর্ঘকালীন দামের উপর যোগানের প্রভাব অধিকতর। কাঁচির একটি দিক বেশি নড়িতেছে বলিয়া শুধুমাত্র সেই দিকের প্রভাবেই কাটার কাজ চলে তাহা নয়, অন্য দিকের প্রভাবও দরকার। কাহার প্রভাব কখন বেশি ইহা বুঝিবার জন্যই সময় অনুযায়ী বিশ্লেষণ আবশ্যক।

চাহিদা ও যোগান কে প্রধান শক্তি তাহা সময়ের উপর নির্ভর করে

চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে যোগানে পরিবর্তন হইয়া পুনরায় ভারসাম্যে পৌঁছিবার মোট সময়কে মার্শাল তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি সময়াংশের মধ্যে তৎকালীন ভারসাম্যের দাম নির্ধারণে কোন শক্তি তুলনামূলক ভাবে অধিকতর প্রভাবশীল তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মার্শাল কর্তৃক বাজারের কাল-বিশ্লেষণের শ্রেণীবিভাগ হইল: (ক) অত্যল্প-কাল বা বাজারসময় (Extremely short period or market period): (খ) স্বল্পকাল (Short period), এবং (গ) দীর্ঘকাল (Long period)।*

* "We might as reasonably dispute whether it is the upper or under-blade of a pair of scissors that cuts a piece of paper, as whether value is governed by utility or cost or production. It is true that when one blade is held still, and cutting is effected by moving the other, we may say with careless brevity that the cutting is done by the second ; but the statement is not strictly accurate, and is to be excused only so long as it claims to be merely a popular and not a scientific account of what happens."............................ ....'as a general rule the share of attention which is given to the influence of demand on value and the longer the period, the mere important will be the infiuence of cost of production on value' For the

বাজার-দর : স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম : দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম (Market Price : Shortrun normal price : Long-run Normal Price)

বাজার দর : যোগান স্থির, তাই চাহিদাই একমাত্র প্রভাবশীল (Market Price : As Supply is fixed influence of demand is dominant)

কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, চাহিদা ও যোগানের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত শেষ হওয়ার পরে, দ্রব্যের বাজারে যে দামে উহাদের ভারসাম্য ঘটিয়াছে তাহাই বাজার দর। কোনো এক দিনের, বা কোনো এক ঘণ্টার মধ্যে চাহিদা ও যোগান যে দামে সমান হইয়া পড়ে, তাহাকেই আমরা বাজার-দর বলি। দামের উপর চাহিদা ও যোগানের সকল প্রভাব নিঃশেষ হইবার পরে বাজারে এই দাম দেখা দেয়। পরের দিন বা পরের ঘণ্টায় চাহিদা ও যোগান ভিন্নরূপ হইতে পারে। সদাপরিবর্তনশীল নানা প্রভাবে চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তন আসিতে পারে, তাই প্রতিদিনই বা প্রতি ঘণ্টাতেই এই বাজার দর পৃথক হইতে পারে। একটি মুহূর্তে সেই সময়ের বিন্দুতে চাহিদা ও যোগানে যে দামে সমতা ঘটিয়া যাইতেছে, তাহাকেই আমরা বাজার দর বলি।

অত্যল্পকালের মধ্যে এই দাম স্থির থাকে, ইহা তাই অত্যল্পকালীন দাম। অত্যল্পকাল বা বাজার-কাল (very short period oi market pericd) বলিলে বোঝা যায় বিক্রেতার হাতে যাহা আছে, তাহাই যোগান। চাহিদা বাড়িলে এই সময়ের মধ্যে যোগান মোটেই বাড়ানো যায় না। ফার্মগুলির হাতে দ্রব্যের যে পরিমাণ আছে, এই কালের মধ্যে তাহাই যোগান। এই বাজার-কাল এক ঘণ্টা, একদিন, এক সপ্তাহ হইতে পারে; তাহা নির্ভর করে দ্রব্যটির প্রকৃতির উপর। পচনশীল দ্রব্যের বাজার-কাল হয়ত একটি দিন, বস্ত্র দ্রব্যের বাজার-কাল হয়ত কয়েক সপ্তাহ, ইস্পাতের বাজার-কাল হয়ত কয়েক মাস।

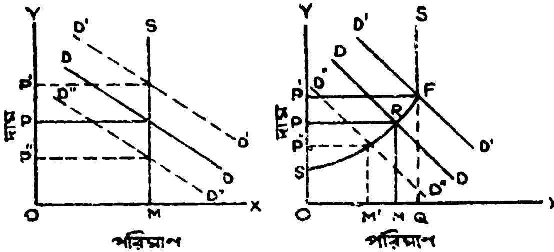
অত্যল্পকাল ও বাজার কাল কাহাকে বলে

বাজার-কালের যোগান রেখা কিরূপ আকারের হইবে? এই বিষয়ে

influence of changes in cost of production takes as a rule a longer time to work itself out than does the influence of changes in demand. The actual value at any time, the market value as it is often called, is often more influenced by passing events and by causes whose action is fitful and short-lived than by those wh ch work persistently. But in long periods these fitful and irregnlar causes in large measure efface one another's influence; so that in the long run persistent causes dominated value completely." Marshall. *Principles*. P. 348—50.

দুই ধরনের দ্রব্যের কথা আমরা চিন্তা করিতে পারি: একটি পচনশীল দ্রব্য (perishable good), অপরটি অপচনশীল দ্রব্য (non-perishable goods) যাহাদের কিছুকালের জন্য হইলেও মজুত করিয়া রাখা চলে। পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে, যেমন মাছের বাজারে, যোগান হইল সেইদিন সকালে বাজারে যাহা হাজির হইয়াছে।* উহাকে পরের দিনের জন্য মজুত করিয়া রাখা চলে না; এবং ফলে সেইদিনই, যে-দামেই হউক না কেন, উহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। এই অবস্থায় নীচের বামদিকের চিত্রে আমরা দেখি মাছের যোগান রেখা MS দামের অক্ষ OY-এর সমান্তরাল, একেবারে খাড়া একটি সরল রেখা। সেইদিন মাছের যোগান OM, চাহিদা রেখা DD.

দুই ধরনের দ্রব্যের দুইরূপ যোগান রেখা



বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকায় ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে দরকষাকষির (bargaining) দরুণ OP দাম দেখা দিয়াছে, এই দামে যোগান ও চাহিদা সমান। এখন মনে কর, হঠাৎ চাহিদা বাড়িয়া DD হইতে D_1D_1 হইল। মাছের যোগান সমানই আছে, ফলে বর্ধিত চাহিদা বাজারদরকে ঠেলিয়া OP হইতে OP_1 করিয়া দিল। দাম ওই পর্যন্ত উঠিবে কেন? কারণ, দাম ওই পর্যন্ত উঠিলে তবেই সেইদিনের সকল যোগান বিক্রয় হইয়া যাইবে, দাম উহাপেক্ষা বাড়িতে পারে না। উহার তুলনায় দাম বেশি থাকিলে কিছুটা মাছ অবিক্রীত থাকিবে। কিন্তু পচনশীল দ্রব্য বলিয়া বিক্রেতারা ততদূর দাম তুলিবে না। দাম উহার নীচেও থাকিবে না, কারণ ক্রেতারা সকলে মিলিয়া মোট OM যোগানের জন্য

1. যাহাদের মজুত করা চলে না

* বরফ দিয়া মাছ মজুত করার সম্ভাবনা ধরা হইতেছে না।

OP_2 পর্যন্ত দাম দিতে প্রস্তুত। দাম কম থাকিলে বেশি দাম হাঁকিয়া তাহারা OP_1 পর্যন্ত দাম তুলিয়া দিবে (bid up the price)।

অপচনশীল দ্রব্য, বা যাহাদের মজুত করিয়া রাখা যায় তাহাদের ক্ষেত্রে যোগান রেখা বামদিকের চিত্রের ন্যায় আগাগোড়া খাড়া X অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা হইতে পারে না। কারণ ওই দ্রব্য কিছুকালের জন্য মজুত করিয়া রাখা যায়, বিক্রয় না করিয়া হাতে ধরিয়া রাখা যায় এবং পরের দিনের বাজারে বা পরবর্তী বাজার-কালে উহাকে বিক্রয়ের চেষ্টা করা সম্ভব। এই অবস্থায় দুইটি চরম দামের কথা (critical prices) আমরা চিন্তা করিতে পারি। দাম যদি খুব বেশি হয় বিক্রেতা তাহার সম্পূর্ণ যোগান বিক্রয় করিয়া দিতে পারে; আবার দাম যদি খুব কম হয়, তবে বিক্রেতা মোটেই বিক্রয় করিবে না। তাহার সমস্ত যোগান-ই সে মজুত করিয়া ভবিষ্যৎ বাজার-কালের জন্য অপেক্ষা করিবে। যে-দামের নীচে বিক্রেতা বিক্রয় করিতে একেবারে নারাজ, তাহাকে বলে রিজার্ভ দাম (reserve price)। কোনো বিক্রেতার রিজার্ভ দাম কি হইবে তাহা নানা বিষয়ের উপর নিভর করে। যেমন (i) ভবিষ্যতের বাজার-কাল দ্রব্যটির দাম কি হইতে পারে সেই সম্পর্কে বিক্রেতার ধারণা। ভবিষ্যৎ দাম বেশি হইবে ধরিয়া লইলে বিক্রেতার রিজার্ভ-দাম বর্তমানে বেশি। (ii) বিক্রেতার নগদ টাকার প্রয়োজন। টাকার দরকার বেশি হইলে রিজার্ভ-দাম কম। (iii) দ্রব্যের যোগান মজুত করিয়া রাখার খরচা, বরফের দাম, গুদামভাড়া, হিমঘরের চার্জ, প্রভৃতি। (iv) দ্রব্যটির ভবিষ্যৎ উৎপাদন ব্যয়। বিক্রেতা যদি বোঝে যে ভবিষ্যতে দ্রব্যটির উৎপাদনব্যয় কম হইবে, তবে সে জমাইয়া না-রাখিয়া এখনই বিক্রয় করিবে। (v) দ্রব্যটির স্থায়িত্ব। দীর্ঘ-স্থায়িত্বশীল দ্রব্য হইলে রিজার্ভ-দাম বেশি। (vi) দ্রব্যটির উৎপাদনব্যয়। উৎপাদন ব্যয় বেশি হইলে অনেক বিক্রেতা অন্তত সেই ব্যয়টুকু তুলিয়া আনার জন্য সেই পরিমাণ রিজার্ভ দাম ধার্য করিবে।

2. যাহাদের মজুত করা চলে

এই দুইটি চরম দামের মধ্যে—অর্থাৎ একদিকে উচ্চতম দাম, যে-দামে সে যোগানের সবটাই ছাড়িয়া দিতে রাজি, আবার অপরদিকে রিজার্ভ দাম যাহার নীচে সে যোগানের সবটাই মজুত করিতে ইচ্ছুক—সে কতটা যোগান দিবে তাহা দামের উপর নির্ভরশীল, দামেরই সহিত তাহা উঠানামা করিবে। বেশি দামে সে বেশি যোগান দিবে, কম দামে সে কম যোগান দিবে। উপরের

ডানদিকের চিত্রে দেখা যায় তাহার যোগানরেখা একটু ডাহিনে সরিতেছে এবং উপরের দিকে উঠিতেছে। তাহার যোগান রেখা হইল SRFS, তাহার হাতে যোগান OQ,OP' হইল উচ্চতম চরম দাম, ওই দামে সে সবটাই বিক্রয় করিবে। OS দামে সে কিছুই বিক্রয় করে না, সবটাই ধরিয়া রাখে। যোগান রেখার SF অংশ উর্ধ্বমুখী ও ডাহিনে সরিতেছে, অর্থাৎ দাম বাড়িলে যোগানও বাড়িতেছে। চাহিদা রেখা DD, D´D´ ও D"D" অনুযায়ী দাম স্থির হইতেছে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যটি সমজাতীয় (homogeneous) বলিয়া কোন ক্রেতার মনে কোনো বিক্রেতার জন্য কোনো পক্ষপাতিত্ব নাই, তাই বাজারের দর একটিই থাকিবে। সমগ্র চাহিদা ও সমগ্র যোগানের ফলে একবার এই দর দাঁড়াইয়া গেলে ব্যক্তিগত ভাবে বা একক কোনো বিক্রেতা এই দরকে গ্রহণ করিয়া নিজের দ্রব্য বিক্রয় করা বা না-করার কথা চিন্তা করিবে। এই দাম তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, ইহাকে নড়াইবার কোন ক্ষমতা তাহার নাই। অন্তত সেইরূপ সে চিন্তা করে না। ফলে সমগ্র বাজার-চাহিদা রেখা ডান দিকে নামিতে থাকিলেও, তাহার সম্মুখে সে উহাকে OX-এর সমান্তরাল সরলরেখার আকারে দেখিতে পায়। চলতি বাজার দরে সে যত খুশি বিক্রয় করুক, দাম কমিয়া আসার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। ফলে তাহার মোট যোগান বিক্রয়ের জন্য দাম কমাইতে হয় না, যদিও বাজার দর-অপেক্ষা তাহার রিজার্ভ দাম হয়ত অনেক কম। বাজার-দর অপেক্ষা রিজার্ভ দাম বেশি থাকিলে সে কিছুই বিক্রয় করিতে পারে না।

বাজারে একটি দামই বজায় থাকে

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় বাজার-দরের নির্ধারণে উৎপাদন-ব্যয়ের কোনো প্রভাব নাই বলিলেই চলে। বিক্রেতারা উৎপাদন ব্যয়ের কথা ভাবে না। যেমন, আজিকার বাজার-দর তাহার উৎপাদন ব্যয় হইতে কম, কিন্তু সে যদি মনে করে আগামীকাল দর আরও কমিবে, তবে সে আজই তাহার মোট যোগান বর্তমানের দরে, অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম দরেই বিক্রয় করিবে। আবার কাল দাম বাড়িবে ভাবিলে আজ উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বেশি পাইলেও আজ সে বিক্রয় করিবে না। দামের উপর উৎপাদন ব্যয়ের প্রভাব তখনই পড়ে যখন সে উৎপাদনের পরিমাণ পাল্টাইতে অগ্রসর

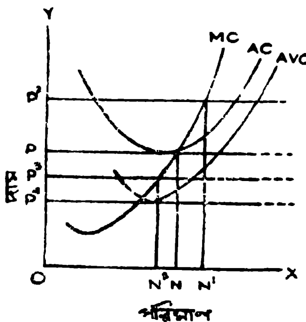
বাজার দরের উপর উৎপাদনের ব্যয়ের কোন প্রভাব নাই

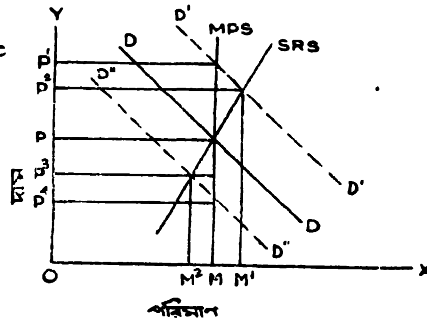
হয়। তাই উৎপাদন ব্যয়ের প্রভাব পড়ে স্বল্পকালে এবং দীর্ঘকালে। অত্যল্পকাল বা বাজারকালে যোগান সীমাবদ্ধ, উৎপাদন বাড়ান বা কমান-র প্রশ্ন নাই, তখন উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাস বিক্রেতার বিচার্যের বিষয় নয়।

স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম: চাহিদা ও যোগানের মধ্যে চাহিদার প্রভাব অধিকতর (Shortrun normal price: relatively greater influencc of demand)

দামের তত্ত্ব আলোচনার সময়ে স্বল্পকাল বলিলে বোঝা যায় যে সময়টুকুর মধ্যে চাহিদার সহিত যোগানের পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটার সময় নাই। এইরূপ সামঞ্জস্য ঘটা সম্ভব যদি চাহিদা বৃদ্ধির পরে উৎপাদনের উপকরণগুলির সেই শিল্পে প্রবেশের উপযোগী সময় থাকে; অথবা চাহিদা হ্রাসের দরুণ উহারা সেই শিল্প হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার মত সময় পায়। স্বল্পকালে চল্‌তি যন্ত্রপাতি লইয়াই উৎপাদন সংগঠিত করিতে হইবে। চাহিদা বাড়িলে উহারা অধিক সময় খাটিবে আবার চাহিদা কমিলে উহারা বেকার বসিয়া থাকিবে।

স্বল্পকালে কোনো ফার্ম ভারসাম্যে থাকে যে পরিমাণ উৎপাদনে তাহার MC দামের সমান। স্বল্পকালে স্থির ব্যয়ের কথা চিন্তা করা হয় না, উহার কথা বাদ দিয়াই উৎপাদন বাড়ান বা কমান-র সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। উৎপাদন করা হইবে কি হইবে না সেই বিষয়ে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ই (AVC) প্রধান বিবেচ্য, গড ব্যয় (AC) নহে। দাম যদি AVC-র নিম্নতম বিন্দু হইতে কমিয়া যায়, তবে স্বল্পকালেও ক্ষতির পরিমাণ নিম্নতম রাখার উদ্দেশ্যে ফার্ম উৎপাদন স্থগিত রাখিতে পারে। সুতরাং স্বল্পকালে ফার্মের AVC-র নিম্নতম বিন্দুই দামের সর্বনিম্ন সীমা, ইহার নীচে নামিলে উৎপাদন হইবে না। ফার্মগুলির





স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখাগুলিকে (SMC) পাশাপাশি যোগ করিয়া শিল্পের স্বল্পকালীন যোগানরেখা পাওয়া যায়। শিল্পের যোগান রেখা তাই ফার্মগুলির

AVC রেখার নিম্নতম বিন্দুর ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। ফার্মগুলির SMC রেখাগুলি ঊর্ধ্বমুখী বলিয়া উহাদের যোগফল অর্থাৎ শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান রেখাটিও ঊর্ধ্বমুখী। পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রে ইহাদের দেখা যাইতেছে :

শিল্পের দ্রব্যটির জন্য DD চাহিদা রেখা, উহা ডাহিনে নামিতেছে। বাজার-কালের যোগান রেখা ছিল MPS, শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান রেখা SRS। চাহিদা DD হইতে বাড়িয়া D'D' হইলে বাজার দর OP হইতে বাড়িয়া হয় OP^1, কারণ অত্যল্পকাল বা বাজার-কালের মধ্যে যোগান সমানই আছে। এই দাম পাইয়া এবং চাহিদা বেশি থাকায় ফার্মেরা তাহাদের পুরাতন স্থির যন্ত্রপাতি ও মূলধনী উপাদানগুলিকে আরও বেশি খাটাইয়া এবং পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইতে সুরু করিল। স্বল্পকালে পুরাতন ফার্মেরা যেমন স্থির উপাদান বদলাইতে পারে না, নূতন ফার্মও সেই শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে না। দ্রব্যটির যোগান তাই কিছুটা পরিমাণে বাড়িল। স্বল্পকালীন দামও কমিয়া OP^2 হইল, এই দামে নূতন চাহিদা রেখা D'D' স্বল্পকালীন যোগান রেখা SRS-কে স্পর্শ করে। এই OP^2 হইল স্বল্পকালীন দাম, ইহা পুরাতন দাম OP হইতে বেশি, কিন্তু অত্যল্পকালে যে উচ্চ দর দেখা গিয়াছিল সেই OP^1 হইতে কম। দ্রব্যের যোগানও বাড়িয়াছে, OM হইতে OM^2 হইয়াছে। তাই আমরা বলিতে পারি যে অত্যল্পকাল বা বাজার-কালের তুলনায় স্বল্পকালে যোগান বাড়ে এবং দাম কমে।

চাহিদা রেখা D'D' ধরিয়া লইলে দ্রব্যটির বাজারে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম হইল OP^2, প্রতিটি ফার্ম এই দামকে নির্দিষ্ট ও স্থির ধরিয়া লয় এবং নিজের উৎপাদনের পরিমাণে এমনভাবে সামঞ্জস্য ঘটায় যেখানে Price = MC. উপরের বামদিকের চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে OP^2 দামে ফার্মটি স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা করিতেছে, কারণ OP^2 তাহার AC অপেক্ষা অনেক বেশি। স্বল্পকালে ফার্মের ভারসাম্যের উৎপাদন হইল ON^1.

আবার বিপরীত পক্ষে যদি দ্রব্যটির বাজারে চাহিদা DD হইতে D D''-তে নামিয়া যায়, তবে বাজার দর ভয়ানকভাবে কমিয়া OP হইতে OP^4 হইবে। বাজার দর এত কম দেখিয়া ফার্মেরা উৎপাদন সঙ্কুচিত করিবে, পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির উপর ব্যয় কমাইয়া দিবে এবং এইভাবে বাজারে যোগান হ্রাস পাইবে। স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম হইবে OP^3, এই দামে স্বল্পকালীন যোগান রেখা SRS নূতন চাহিদা রেখা D''D''-কে স্পর্শ করে। বাজার দর OP^4 অপেক্ষা স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দর OP^3 একটু বেশি হইবে, কিন্তু পুরাতন

বাজার দর OP অপেক্ষা কম হইবে। ফার্মেরা এমনভাবে উৎপাদন সংগঠন পরিবর্তন করিবে যেখানে OP^3 দাম তাহাদের MC-র সমান হয়। দেখা যাইতেছে যে OP^3 দামে ফার্মগুলির ক্ষতি হইতেছে। দাম OP^4-এর নীচে কখনই যাইতে পারে না, কারণ তখন কোনো ফার্ম উৎপাদন করিবে না, তাহাদের যোগানও তখন শূন্য।

দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম : উৎপাদন ব্যয়ের প্রভাবই প্রধান (Long run Normal Price : the influence of cost of production dominant)

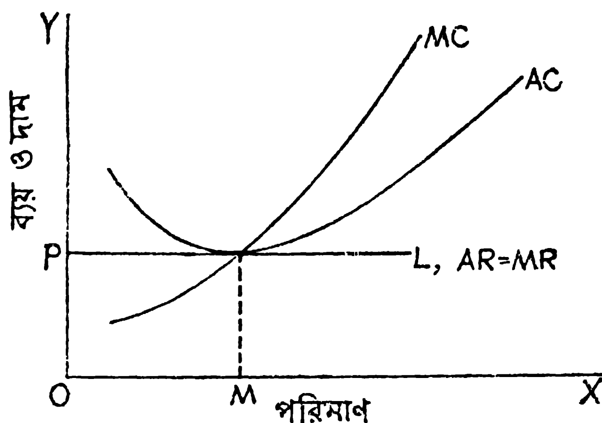
চাহিদা বা যোগানের যে কোন দিক হইতে হঠাৎ কোনো পরিবর্তন আসিলে বাজার দরে উঠানামা হইতে পারে। মাছের যোগান হঠাৎ বাড়িলে উহার বাজারে দাম নিশ্চয় নামিয়া যাইবে। হঠাৎ বেশি গরম পড়িলে বরফের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল হইল ক্ষণস্থায়ী প্রভাব এবং বাজার দরে ক্ষণস্থায়ী অস্থিরতা সৃষ্টি করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু গুরুত্ব ইহাদের নাই। এই সকল স্থিতিভঙ্গকারী বিষয়সমূহ না থাকিলে, অথবা, ইহাদের সকল প্রভাব মিটিয়া গেলে দ্রব্যটির বাজারে দাম কোনো একটি স্তরে স্থির হইয়া পড়ে। দামের এই স্তরটি সকল সময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো একটি স্তর নয়। কিন্তু উৎপাদনের পদ্ধতি এবং মাত্রা মোটামুটি সমান থাকিলে এই স্তরকে এমন একটি স্থির নোঙর বলিয়া মনে করা চলে যাহাকে ঘিরিয়া দৈনন্দিন উঠানামার সময়ে বাজার দর ঘোরাঘুরি করে। অ্যাডাম্ স্মিথ এই স্তরকে বলিয়াছেন, "প্রাকৃতিক দাম" (natural price) এবং মার্শাল বলিয়াছেন "স্বাভাবিক দাম" (normal price)। মার্শালের ভাষায় চলা চলে, "Normal or Natural Value of commodity is that which economic forces would tend to bring about in the long run."

মনে রাখা দরকার, "স্বাভাবিক দাম" আর "গড় দাম" সমান নয়। স্বাভাবিক দাম হইল যাহার চারিপাশে দৈনন্দিন দামগুলি উঠানামা করে, যে-স্তরে পৌছিতে তাহাদের অবিরাম চেষ্টা। আর গড় দাম হইল বাজারের বাস্তব দামগুলির গাণিতিক গড়।

দীর্ঘকালে স্বাভাবিক দামকে বলে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের দাম। এই ভারসাম্যের দাম কিরূপে দেখা দেয়? আমরা জানি অতাল্পকালে যোগানে কোনো পবিবর্তনই আনা যায় না। বিক্রেতার হাতে যে পরিমাণ দ্রব্য আছে তাহাই যোগান, আর পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে উহা ওই বাজার-কালের মধ্যেই

বিক্রয় করিতে হইবে। অত্যল্পকালে তাই উৎপাদন ব্যয়ের কোনো প্রভাবই দামের উপরে নাই। আবার স্বল্পকালে ফার্মগুলি কিছুটা পরিমাণে নিজেদের উৎপাদনের পরিমাণ বদলাইতে পারে। যদি চাহিদা বাড়ে, তবে পরিবর্তনীয় ব্যয় তাহারা বদল করে, এবং এমন পরিমাণে পৌছায় যেখানে তাহাদের MC দামের সমান হইয়া পড়ে। কিন্তু দীর্ঘকাল হইল এত বেশি সময় যাহার মধ্যে চাহিদার নূতন অবস্থার সঙ্গে যোগান নিজেকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইয়া লয়। দাম বাড়িলেই ইহা সুরু হয় না, ফার্মেরা যদি বোঝে যে দামের এই বৃদ্ধি দীর্ঘকালে স্থায়ী হইতে যাইতেছে তখন তাহারা উৎপাদনের স্থির উপাদানগুলিতে যথোপযুক্ত পরিবর্তন আনে, যন্ত্রপাতি ও কারখানার আয়তন পাল্টাইয়া উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। পুরাতন প্ল্যাণ্ট বাড়ায়, নূতন প্ল্যাণ্ট বসায়। তাহা ছাড়া, শিল্পে নূতন ফার্ম প্রবেশ করিয়া বাজারে দ্রব্যের যোগান বাড়াইয়া দেয়।

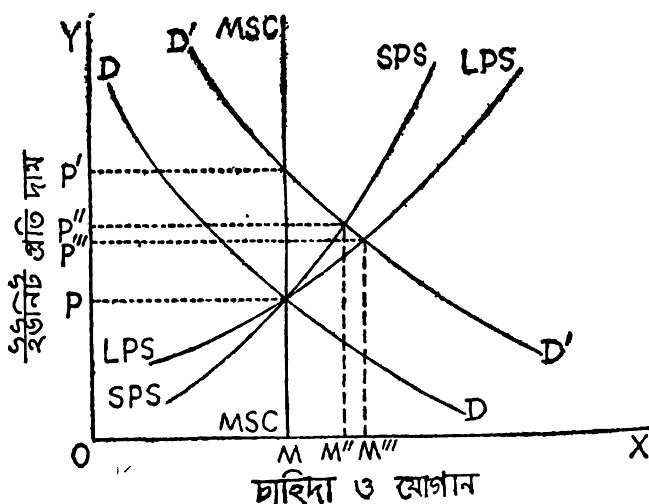
দীর্ঘকালে ফার্মের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বিশেষ গুরুত্বের বিষয় নয়, কারণ সকল উপাদানই পরিবর্তনীয় এবং কেহই স্থির নয়। এই সময়ের মধ্যে ফার্ম যে কোনো উপাদানের উপর যত কিছু ব্যয় করিয়াছে, সবই তাহাকে তুলিয়া লইতে হইবে, সকল শ্রেণীর ব্যয়ই দাম নির্ধারণ করে। দীর্ঘকালীন দাম তাই



দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের সমান (LAC) হইবে। অর্থাৎ Normal Price = LMC = LAC-র নিম্নতম বিন্দু। দাম LAC-র নিম্নতম বিন্দুর উর্ধ্বে থাকিলে ফার্মটি স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা করিতেছে। দীর্ঘ কালে নূতন ফার্ম প্রবেশ

করিয়া এমন প্রতিযোগিতা সুরু করিবে যে দাম নামিয়া আসিয়া এই বাড়্তি মুনাফা সরাইয়া দিবে এবং স্বাভাবিক মুনাফা সহ LAC-র নিম্নতম বিন্দুর সমান হইবে। আবার দাম LAC-র নিম্নতম বিন্দুর নিম্নে থাকিলে ফার্মেরা স্বাভাবিক মুনাফা পাইতেছে না, কোনো কোনো ফার্ম অন্যান্য শিল্পে চলিয়া যাইতে সুরু করিবে। শিল্পে যোগান হ্রাস পাইবে, দাম বৃদ্ধি পাইবে, ক্রমে LAC-র নিম্নতম বিন্দুতে পৌছাইবে। এইরূপে দার্ঘকালে, ফার্মগুলি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা আয় করে।

দ্রব্যের দাম LAC-র নিম্নতম বিন্দুব উপরে বা নীচে থাকিলে প্রধানত শিল্পে ভারসাম্য আসে নূতন ফার্মের অনুপ্রবেশ বা বর্তমান ফার্মের বহির্গমন দ্বারা। বাজারে যোগানে পরিবর্তনের এই পালা ততক্ষণ চলে যতক্ষণ না-পর্যন্ত দাম নিম্নতম গড় ব্যয়ের সমান হয়। কিন্তু সকল পরিবর্তনের আঘাত পাইয়া নূতন যে দামটি দাঁড়াইল উহা পূর্বের ভারসাম্যের দাম অপেক্ষা কম বা বেশি হইবে অথবা সমান থাকিবে, তাহা নির্ভর করে শিল্পটি ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের শিল্প, ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের শিল্প অথবা সমব্যয়ের শিল্প উহার উপরে।



নীচের চিত্রে দেখা যাইতেছে ফার্মগুলি তাহাদের দীর্ঘকালীন গড়ব্যয়ের নিম্নতম বিন্দুতে অবস্থান করিতেছে।

আমরা একে একে এই তিনটি অবস্থা আলোচনা করিব। উপরের চিত্রে

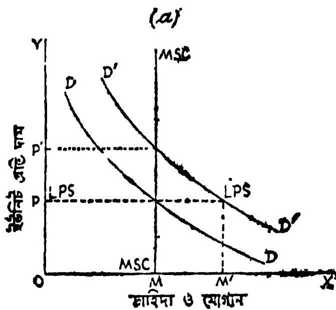
দীর্ঘকালীন LPS রেখা হইতে দেখা যাইতেছে যে যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে। দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম OP″, ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের শিল্প বলিয়া সকল ফার্মের প্রান্তিক ও গড় ব্যয়ই বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে যোগান বৃদ্ধি সত্ত্বেও উহা আর পূর্বের অবস্থায় (OP দাম) ফিরিয়া আসিতে পারিল না। উহাপেক্ষা বেশিই রহিয়া গেল।

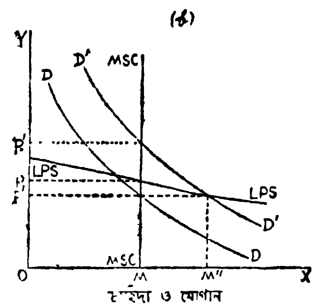
ক্রমবর্ধমান ব্যয় ও স্বাভাবিক দাম

আবার যদি শিল্পের সমহার প্রতিদানের নীতি কার্যকরী থাকে তাহা হইলে দীর্ঘকালেও উৎপাদন-ব্যয় সমান থাকিবে; দামও পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অবস্থাতে থাকিবে; শুধু যোগান বৃদ্ধি পাইবে, ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে। নীচের (a) চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

সমহার প্রতিদান ও স্বাভাবিক দাম

প্রথমে ভারসাম্যের দাম ছিল OP, চাহিদা বৃদ্ধির দরুন দাম বাড়িয়া হইল OP′. প্রথম অবস্থায় বাজার যোগান ছিল OM. দীর্ঘকালে যোগান-রেখা হইল ভূ-সমান্তরাল LPS রেখা। এখন বিক্রয় হইতেছে OM′, দাম পূর্বের ন্যায় একই আছে।





উপরের (b) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে দীর্ঘকালে উৎপাদন বাড়াইলে শিল্পে প্রচুর বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচ দেখা দেয়, ফলে ফার্মগুলির দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় হ্রাস পাইতেছে। দীর্ঘকালীন যোগান রেখার (LPS) গতি হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে। স্বাভাবিক দাম হইল OP″, বিক্রয়ের পরিমাণ OM″; দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম OP″ পূর্বের দাম OP হইতে কম।

বিশুদ্ধ একচেটিয়া (Pure Monopoly)

একচেটিয়া কাহাকে বলে (What is Monopoly)

একচেটিয়া বাজার বলিলে বোঝা যায় যেখানে একা কোনো ফার্ম দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় করে, বাজারের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে, এবং দ্রব্যটি এমন যে উহার কোনো ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী থাকে না। একচেটিয়ার এই সংজ্ঞার মধ্যে দুইটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। প্রথমত একচেটিয়া থাকিতে হইলে উৎপাদনকারী ও বিক্রেতা হিসাবে একটি মাত্র ফার্ম থাকিবে। সেই ফার্মটির রূপ একক-মালিকানা, অংশীদারী বা যৌথমূলধনী কোম্পানী যাহা কিছু হইতে পারে, কয়েকটি ফার্মের মিলিত কার্টেল অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হইতে পারে। অনেক ফার্ম উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে উহা হয় পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটীয় প্রতিযোগিতায় পরিণত হইবে; আবার কয়েকটি ফার্ম থাকিলে বাজারে অলিগোপলি দেখা দিবে। একচেটিয়া বাজার থাকিতে হইলে তাই, ফার্ম একটিই থাকিতে হইবে, এই ফার্মকেই সমগ্র শিল্প বলা হইবে। সুতরাং ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য একচেটিয়ায় থাকে না। দ্বিতীয়ত, ফার্মটি যে দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে উহার কোনো ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য বা প্রতিযোগী-সামগ্রী নাই। অর্থাৎ বাজারে উহার সমজাতীয় দ্রব্য বা অতি অল্প পার্থক্য আছে এইরূপ কোনো দ্রব্য থাকিবে না। লক্ষ্মীবিলাস, জবাকুসুম, হিমরঞ্জন, কেশরঞ্জন, কোকোলা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী; কিন্তু জল বা বিদ্যুতের কোনো পরিবর্ত-দ্রব্য নাই। বাজারের এই অবস্থাকে আমরা পরস্পর-নির্ভরশীল স্থিতি-স্থাপকতার (cross-elasticity of demand) সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। একচেটিয়া বজায় থাকিতে হইলে ফার্মটির দ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ খুবই কম হইতে হইবে। উপরের এই বৈশিষ্ট্য দুইটির প্রধান ফল হইল, একচেটিয়া ফার্ম নিজের দ্রব্যের দাম নিজেই নির্ধারণ করিতে পারে। দামের উপর প্রভাব বিস্তার করাই একচেটিয়া ফার্মের মূল কথা।

একচেটিয়া ফার্মের বৈশিষ্ট্য কি কি

একচেটিয়া শিল্পে প্রবেশের বাধা (Barriers to Entry)

কোনো শিল্পে একচেটিয়া অবস্থা কেন বজায় আছে তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইলে সেখানে প্রবেশের পথের বাধাগুলি আমাদের জানা দরকার। দীর্ঘ-কালেও একচেটিয়া শিল্পটিতে ফার্মটি অস্বাভাবিক বেশি মুনাফা (supernormal

profits) লাভ করিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার ন্যায় শিল্পে নূতন নূতন প্রবেশ করিয়া ফার্মটি মুনাফার পরিমাণ কমাইয়া দেয় না। নূতন ফার্ম প্রবেশ করে না কেন? কারণ শিল্পে প্রবেশের পথে যে নানা ধরণের বাধা কাজ করিতে থাকে, তাহারা প্রতিযোগী ফার্ম গড়িয়া উঠিতে বাধা দেয়। এই সকল বাধা মোটামুটি দুই শ্রেণীর: অর্থনৈতিক ও প্রতিষ্ঠানগত।*

অর্থনৈতিক বাধাগুলি নানারূপে দেখা দেয়। কোনো শিল্পে একটি ফার্ম দ্বারা ক্রেতাদের চাহিদা ভালভাবে মেটান সম্ভব এবং সুবিধাজনক, দ্বিতীয় ফার্ম থাকিলে কাজকর্মে গণ্ডগোল হওয়ার কথা। যেমন টেলিফোন, ডাক ও তার, রেল, জল সরবরাহ. বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি। ইহাদের বলে স্বাভাবিক একচেটিয়া (natural monopolies)। সাধারণভাবে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে এই সকল বিষয় উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া থাকে। রাষ্ট্র হাতে রাখে, তাহাদের দাম, বণ্টন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার যাহাতে ইহারা একচেটিয়া অবস্থার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারে। আবার কতকগুলি শিল্প থাকে যেখানে চাহিদা এবং যোগানের অবস্থা এমন যে একটি মাত্র ফার্ম সমগ্র শিল্পকে যোগান দিতে সক্ষম। বাজারের আয়তন এত সংকীর্ণ যে একটি মাত্র ফার্মই হয়ত সর্বোত্তম মাত্রায় পৌছিতে পারে না। যতক্ষণ না-পর্যন্ত ফার্মটি সর্বোত্তম মাত্রায় পৌছিয়াছে ততক্ষণ সে ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অবস্থায় আছে, উৎপাদন আরও বাড়াইয়া উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে সে সক্ষম। ইহার কারণ বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনের দরুন ব্যয় সঙ্কোচের সুবিধা। কোনো শিল্পে এই ব্যয় সঙ্কোচের পরিমাণ যদি এত বেশি হয় যে বাজারে চাহিদার স্বল্পতার দরুণ একটির বেশি ফার্ম সর্বোত্তম মাত্রার ধারে কাছে পৌছাইতে না-পারে, তবে চল্‌তি ফার্মটির প্রতিযোগী কোনো ফার্ম সহজে শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে না। চল্‌তি ফার্মটি সর্বোত্তম মাত্রায় বা তাহার কাছাকাছি উৎপাদনের পরিমাণে অবস্থিত আছে, তাহার ইউনিট-প্রতি ব্যয় অনেকটা কম, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নূতন কোনো ফার্মকে উৎপাদন শুরু করিতে হইলে, স্বল্পমাত্রার দরুণ তুলনামূলকভাবে তাহার ফার্মের ইউনিট-প্রতি ব্যয় বেশি হইবে। ফলে বৃহৎমাত্রার ফার্মটির সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া তাহাকে সরিয়া যাইতে হইবে, এবং শিল্পটিতে একচেটিয়া বজায় থাকিবে।

* প্রবেশ-পথে এই সকল বাধার দরুন অনেক শিল্পে অলিগোপলি চলিতে থাকে, ফার্মের সংখ্যা বাড়িয়া পূর্ণপ্রতিযোগিতা দেখা দেয় না।

শিল্পে প্রবেশের পথে দ্বিতীয় বাধা প্রতিষ্ঠানগত। অনেক সময়ে কোনো ফার্ম কাঁচামালের উৎসের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এবং উহার ফলে অপর কেহ ওই কাঁচামাল ব্যবহারের সুযোগ পায় না। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো বিষয়ে পেটেণ্ট দেয় এবং ইহার ফলে নূতন ফার্মের প্রবেশের পথে আইনগত বাধার সৃষ্টি হয়।

একচেটিয়া বাজারে দাম-নিরূপণ বা একচেটিয়া ফার্মের ভারসাম্য (Pricing under Monopoly or Equilibrium of a monopolist Firm)

বাজারের একচেটিয়া অবস্থা বলিলে বুঝা যায় কোনো ফার্ম সমগ্র শিল্পের যোগান একা করায়ত্ত রাখিয়াছে। ফার্মটি কিন্তু দ্রব্যটির বাজার চাহিদা রেখাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। আমরা জানি বাজার চাহিদা রেখা গঠনকারী বিষয় হইল ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ, বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ে তাহাদের পরিকল্পিত ব্যয়, অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর দাম প্রভৃতি। এই সকল মিলিয়া ক্রেতার চাহিদা সৃষ্টি হয়। উহাদের উপর একচেটিয়া ফার্মের কোন ক্ষমতা নাই, তাই বিভিন্ন দামে দ্রব্যটির চাহিদা অর্থাৎ বাজার চাহিদা-রেখা হইতেছে একচেটিয়াদারের বিক্রয়ের সীমিত পরিবেশ, বলা যায় উহাই তাহার নির্দিষ্ট বিক্রয়-সম্ভাবনার পরিধি।*

চাহিদার উপর হাত নাই

সম্মুখের চাহিদা রেখা নির্দিষ্ট ধরিয়া লইয়া একচেটিয়া ফার্মটি তাই দ্রব্যের যোগান ও দাম স্থির করার চেষ্টা করে। ইউনিট-প্রতি বেশি দাম ধার্য করিয়া সে কম পরিমাণ যোগান ও বিক্রয় করিতে পারে, অথবা ইউনিট-প্রতি কম দাম ধার্য করিয়া সে বেশি পরিমাণে যোগান ও বিক্রয় করিতে পারে। আমরা ধরিয়া লইয়াছি সে সর্বাধিক নীট রেভিনিউ পাইতে চায়, ইহাই তাহার লক্ষ্য (objective), এই বিন্দুতে পৌঁছিলে সে ভারসাম্যে থাকিবে।

সে তাই যোগান ও দাম স্থির করিতে পারে

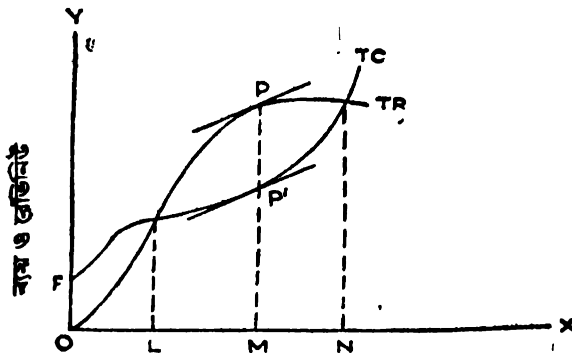
সর্বাধিক নীট একচেটিয়া রেভিনিউ কাহাকে বলে? কোনো এক দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফার্ম যে টাকা পায় তাহাকে বলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা মোট রেভিনিউ (Total sale-proceeds or Total Revenue)। সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে

* "The total demand for X, therefore, delimits the sales environment of the monopolist—it describes the whole range of sales plans that is open to him.

তাহাই ফার্মের মোট ব্যয়। মোট রেভিনিউ হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহাকে বলে নীট রেভিনিউ। একচেটিয়া ফার্ম এই নীট রেভিনিউ বাড়াইতে চায়। দাম বেশি ধার্য করিলে বিক্রয় হ্রাস পাইয়া তাহার মোট রেভিনিউ কমিয়া যাইতে পারে, অবশ্য কম উৎপাদন করিলে তাহার মোট ব্যয়ও কম হইবে। আবার কম দাম ধার্য করিলে বিক্রয় বাড়িয়া তাহার মোট রেভিনিউ বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু মোট ব্যয় এইক্ষেত্রে বেশি হইবে মনে করা চলে। সুতরাং ভুলত্রুটির মধ্য দিয়া একচেটিয়া ফার্মটি দাম লইয়া নানা পরীক্ষা (trial and error method) করিতে থাকিবে।

যে বিন্দুতে নীট রেভিনিউ সর্বাধিক

একচেটিয়া ফার্মটি কোন্ বিন্দুতে সর্বাধিক মুনাফা বা সর্বাধিক নীট রেভিনিউ পাইবে? ফার্মের ভারসাম্যের সাধারণ সূত্র আলোচনার সময়েই আমরা ইহা দেখিয়াছি তাহার সর্বাধিক মুনাফার বিন্দু দুই দিক হইতে খোঁজা যাইতে পারে: TR ও TC রেখা, এবং অথবা MR ও MC রেখা দ্বারা। TR ও TC দ্বারা দেখান যায়, যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে মোট রেভিনিউ রেখা এবং মোট ব্যয়-রেখার মধ্যে দূরত্ব সবচেয়ে বেশি, সেই বিন্দুতেই সে সবাধিক মুনাফা পাইতে থাকিবে। নীচের চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।



X-এর উৎপাদন ও বিক্রয়

TR হইল মোট রেভিনিউ রেখা। এক ইউনিট বেশি বিক্রয় করিতে হইলে উহার দাম কমাইতে হয় বলিয়া উহার আকৃতি এইরূপ। TC হইল মোট ব্যয়ের রেখা। OM পরিমাণ উৎপাদনে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য সর্বাধিক। PP_1 হইল মোট মুনাফার পরিমাণ বা একচেটিয়া ফার্মের নীট রেভিনিউ। TR রেখার P^1 বিন্দু এবং TC রেখার P^1 বিন্দুর ঢাল সমান।

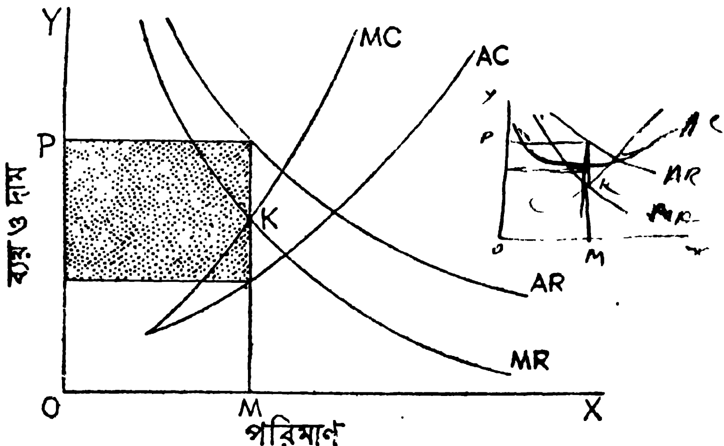
দুইটি পদ্ধতি, 1. TC ও TR রেখা দ্বারা

ঐ বিন্দু দুইটিতে দুইটি স্পর্শক পরস্পর সমান্তরাল। OM হইতে কম উৎপাদন করিলে, অর্থাৎ বামদিকের কোনো উৎপাদনের পরিমাণে মোট লাভ কম হইবে; আবার উহা হইতে বেশি উৎপাদন করিলে, অর্থাৎ M বিন্দুর ডান দিকে উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইলেও মোট মুনাফা হ্রাস পাইবে।

মার্শাল বলিয়াছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া একচেটিয়া ফার্মটি এমন একটি দাম খুঁজিয়া পাইবে যেখানে নীট রেভিনিউ সর্বাধিক। ফলে সে OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে, এই অবস্থায় তাহার নীট একচেটিয়া রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি।

দ্বিতীয়ত, এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া ফার্মটি তাহার দাম স্থির করে (trial & error method)—এই কথা না বলিয়া আমরা অন্য পদ্ধতিকে ফার্মটির নীট রেভিনিউ কোথায় সর্বাধিক হইবে তাহা বলিতে পারি। ফার্মের ভারসাম্যের তত্ত্ব হইতে আমরা জানি, যে-বিন্দুতে ফার্মটির MR = MC সেই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে তবেই নীট রেভিনিউ সর্বাধিক হইতে পারে। এক ইউনিট অধিক বিক্রয় করিয়া মোট রেভিনিউ-র যতটুকু বৃদ্ধি তাহাকে বলে প্রান্তিক রেভিনিউ এবং এক ইউনিট অধিক উৎপাদন করিলে মোট ব্যয়ের যে বৃদ্ধিটুকু তাহাকে বলে প্রান্তিক ব্যয়। যদি প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক রেভিনিউ হইতে কম থাকে তাহা হইলে সে উৎপাদন বাড়াইবে (কারণ ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশি)। ক্রমে তাহার প্রান্তিক ব্যয় বাড়িতে থাকিবে এবং প্রান্তিক

2. MC ও MR রেখা দ্বারা



রেভিনিউ কমিতে থাকিবে, অবশেষে ইহারা পরস্পরের সমান হইবে। ফার্মটি

উহাদের সংযোগস্থলে দাম স্থির করিবে এবং ঐ পরিমাণ উৎপাদন করিবে। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে দেখান হইয়াছে।

K বিন্দুতে MR=MC. ফার্মটি OP দামে OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে থাকিবে। যদি OM পরিমাণের কম অর্থাৎ M বিন্দুর বাম দিকে উৎপাদন ও বিক্রয় করে তবে দেখা যাইবে তাহার MC কম, কিন্তু MR বেশি। এই অবস্থায় সে ভারসাম্যে পৌছিতে পারে না কারণ আরও অধিক ইউনিট উৎপাদন করিতে থাকিলে তাহার নীট রেভিনিউর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদি সে OM পরিমাণের বেশি, অর্থাৎ M বিন্দুর ডান দিকে উৎপাদন ও বিক্রয় করে তবে দেখা যাইবে তাহার MR কম কিন্তু MC বেশি। এই অবস্থায় তাহার ভারসাম্য থাকিতে পারে না, কারণ প্রতি-ইউনিটে তাহার লোকসান ঘটিতেছে, উৎপাদনের পরিমাণ কমাইলে তাহার নীট রেভিনিউ বাড়িতে থাকে। একমাত্র K বিন্দুতে তাই ঐ ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য OP দামে OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় হইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। MR এবং MC কোন্ বিন্দুতে সমান হইবে তাহা নিভর করে MR রেখা এবং MC রেখার আকৃতির উপর অর্থাৎ চাহিদা এবং যোগানের অবস্থার উপর। চাহিদার দিকে প্রধান হইল চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং যোগানের দিকে প্রধান হইল যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic demand) হইলে MR রেখা অনেকটা চেটাল (flatter) হইবে, আর অস্থিতিস্থাপক (inelastic demand) হইলে উহা অনেকটা খাড়া (steeper) হইবে। তাই চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে কম দাম ধার্য করা চলে, কারণ দাম কমাইলে রেভিনিউ বাড়ে; আবার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে বেশি দাম ধার্য করা চলে, কারণ দাম বাড়াইলে রেভিনিউ বাড়ে। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে, দাম বাড়াইলে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় কিরূপ বাড়ে সেই গতির উপর। যোগান স্থিতিস্থাপক হইলে যোগান রেখা অধিক চেটাল MC তত দ্রুত বাড়ে না; যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলে যোগান রেখা অধিক খাড়া MC দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাই যোগান স্থিতিস্থাপক হইলে দাম কম হয় (উহা অনেকটা নিচে বা ডান দিকে MR রেখার সহিত মিলিত হয়; বেশি পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় হয়। আবার যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলে দাম বেশি হয় (উহা অনেকটা উপরে বা বাঁ দিকে MR রেখার সহিত মিলিত হয়), কম পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় হয়।

চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এই সকল রেখার আকৃতি নিরূপণ করে

আমরা এতক্ষণ স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করিয়া একচেটিয়া ফার্মের ভারসাম্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। উপরের এই বিশ্লেষণ উভয়কালের জন্যই সত্য। স্বল্পকালে একচেটিয়া ফার্মটিকে পরিবর্তনীয় ব্যয়ের দিকে বেশি নজর দিতে হয়। তাহার দাম যেন AVC-র নীচে কোনো মতে না যায়, সেখানে সে উৎপাদন বন্ধ করিবে। দীর্ঘকালে একচেটিয়া ফার্মটি চাহিদার চাপ অনুযায়ী উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তন করিতে পারে। দীর্ঘকালে উপকরণের পরিমাণ কি হইবে, কতটা স্থির ও কতটা পরিবর্তনীয় রাখা দরকার— সব কিছুতে সে এমনভাবে সামঞ্জস্য আনে যে তাহার প্রান্তিক রেভিনিউ কেবল স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান নয়, দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়েরও সমান হইয়া পড়ে। স্বল্পকালে সে চেষ্টা করে MR = SMC করিতে ; কিন্তু দীর্ঘকালে তাহার চেষ্টা হইল MR = LMC করা, যেখানে সে সর্বাধিক মুনাফার উদ্দেশ্যে নিজের সমগ্র ফার্মের উৎপাদন মাত্রায় পর্যাপ্ত পরিমাণে রদবদল করিয়াছে।

একচেটিয়া ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

একচেটিয়া অধিকারের সীমা (Limits to the power of a Monopolist)

যদিও একচেটিয়া ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়ার চেষ্টা করে, তবুও বাস্তবে তাহাকে অনেক বাধা বিপত্তি ও সীমা মানিয়া লইয়া কাজ করিতে হয়। প্রথমত, সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার ভয় সর্বদাই আছে। যদি সে দাম অতিরিক্ত রাখে, তাহা হইলে নূতন ফার্ম বাধা-নিষেধ না মানিয়া সেই শিল্পে প্রবেশ করিবে। দ্বিতীয়ত, সকল দ্রব্যেরই কোন-না কোন পরিবর্ত-সামগ্রী আছে ; কাহারও ঘনিষ্ঠ, কাহারও-বা একটু দূরবর্তী। দাম যদি অতিরিক্ত রাখে তাহা হইলে ক্রেতারা পরিবর্ত-সামগ্রী ক্রয়ের দিকে ঝুঁকিবে, অন্য ফার্মও পরিবর্ত-সামগ্রী উৎপাদনের চেষ্টা করিবে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য একচেটিয়া ফার্ম যথেচ্ছ এবং অধিক দাম নির্ধারণ করিতে পারে না। চতুর্থত, যাহাতে জনমত তাহার বিরুদ্ধে না যায়, সে চেষ্টাও সর্বদা রাখিতে হইবে। প্রচুর বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বা রাজনৈতিক জননেতাদের আয়ত্তে রাখিয়া তাহাকে ব্যবসায় করিতে হইবে, দামও অতিরিক্ত করিলে চলিবে না।

সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা, পরিবর্ত-সামগ্রী, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ ও বিরুদ্ধ জনমত

এই সকল কারণের জন্য মার্শাল বলিয়াছেন যে, একচেটিয়া ফার্ম সকল সময়ে সর্বোচ্চ মুনাফা আদায় করিতে পারে না, সে এই সকল বিষয়ের সহিত আপোষ করিয়া অবস্থানুযায়ী যথাসম্ভব আপোষ-লব্ধ সুবিধা লাভ করে (Compromise-Benefit)।

দাম স্বতন্ত্রতা (Price Discrimination)

দাম স্বতন্ত্রতা কাহাকে বলে? (What is Price Discrimination ?)

আমরা এতক্ষণ ধরিয়া লইয়াছি যে একচেটিয়া ফার্মটি বাজারের সকল ক্রেতার নিকট হইতে একই দাম আদায় করে। কিন্তু তাহা সে না-ও করিতে পারে। বিভিন্ন বাজারের বিভিন্ন ক্রেতা গোষ্ঠীর নিকট হইতে বা একই বাজারের বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে সে পৃথক পৃথক দাম আদায় করিয়া লইতে পারে কারণ সে নিজেই দাম নির্ধারক (Price-setter)।

দামস্বতন্ত্রতা কাহাকে বলে

যখন কোন একচেটিয়া ফার্ম বিভিন্ন ক্রেতার নিকট স্বতন্ত্র দামে একই দ্রব্য বিক্রয় করে, তখন তাহাকে দাম-স্বতন্ত্রতা বলে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ইহা সম্ভব হয় না, কারণ সেখানে ধরিয়া লওয়া হয় যে, প্রত্যেক ক্রেতা সকল বিক্রেতার দাম জানে, এবং ফলে একটি দ্রব্যের জন্য বাজারে একটি দামই চালু থাকিতে পারে। একমাত্র একচেটিয়ার ক্ষেত্রেই এরূপ দাম-স্বতন্ত্রতা সম্ভব। দাম স্বতন্ত্রতা তিনভাবে দেখা যায়। (ক) বিভিন্ন ক্রেতার মধ্যে দামের ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রী-করণ (Personal Discrimination) চলিতে পারে। যাহার আকাঙ্ক্ষা তীব্র অথবা ব্যয়ের শক্তি বেশি, তাহার ক্ষেত্রে অধিক দাম এবং যাহার আকাঙ্ক্ষা দুবল অথবা ব্যয়ের শক্তি কম, তাহার ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে কম দাম ধার্য করা যাইতে পারে। যেমন, কাগজে বাঁধাই সুলভ সংস্করণ, কাপড়ে বাঁধাই উচ্চতর সংস্করণ এবং চামড়ার বাঁধাই রাজকীয় সংস্করণ—এইভাবে দ্রব্যের বিভাগ করিয়া একই দ্রব্যের দাম বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন রাখা হয়। যেমন, একই রেলভ্রমণ বিভিন্ন দামে বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট বিক্রয় করা হয়, দ্রব্যের গুণ ও উৎকর্ষের সামান্য উন্নতি করিয়া উহার তুলনায় অনেক বেশি দাম আদায় করা হয়।

তিন প্রকার দামস্বতন্ত্রতা

(খ) বিভিন্ন অঞ্চলে একই দ্রব্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় করা হয়। ধনীদের অঞ্চলে দ্রব্যের দাম একটু বেশি ; গরীবদের এলাকায় দাম একটু কম—এই ভাবে আঞ্চলিক স্বতন্ত্রীকরণ (Regional Discrimination) চলে। নিজের দেশে বেশি দামে বিক্রয় করিয়া অন্য দেশে যদি এই দ্রব্য কম দামে বিক্রয় করা হয়, তবে তাহাকে ডাম্পিং (Dumping) বলে। এই ডাম্পিং আঞ্চলিক স্বতন্ত্রীকরণের একটি বিশেষ রূপ।

(গ) একই দ্রব্যের বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে দামের পার্থক্য করিলে (যেমন রান্নার কাজে, কল চালাইবার কাজে এবং আলো জ্বালিবার কাজে বিভিন্ন দামে বিদ্যুৎ বিক্রয় করা হইলে) তাহাকে ব্যবহারিক-স্বতন্ত্রীকরণ (Use-Discrimination) বলে।

কখন দামস্বতন্ত্রতা করা সম্ভব (When is price-discrimination possible)?

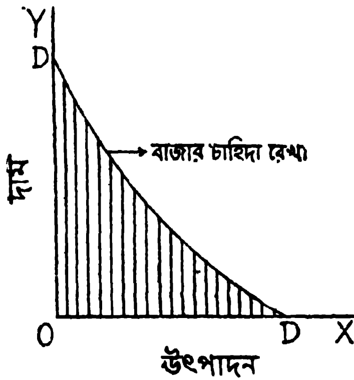
দাম-স্বতন্ত্রতা সফলভাবে চালাইতে গেলে, অধ্যাপক পিগু (Pigou) বলিয়াছেন যে, দুইটি শর্ত বজায় থাকা প্রয়োজন। প্রথম শর্ত হইল যে কম-দামী বাজার (Low-price market) হইতে দ্রব্যটিকে বেশি-দামী বাজারে (High price market) সরাইয়া লওয়া সম্ভব নয়। যদি কেহ কম-দামে ক্রয় করিয়া অপরকে কিছু বেশি দামে বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে একচেটিয়া ফার্মের পক্ষে অপরের নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয় শর্ত হইল বেশি-দামী বাজার হইতে চাহিদা সরাইয়া অল্প-দামী বাজারে লইয়া আসা যায় না। যদি কোন ডাক্তার ধনীর নিকট হইতে বেশি ফি আদায় করেন এবং গরীবের নিকট হইতে কম ফি লন, তাহা হইলে কম ফি দিবার জন্য ধনী গরীব হইতে চাহে না। ডাম্পিং-এর সময় বিদেশের কম-দামী বাজার হইতে নিজের দেশের বেশি-দামী বাজারে দ্রব্যটি ফিরিয়া আসিয়া বিক্রয় হইতে পারে না ; আমদানি-শুল্ক প্রভৃতির দ্বারা দুই বাজারের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা হয়।

দুই অবস্থায় উহা চালান সম্ভব (ক) দ্রব্যের অপসারণ সম্ভব নয় (খ) চাহিদার অপসারণ সম্ভব নয়

অধ্যাপক পিগু দাম-স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া ব্যবসায়কে (Discriminating Monopoly) বা দাম-স্বতন্ত্রতাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমত, যদি একচেটিয়া ব্যবসাদার প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে পৃথক দাম আদায় করিতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে কোন ভোগোদ্বৃত্ত পাওয়া সম্ভব না হয়, এরূপ অবস্থাকে বলে প্রথম পর্যায়ের দাম স্বতন্ত্রতা (Discrimination of the first degree)। মিসেস্ রবিনসন্ বলেন যে, যদি ব্যক্তির নিকট হইতে দ্রব্যের প্রত্যেকটি

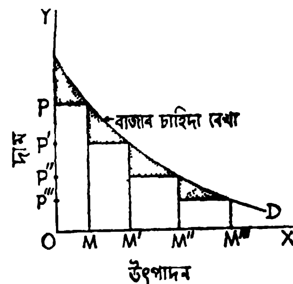
প্রথম স্তরের দাম-স্বতন্ত্রতা

ইউনিটের জন্য স্বতন্ত্র দাম আদায় করা চলে, তাহা হইলে কেহ কোন ভোগোদ্বৃত্ত লাভ করিতে পারে না। নিচের চিত্রে দেখা যাইতেছে, DD হইল বাজার চাহিদা রেখা, প্রতি ইউনিটের জন্য একচেটিয়াদার সর্বাধিক দাম পাইতেছে, ক্রেতার কাছে কোনো ভোগোদ্বৃত্ত অবশিষ্ট থাকিতেছে না। যেমন কোনো সার্জন বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে বিভিন্ন দাম আদায় করিতে পারে। সকলের নিকট হইতেই সে ব্যক্তির সর্বাধিক ক্ষমতা অনুযায়ী দাম চাহিতে পারে। বাস্তবে অবশ্য এইরূপ বেশি দেখা যায় না।

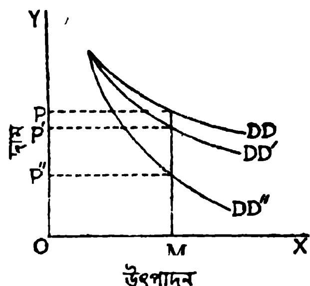


দ্বিতীয় স্তরের দাম-স্বতন্ত্রতার ক্ষেত্রে, বাজারকে এমন বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয় যখন একটি বাজারাংশের সবচেয়ে 'গরীব' ক্রেতা যে দাম দিবে, সেই বাজারাংশের সকল ক্রেতার নিকট হইতেই ঐ দাম আদায় করা যায় (markets are divided on the basis that in each market the lowest price which the poorest member of the group is prepared to pay is charged from all the members of the group)। নিচের চিত্রে দেখা যাইতেছে D হইল চাহিদা রেখা। OP দামে OM পরিমাণ, OP′ দামে MM′ পরিমাণ, OP″ দামে M′M″ পরিমাণ এবং OP′ দামে M″M″ পরিমাণ বিক্রয় করা হইতেছে। কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি পর্যন্ত রেলের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া হইল OP, দ্বিতীয় শ্রেণীর OP′ প্রভৃতি। ঐ শ্রেণীর মধ্যে যাহারা বেশি দাম দিতে রাজী ছিল, তাহাদের মোট ভোগোদ্বৃত্ত ঘন-চিহ্নিত স্থান দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। ক্রেতারা নিজেরা কেহ কেহ ভোগোদ্বৃত্ত পাইতেছে, কোনো শ্রেণীর মধ্যে প্রান্তিক ক্রেতার কোনো ভোগোদ্বৃত্ত নাই।

দ্বিতীয় স্তরের দাম স্বতন্ত্রতা



তৃতীয়ত, অনেক সময় একচেটিয়াদার নিজের খুশিমত বাজার ভাগ করিয়া রাখে, এবং প্রতি বাজারে সে পৃথক দাম ধরিয়া রাখে। ইহাকে বলে তৃতীয় স্তরের দাম স্বতন্ত্রতা (Discrimination of the third degree)। পাশের চিত্রে দেখা যাইতেছে বাজার চাহিদা রেখাকে দুই তিনটি অংশে ভাগ করা হইয়াছে। সব বাজারেই সে OM পরিমাণ বিক্রয় করিতেছে, বিভিন্ন বাজারে সে OP, OP', OP'' প্রভৃতি বিভিন্ন দাম বাঁধিয়া রাখিয়াছে কোনো দোকানদারের একটি দোকান হইল নিউ মার্কেটে এবং অপরটি হইল যাদবপুরে। সে নিউ মার্কেটের দোকানে দ্রব্যটির দাম বেশি রাখিতে পারে, এবং যাদবপুরের দোকানে দাম কম রাখিতে পারে। সে জানে ধনী ও অভিজাত ঘরের লোকেরা নিউ-মার্কেটে যায় এবং একটু বেশি দামে দিতেও রাজি থাকে; ছোট, ঘিঞ্জি, ময়লা দোকানে দাম একটু কম হইলেও তাহারা যাইতে চাহে না। যদি নিউ-মার্কেটে না গিয়ে ক্রেতারা সবাই যাদবপুরের দোকানে যায়, তবে এই দামস্বতন্ত্রতা ভাঙিয়া যাইবে।



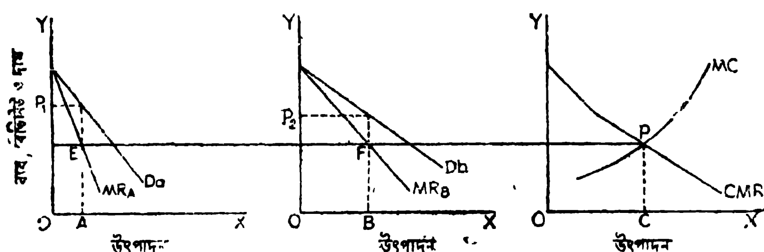
তৃতীয় স্তরের দাম-স্বতন্ত্রতা

দামস্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া ফার্মটির ভারসাম্য (Equilibrium of a discriminating monopolist) :

দাম স্বতন্ত্রতার ক্ষেত্রে একচেটিয়া ফার্ম বিভিন্ন দাম-সম্পন্ন প্রত্যেক বাজারে এরূপ দাম স্থির করে যাহাতে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান। শুধু তাহাই নহে, সকল বাজারের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান। সকল বাজারের প্রান্তিক রেভিনিউ সমান না হইলে যে বাজারে প্রান্তিক রেভিনিউ কম সেই বাজার হইতে দ্রব্য সরাইয়া যে বাজারে প্রান্তিক রেভিনিউ বেশি সেই বাজারে বিক্রয় করা হইবে; ফলে উভয় বাজারের প্রান্তিক রেভিনিউ ক্রমে সমান হইয়া পড়িবে। প্রত্যেক বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পৃথক স্থিতিস্থাপকতা অনুযায়ী দাম স্থির হইবে। যে বাজারের চাহিদা স্থিতিস্থাপক সেই বাজারে দাম কম স্থির হইবে; যে বাজারের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক সেই বাজারে বেশি দাম ধার্য করা হইবে, প্রত্যেকটি পৃথক বাজারে স্বতন্ত্র দামে যোগান ও চাহিদার

কি ভাবে প্রত্যেক বাজারের স্বতন্ত্র দাম স্থির হয়

ভারসাম্য স্থাপিত হইলে দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া ফার্মও ভারসাম্যাবস্থায় উপনীত হইবে। নিচের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে :



A ও B দুইটি বাজার আমরা ধরিয়া লইতেছি। কোনো বাজারেই প্রতিযোগিতা নাই ; কিন্তু উভয় বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমান নয়। D_a রেখার স্থিতিস্থাপকতা D_b রেখা হইতে কম। MR_a ও MR_b হইল উহাদের প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা। MC হইতেছে প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা। P বিন্দুতে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় মিলিত প্রান্তিক রেভিনিউ-রেখার (CMR) সমান। ফার্মের মোট উৎপাদন OC দুই বাজারের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হইল যখন ফার্মের প্রান্তিক রেভিনিউ হইল CP. A বাজারে $MR_a = MC$ হইল E বিন্দুতে, দাম হইবে OP_1 এবং বিক্রয় হইবে OA পরিমাণ। B বাজারে $MR_b = MC$ হইল F বিন্দুতে, দাম হইবে OP_2 এবং বিক্রয় হইবে OB পরিমাণ। দেখা যাইতেছে A-র তুলনায় B বাজারে স্থিতিস্থাপকতা কম বলিয়া OP_1 হইতে OP_2 কম। এইরূপে স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য অনুযায়ী একচেটিয়া ফার্ম বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দাম ধার্য করিয়া সর্বোচ্চ নীট রেভিনিউ পাইবে এবং ভারসাম্যে পৌছিবে।

দাম স্বতন্ত্রতা সমাজের পক্ষে উপকারী কি ? (Is Price Discrimination beneficial to Society)

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সমগ্র সমাজের দিক হইতে দাম স্বতন্ত্রতা সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি করে। যদি দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য দ্রব্যটির দাম খুব কম হারে ধার্য করা হয় তবে প্রতি-ইউনিটে স্বাভাবিক মুনাফা না পাওয়ার দরুন হয়ত ঐ দামে উৎপাদন ব্যয়ের সবটা উঠিয়া আসে না। দাম যদি অতিরিক্ত উচ্চহারে ধার্য করা হয়, তবে বিক্রয় কম হইবে বলিয়া মোট রেভিনিউ খুব কম হইতে পারে। তবে এই অবস্থায় হয়ত দ্রব্যটি উৎপন্নই হইবে না। এই অবস্থায় দাম স্বতন্ত্রতার দ্বারা বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা সম্পন্ন

ক্রেতাগোষ্ঠী হইতে মোট রেভিনিউ বেশি পাওয়া যাইতে পারে: সমাজে তখন দ্রব্যটির উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। জোয়ান রবিন্‌সনের ভাষায়, 'It may happen, for instance, that a railway would not be built or a country doctor would not set up a practice, if discrimination were forbidden. It is clearly desirable that price discrimination should be permitted in such cases."

কাহারও ক্ষেত্রে বেশি দাম এবং কাহারও ক্ষেত্রে কম দাম থাকে বলিয়া দাম-স্বতন্ত্রতায় কেহ লাভবান হন, কেহ বা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তবে সামাজিক কল্যাণের উপর নীট প্রভাব নির্ভর করিবে সমাজ কোন শ্রেণীর কল্যাণ বৃদ্ধির উপর জোর দেয়। যদি ধনীদের নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করিয়া দরিদ্রের নিকট হইতে কম দাম আদায় করার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মূলধন-গঠনের দিক হইতে ইহা খারাপ, কিন্তু মোট অর্থনৈতিক কল্যাণ বাড়িবে বলিয়া মনে করা চলে। আঞ্চলিক দাম-স্বতন্ত্রতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হয়ত একচেটিয়া ফার্মটি দেশের মধ্যে দ্রব্যের দাম বাড়াইল (আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক থাকায়), কিন্তু দেশের বাহিরের বাজারের দাম কম রাখিল (সেখানকার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি এই জন্য)। দেশের অধিবাসীদের বিনিময়ে বিদেশীরা লাভবান হইতেছে, ফলে দেশের মোট অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পাইল এমন বলা চলে না। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটি কথা মনে রাখা দরকার। শিল্পটিতে যদি ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কার্যকরী হইতে থাকে, অর্থাৎ প্রতি-ইউনিট ব্যয় কমিতে থাকে, তবে কম স্থিতিস্থাপকতা সম্পন্ন বাজারেও (অর্থাৎ দেশের মধ্যে) কম দামে বিক্রয় করা সম্ভবপর। এই অবস্থায় বিশুদ্ধ একচেটিয়ার তুলনায় দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া মোট অর্থনৈতিক কল্যাণ বাড়াইতে পারে। কারণ তাহার দাম-স্বতন্ত্রতার দরুণ উৎপাদন আরও বাড়িতেছে, ব্যয় কমিতেছে এবং বিশুদ্ধ একচেটিয়া তুলনায় দাম সব বাজারেই কম ধার্য করা সম্ভব হইতেছে। বিদেশে ডাম্পিং করিলে দেশের মধ্যেও দাম কম রাখা সম্ভব হইতে পারে এবং দেশের লোক লাভবান হইতে পারে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া দাম নিরূপণের তুলনা
(Comparison of Pricing under perfect competition and Monopoly)

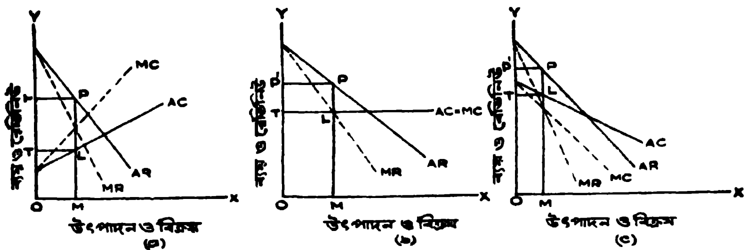
পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারে দাম নিরূপণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল আছে। উভয় ক্ষেত্রেই ফার্ম এমন উৎপাদনের পরিমাণে ভারসাম্যে

থাকিবে যেখানে প্রান্তিক রেভিনিউ প্রান্তিক ব্যয়-এর সমান। তাহা ছাড়া উভয় ক্ষেত্রেই ফার্মের ব্যয় রেখা সমান ধরণের। AC ব্যয় রেখা সাধারণভাবে U-আকৃতির এবং MC রেখা AC রেখাকে নিম্নতম বিন্দুতে ছেদ করিয়া উপরে ওঠে।

কিন্তু এই দুই বাজারে ফার্মের দাম নিরূপণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যই বেশি। একে একে এই পার্থক্যগুলি আলোচনা করা যাউক। প্রথমত, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের সম্মুখে চাহিদা রেখা বা গড রেভিনিউ রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক এবং X অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা। সুতরাং পূর্ণ-প্রতিযোগিতায় উৎপাদনের সকল স্তরে AR=MR এবং উহারা একই রেখা। একচেটিয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্নরূপ। একচেটিয়া ফার্মের সম্মুখে চাহিদা রেখা বা গড় রেভিনিউ রেখা বাম হইতে ডাহিনে নীচের দিকে নামে। সুতরাং উৎপাদনের সকল স্তরেই AR সর্বদা MR হইতে কম থাকে, অর্থাৎ MR রেখা AR রেখার নীচে অবস্থিত থাকে। তাই ভারসাম্যের বিন্দুতে দাম বা AR অপেক্ষা MR সর্বদা কম থাকে।

দ্বিতীয়ত, পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়াতে, উভয় ক্ষেত্রেই ফার্ম উৎপাদনের এমন স্তরে ভারসাম্যে পৌঁছায় যেখানে MC=MR. কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে MR যেহেতু AR বা দামের সমান, সেইজন্য MC=MR=AR=Price. একচেটিয়ার ক্ষেত্রে এইরূপ হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রে MR যেহেতু সর্বদাই AR বা দাম অপেক্ষা কম, সেইজন্য ভারসাম্যের বিন্দুতে MC=MR হইবে, কিন্তু দাম অপেক্ষা কম হইবে। অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতার ভারসাম্যে MC=MR=AR (দাম), কিন্তু একচেটিয়া ভারসাম্যের ক্ষেত্রে MC=MR<AR (দাম)। বস্তুত প্রান্তিক ব্যয় এবং দামের এই পার্থক্যের দ্বারা অনেকে একচেটিয়া শক্তির মাত্রা পরিমাপ করেন (degree of monopoly power)। তৃতীয়ত, পূণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ফার্ম দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার (LAC) নিম্নতম বিন্দুতে অবস্থান করে। একচেটিয়াব ক্ষেত্রে ফার্ম ভারসাম্যে পৌঁছায় এমন বিন্দুতে সেখানে তাহার AC তখনও নামিতেছে এবং নিম্নতম বিন্দুতে পৌঁছায় নাই। একচেটিয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে MC রেখা MR রেখাকে ছেদ করিয়াছে নিম্নতম AC বিন্দুর আগেই, অর্থাৎ বামদিকে। একচেটিয়ার ক্ষেত্রে একচেটিয়ার পরিমাণ এইরূপ সীমাবদ্ধ থাকে তাহার কারণ উৎপাদন আরও বাড়াইলে MR রেখা AC রেখার নীচে চলিয়া যায়, আর MC-ও বাড়িতে

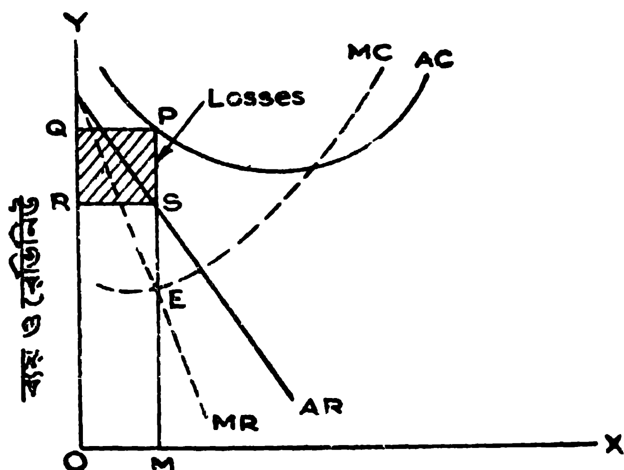
থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফার্মটি উৎপাদন বাড়াইতে পারে, যতক্ষণ তাহার AC রেখা নামিতেছে ততক্ষণই প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম উৎপাদন বাড়ায়। অর্থাৎ সাধারণভাবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের তুলনায় একচেটিয়া ফার্মের উৎপাদন অনেক সময়ে সংকুচিত থাকে। চতুর্থত, পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্য আলোচনার সময়ে আমরা দেখিয়াছি কোন ফার্ম উৎপাদনের সেই পরিমাণ ভারসাম্যে পৌছায়, যেখানে তাহার প্রান্তিক ব্যয় বাড়িতেছে। একমাত্র এইরূপ অবস্থাতেই ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্ত (অর্থাৎ MC রেখা MR রেখাকে ভারসাম্যের উৎপাদন বিন্দুকে তলার দিক হইতে ছেদন করিবে) পূরণ হইতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে MR রেখা সরল রেখা হওয়ায় যদি MC রেখাকে উহার তলার দিক হইতে কাটিয়া উপরে উঠিতে হয় তাহা হইলে ভারসাম্যের পরে নিশ্চয়ই MC রেখা MR রেখার উপরে অবস্থান করিতেছে (কারণ ছেদ করিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছে।) কিন্তু একচেটিয়া অবস্থায় MR রেখা নীচে দিকে নামে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে MC রেখা বাড়িতেছে. কমিতেছে বা X অক্ষের সমান্তরাল থাকিতেছে এইরূপ যে কোনো অবস্থাতেই MR রেখাকে ছেদ করিতে পারে। নীচের তিনটি চিত্রে এই তিনটি অবস্থা দেখানো হইয়াছে। (a) চিত্রে MC রেখা উর্ধ্বমুখী। (b) চিত্রে MC রেখা X অক্ষের সমান্তরাল। (c) চিত্রে MC রেখা নীচের দিকে নামিতেছে।



উপরের (a) চিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে একচেটিয়া ফার্ম ভারসাম্যে আছে যখন MC রেখা উপরে উঠিতেছে। (b) চিত্রে ভারসাম্যের উৎপাদনে MC রেখা X রেখার সমান্তরাল। (c) চিত্রে MC নামিতেছে এইরূপ অবস্থায়, একচেটিয়া ফার্মটি ভারসাম্যে পৌছিয়াছে। তিনটি চিত্রেই দাম হইল OP^1 (বা MP)। ভারসাম্যের উৎপাদন হইল OM এবং মোট মুনাফা হইল PLTP', যদিও ভারসাম্যের উৎপাদনের পরিমাণ, দাম এবং মুনাফা এই তিনটি

ক্ষেত্রে পৃথক। অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় MC রেখা ভারসাম্যের উৎপাদনে বা তাহার কাছাকাছি পৌঁছিয়া উপরের দিকে উঠিতে বাধ্য, কিন্তু একচেটিয়ার ক্ষেত্রে কোন ফার্ম উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী বা সমমুখী রেখা লইয়া ভারসাম্যে থাকিতে পারে।

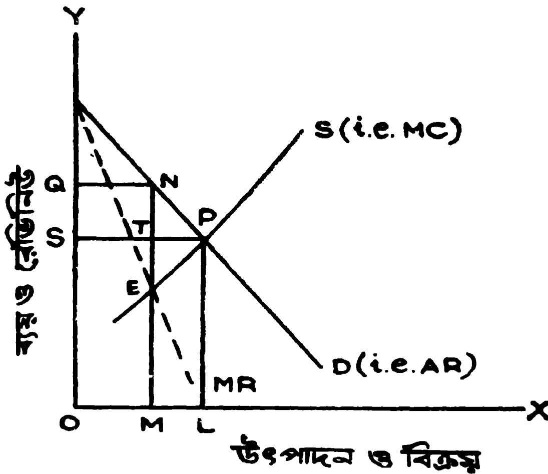
পঞ্চমত. একচেটিয়া ও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যের আর একটি পার্থক্য হইল পূর্ণ প্রতিযোগিতায়, দীর্ঘকালে কোন ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফাটুকু আয় করিতে পারে, কিন্তু একচেটিয়া ফার্ম স্বাভাবিকের অতিরিক্ত মুনাফা, এমন কি দীর্ঘকালেও পাইতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কোন ফার্ম স্বল্পকালে অস্বাভাবিক বেশি মুনাফা পাইতে থাকিলে দীর্ঘকালে শিল্পে নূতন ফার্ম প্রবেশ করিয়া ঐ স্বাভাবিক মুনাফার অবলোপ ঘটায়। কিন্তু একচেটিয়ার ক্ষেত্রে একচেটীয় শিল্পে নূতন ফার্মের প্রবেশের পথে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাধা থাকে। শিল্পে নূতন ফার্ম দীর্ঘকালেও প্রবেশ করিতে পারে না এবং একচেটীয় মুনাফার অবলুপ্তি ঘটাইতে পারে না। অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালে স্বাভাবিকের অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারিলেও দীর্ঘকালে



উৎপাদন ও বিক্রয়

পারে না ; কিন্তু একচেটিয়ার ক্ষেত্রে ফার্মটি দীর্ঘকালেও স্বাভাবিকের অতিরিক্ত মুনাফা পাইতে পারে। অবশ্য এইরূপ মনে করার কোন কারণ নাই যে একচেটিয়া ফার্মটি নিশ্চয় সদাসর্বদা স্বাভাবিকের অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিবে। চাহিদা ও ব্যয়ের অবস্থা তাহার অনুকূল না হইলে একচেটিয়া ফার্মটি স্বল্পকালে ক্ষতি স্বীকার করিতেছে এইরূপ নিশ্চয়ই হইতে পারে। উপরের চিত্রে দেখা

যাইতেছে যে বাজারে একচেটিয়া থাকা সত্ত্বেও ফার্মটির স্বল্পকালে লোকসান হইতেছে, কারণ তাহার চাহিদা দুর্বল অথচ ব্যয় বেশি। অবশ্য প্রতিযোগিতা-মূলক ফার্মের মতই একচেটিয়া ব্যবসাদার অনেকদিন ধরিয়া লোকসান দিবে, তাহা সম্ভব নহে। দীর্ঘকালে সে অন্তত স্বাভাবিক মুনাফাটুকু তুলিতে না পারিলে শিল্প পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। বাজারের এই দুইটি অবস্থার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হইল যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার তুলনায় একই বা সমান ধরণের ব্যয় ও রেভিনিউ অবস্থা মানিয়া লইলে, একচেটিয়া বাজারে, তুলনামূলক ভাবে দাম বেশি থাকে এবং উৎপাদন কম থাকে। তাহার কারণ একচেটিয়া ব্যবসাদার উৎপাদন কমাইয়া রাখে দাম বাড়াইবার উদ্দেশ্যে। নীচের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে। এই চিত্রে D চাহিদা রেখা বা AR রেখা, এবং S শিল্পের যোগান রেখা। বস্তুত এই S রেখা শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্মের স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা যোগ করিয়া পাওয়া গিয়াছে। এখন পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম OS বা LP স্থির হইবে OL উৎপাদনের পরিমাণে। কারণ সেখানেই চাহিদা রেখা D এবং যোগান রেখা S পরস্পর ছেদ করিতেছে। সুতরাং OL হইল ভারসাম্যের উৎপাদন।



এখন মনে কর শিল্পের সকল ফার্ম মিলিয়া একটি শিল্প-সম্মিলন বা কার্টেল, অর্থাৎ একটি একচেটিয়া ফার্ম গঠন করিল। আমরা জানি যে একচেটিয়া ফার্মটি উৎপাদন ও দামের সেই বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকে সেখানে MC = MR. উপরের এই চিত্রে OM উৎপাদনের পরিমাণে MC = MR হইতেছে এবং দাম হইল MN। চিত্র হইতে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে যখন সকল ফার্ম একত্র

হইয়া একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা করিল তখন মোট উৎপাদন কমিয়া OL হইতে OM হইল এবং দাম বাড়িয়া LP হইতে ML হইল। সুতরাং একচেটিয়া অবস্থায় তুলনামূলক ভাবে দাম বেশি থাকে এবং উৎপাদন কম থাকে, যদি উভয় ক্ষেত্রে ব্যয় ও চাহিদার অবস্থা সমান হয়। অবশ্য উপরের আলোচনা হইতে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি না যে একচেটিয়ার ক্ষেত্রে দাম সদাসর্বদা, অতি-অবশ্য একেবারে নিশ্চয় করিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতার তুলনায় বেশিই থাকিবে। কখনো কখনো একচেটিয়া দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতার দামের তুলনায় কমই থাকিবে। তখন তাহার ব্যয় রেখার আকৃতি পূর্ণ প্রতিযোগিতার ব্যয় রেখার আকৃতি হইতে পৃথক। উৎপাদনের মাত্রা, বিজ্ঞাপন, বিক্রয় ব্যয় নানা কারণে একচেটিয়া ফার্মের ব্যয় রেখার আকৃতি পৃথক হইতে পারে। সুতরাং নিজের প্রান্তিক ব্যয়-এর তুলনায় বেশি দাম হয়ত সে আদায় করিতেছে, কিন্তু উহা প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রান্তিক ব্যয় ও দাম অপেক্ষা কম, তাহা হইতে পারে। সাধারণত যে সকল দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি এবং যাহাদের উৎপাদনে ফার্মটি ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের সুবিধা পাইতেছে, সেই সকল ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা দেখা দিতে পারে। এইরূপ শিল্পে উৎপাদনের বৃদ্ধি ইউনিট-প্রতি দাম কমাইয়া দেয় এবং দাম কমাইলে মোট রেভিনিউ বাড়ে। তাহা ছাড়া, একচেটিয়া ফার্মটি নিজের ক্ষমতা সাবধানে ব্যবহার করে। বাস্তব জীবনে বাধা ও সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করিয়া সে দাম কম রাখিতে পারে। তবে সাধারণত এইরূপ বাজারে দ্রব্যের দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতার তুলনায় বেশি এবং উহার উৎপাদন কমই থাকিবে।

অনুশীলনী

1. Show how price is determined under monopoly.

What are the conditions under which a monopolist can charge different prices irom different customers ?

2. Analyse the effects of an increase in demand for the product of a monopolist on his price and on his output.

3. What are the limits to the power of a monopolist to charge any price he likes ? Do you think that price under monopoly must always be higher than under competition ?

4. Is price discrimination always socially desirable ?

5. Show how a monopolist seeking to maximise his profit determines his output and price,

6 What are the condition of profit maximisation of a firm ? If all firms maximise profits, how would you explain the difference between equilibrium under monopoly and equilibrium under perfect competition ?

11

একচেটীয় প্রতিযোগিতা ও অলিগোপলি

Monopolistic Competition and Oligopoly

একচেটীয় প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে (What is Monopolistic competition)

একচেটীয় প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Monopolistic Competition)

যখন বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা ফার্ম থাকে. কিন্তু উহারা ঠিক একই ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করে না. প্রত্যেকে একটু "পৃথক" দ্রব্য বিক্রয় করে, তখন সেই অবস্থাকে একচেটীয় প্রতিযোগিতা বলে। একই শিল্পের মধ্যে দ্রব্যের এইরূপ পৃথকীকরণ বহু কারণে সম্ভব হয়, যেমন গুণ ও মার্কার পার্থক্য, বিজ্ঞাপন ও ব্যবসায়-পরিচিতির তারতম্য প্রভৃতি। এই অবস্থায় একের দ্রব্য অন্যের দ্রব্য হইতে একটু পৃথক হয় বটে, কিন্তু ইহারা একেবারে ভিন্ন দ্রব্য নয়, একই শিল্পের অন্তর্গত। প্রত্যেক ফার্মের দ্রব্যই কিছু সংখ্যক ক্রেতা কোনো না কোনো কারণে পছন্দ করেন এবং অন্যান্যদের তুলনায় উহার দাম একটু বাড়িলে ক্রয় করা ছাড়িয়া দেন না। সুতরাং অল্প পরিমাণ ক্রেতা লইয়া প্রত্যেকের ছোটখাট এক একটি একচেটিয়া বাজার গড়িয়া উঠে। কিন্তু ইহা পূর্ণ একচেটিয়া নয়, কারণ প্রত্যেকটিই অপর দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী এবং সেই শিল্পের মধ্যে নূতন ফার্মের প্রবেশের কোনো বাধা নাই। বরং বাস্তবে এই ক্ষুদ্র একচেটিয়া ফার্মগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে; পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হইতে উহার তীব্রতা মোটেই কম নয়। বাজারে কিছুটা একচেটিয়া অবস্থা আছে, আবার প্রতিযোগিতাও চলিতেছে—এই কারণে এইরূপ বাজারের নাম হইয়াছে একচেটীয় প্রতিযোগিতা।

একচেটীয় প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে : অনেক ফার্ম ও "পৃথক" দ্রব্য

* "In perfect competition there is at any rate only one homogeneous commodity. In monopolistic competition there is differentiation of products, Products are not homogeneous, as in perfect competition but neither are they only remote substitutes as in monopoly. What it really means is that in monopolistic competition there are various 'monopolists' competing with each other. These competing 'monopolists' do not produce identical goods Neither do they produce goods which are completely different. Product-differentiation means that products are different in some ways, but not altogether so."

দাম ছাড়াও অন্য বিষয়ে প্রতিযোগিতা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একমাত্র দামের ভিত্তিতেই প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগী ফার্মসমূহ নিজেদের মধ্যে দাম কাটাকাটি করিয়া অবশেষে এমন এক অবস্থায় পৌছায় যেখানে দ্রব্যের দাম তাহাদের প্রান্তিক ব্যয় ও নিম্নতম গড় ব্যয়ের সমান। সেই অবস্থায় ফার্মগুলি ভারসাম্যে অবস্থান করে। একচেটীয় প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র দাম লইয়াই প্রতিযোগিতা হয় না, কারণ প্রত্যেকেরই কিছু কিছু একচেটিয়া অধিকার থাকায় দাম বাড়াইলেও ক্রেতারা ক্রয় পরিত্যাগ করে না। এইরূপ অবস্থায় দাম-হীন প্রতিযোগিতা (non-price competition) চলিতে পারে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা, ভিন্ন মার্কা ব্যবহার করিয়া, সামান্য গুণগত পার্থক্য করিয়া বহু বিভিন্ন উপায়ে এইরূপ দাম-হীন প্রতিযোগিতা চলিতে পারে।

একচেটীয় প্রতিযোগিতায় ফার্মের চাহিদা ও ব্যয়-রেখার বৈশিষ্ট্য

একচেটীয় প্রতিযোগিতার অবস্থায় কোনো ফার্মের চাহিদা-রেখা ও ব্যয়-রেখা উভয়েই প্রতিযোগী অন্যান্য ফার্মের দাম ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও সিদ্ধান্ত দ্বারা (price-output decisions of the rival firms) প্রভাবিত হইয়া থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোনো ফার্মের দ্রব্যের জন্য চাহিদা রেখা মূলত নিভর করে ব্যক্তিদের রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের উপর, কিন্তু একচেটীয় প্রতিযোগিতায় কোনো ফার্মের দ্রব্যের জন্য চাহিদা-রেখা প্রতিযোগী ফার্মসমূহের দাম ও বিক্রয়জনিত ব্যয়ের উপরও কিছুটা নিভর করে। ফার্মের-ব্যয় রেখা সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা চলে। প্রায় সমান ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করে বলিয়া এই ফার্মগুলি প্রায় একই ধরনের উপাদান ব্যবহার করে। একই উপাদানের বাজার হইতে তাহারা উৎপাদন ক্রয় করিয়া থাকে, এই কারণে কোনো প্রতিযোগী ফার্ম দ্রব্যের দাম কমাইলে এবং উৎপাদন বাড়াইলে উপাদানের দাম বাড়িয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে কেবল নিজের নয়, অপর ফার্মগুলির ব্যয়-রেখাও পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, বিক্রয়জনিত ব্যয় (বিজ্ঞাপন প্রভৃতি) করার দরুণ তাহার ব্যয়-রেখার আকৃতিও পরিবর্তিত হইয়া যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া বাজারের "স্বাধীন" চাহিদা-রেখা ও "স্বাধীন" ব্যয়-রেখা এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া চলে না। অবশ্য আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরিয়া লইতেছি সকল ফার্মের ব্যয় রেখা সমান এবং ফার্মের সংখ্যা বাড়িলে বা কমিলেও ব্যয়ের এই রেখাগুলি একই অবস্থায় থাকে। আমরা আরও ধরিয়া লইতেছি,

ফার্মের সংখ্যা বাড়িলে বা কমিলে কোনরূপ বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায় না।

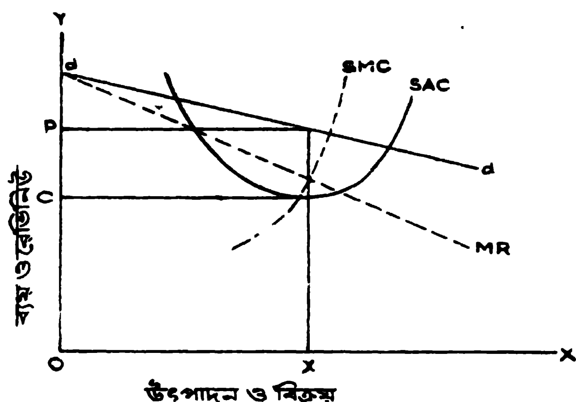
একচেটীয় প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ভারসাম্য (Equilibrium of a firm under Monopolistic Competition)

একচেটীয় প্রতিযোগিতার অবস্থায় কোনো ফার্ম কিরূপে দাম নির্ধারণ করে? মনে রাখা দরকার যে, এইরূপ বাজারে ফার্মটির সম্মুখে নিজ দ্রব্যের জন্য চাহিদা বা AR রেখা (অর্থাৎ বিক্রয় রেখা বা গড রেভিনিউ রেখা) নিম্নাভিমুখী, অর্থাৎ যদি ফার্মটি বিক্রয় বাড়াইতে চায়, তাহা হইলে ইউনিট-প্রতি দাম কমাইতে হইবে। কারণ, বিক্রয় বাড়াইতে হইলে দাম কমাইয়া সেই শিল্পের অন্তর্গত প্রতিযোগী ফার্মের দ্রব্যসমূহ হইতে ক্রেতাদের তাহার দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে। তাহার দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী অনেক দ্রব্য থাকায় তাহার সম্মুখের চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা খুবই বেশি। ইহা অনেকটা বেশি চেটাল (flatter)। সুতরাং বলা যায় যে, চাহিদারেখা বা গড় রেভিনিউ-রেখা ডাইনে নিম্নাভিমুখী ও চেটাল। দ্রব্যের দাম কমাইলে প্রান্তিক রেভিনিউ সর্বদা দাম হইতে কম হইবে এবং এইরূপে প্রান্তিক রেভিনিউ-রেখাও ক্রমশ নামিতে থাকিবে।

AR ও MR রেখার রূপ কি হইবে

একচেটীয় প্রতিযোগিতায় ফার্মের ভারসাম্য অন্যান্য বাজারে ফার্মের অবস্থারই অনুরূপ। স্বল্পকালে ফার্মটির উৎপাদন মাত্রা বদলাইবার সময় নাই, নূতন ফার্মও শিল্পে প্রবেশ করে না। তবে এককভাবে ফার্মগুলি তাহাদের নিজ নিজ দ্রব্যের জন্য দাম ও উৎপাদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত লইতে পারে। উপরন্তু বিজ্ঞাপন দিয়া এবং দ্রব্যের আকার ও গুণাগুণ উন্নত করিয়া তাহাদের দ্রব্যের জন্য চাহিদাও অল্প কিছু বাড়াইতে পারে। এই অবস্থায় স্বল্পকালে দাম ও উৎপাদন সম্পর্কে সে কি সিদ্ধান্ত লইবে, সর্বোচ্চ মুনাফার বিন্দুতে কেমনে ভারসাম্যে থাকিবে তাহা ফার্মের ভারসাম্যের মূল সূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি। নীচের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে। ফার্মটির স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা ও স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা হইল যথাক্রমে SAC ও SMC. ফার্মের সম্মুখে চাহিদা রেখার রূপ হইল dd. dd রেখা যেহেতু পূর্ণ স্থিতিস্থাপক নয় (অর্থাৎ

X অক্ষের সমান্তরাল নয়), সেইজন্য বিক্রয়ের সম্ভাব্য সকল স্তরেই দ্রব্যটির দাম বা AR হইতে MR কম, অর্থাৎ MR রেখাটি AR রেখার নীচে। OX উৎপাদনের পরিমাণে MR ও MC সমান এবং MC রেখা তলার দিক হইতে MR রেখাটিকে কাটিয়া উপরে উঠিতেছে। দাম হইল OP. দেখা যাইতেছে এই দাম SAC রেখার উপরে, অর্থাৎ প্রতি ইউনিটে CP পরিমাণ স্বাভাবিকের



বেশি মুনাফা হইতেছে। এইরূপ মোট মুনাফার পরিমাণ CP × OX.

স্বল্পকালেই একচেটিয় প্রতিযোগী কোনো ফার্ম মুনাফা আরও বাড়াইবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে পারে। বিজ্ঞাপনের খরচা বাড়ায়, আরও দ্রব্য পৃথকীকরণের চেষ্টা চালাইতে থাকে। কিন্তু তাহার দ্রব্যের জন্য ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী থাকায় সেই ফার্মটি মুনাফা আরও বেশি লাভ না-ও করিতে পারে। এই সকল খরচ করার ক্ষেত্রে তাহার নীতিও আমাদের পরিচিত। প্রত্যেকটি খরচা সে ততদূর পর্যন্ত করে যেখানে ইহার MC=MR. (বিজ্ঞাপন বা উৎকর্ষ সাধনের জন্য)।

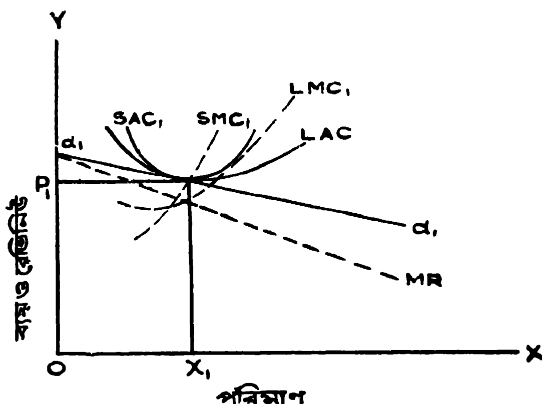
স্বল্পকালীন ভারসাম্য বলিলে বোঝা যায় না যে এই "শিল্পের" অন্তর্গত সকল ফার্ম একই দাম পাইতেছে। দাম সমান হইবে না, কারণ এই শিল্পে সমজাতীয় (homogeneous) দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। অনেকসংখ্যক খুবই ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী লইয়া "শিল্পটি" গঠিত, তবুও প্রতিটি ফার্মের দ্রব্যের জন্য ছোট ছোট ক্রেতাগোষ্ঠীর পছন্দ-অপছন্দের মাত্রা অনুযায়ী প্রত্যেকেরই অল্প কিছু কিছু একচেটিয়া ক্ষমতা আছে। ফলে সকলের দ্রব্যের দাম সমান হইবে না; প্রতিটি ফার্মের সম্মুখে

স্বল্পকালে ফার্ম ও শিল্পের অবস্থা

চাহিদা রেখার আকার সমান নয়। যাহারা একচেটিয়া ক্ষমতা একটু বেশি তাহার সম্মুখে AR ও MR রেখা একটু খাড়া (steeper)। আবার যাহার এই ক্ষমতা কম, তাহার AR ও MR রেখা একটু বেশি চেটাল। ফলে সকলের দামও সমান নয়। কিন্তু একেরটি হইতে অপরটির দাম খুব বেশি দূরে নয়, মোটামুটি কাছাকাছি। ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী থাকায় কেহ অপরের দাম হইতে বেশি উঁচুতে নিজের দাম স্থির করিতে পারিতেছে না।

দীর্ঘকালে ফার্মের ও শিল্পের অবস্থা কি হইবে? স্বল্পকালে কোনো কোনো ফার্ম অত্যধিক মুনাফা করিতে থাকায় স্থায়ী ভারসাম্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। কারণ অধিক মুনাফার লোভে (ক) প্রতিযোগী ফার্মসমূহ অনুরূপ দ্রব্য বা ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া দেয়, এবং (খ) নূতন ফার্ম সেই শিল্পে প্রবেশ করিয়া অনুরূপ দ্রব্য বা উহার নিকটতম পরিবর্ত-দ্রব্যের উৎপাদন সুরু করে। ফলে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনকারী ফার্মের দ্রব্যের জন্য চাহিদা ক্রমে কমিয়া আসিবে, দাম ও গড়-ব্যয়ের পার্থক্য হ্রাস পাইতে থাকিবে। এইরূপ প্রতিযোগিতার জোয়ারে অত্যধিক অস্বাভাবিক মুনাফা ভাসিয়া যাইবে এবং সকল ফার্মই "স্বাভাবিক মুনাফা" আয় করিতে থাকিবে। এইরূপে দীর্ঘকালে সমগ্র শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মের সম্মুখে নিজ দ্রব্যের জন্য চাহিদা রেখার আকৃতি বদলাইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে। নূতন ফার্ম প্রবেশের ফলে বা পুরানো ফার্মগুলি উৎপাদন বাড়াইবার ফলে

দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণ ও সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য বা দলীয় ভারসাম্য



উপাদানের বাজারে উহাদের দাম বাড়িয়া যাইবে, প্রতিটি ফার্মের ব্যয় রেখাতেও পরিবর্তন আসিবে।

উপরের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে। নূতন নূতন ফার্ম প্রবেশের ফলে ফার্মের সম্মুখের চাহিদা রেখা d_1d_1 নীচে নামিয়া গিয়াছে। দীর্ঘকালীন ব্যয় রেখাগুলি উপরে উঠিয়াছে, যেমন LAC_1 ও LMC_1. স্বল্পকালীন ব্যয়রেখা-গুলি উপরে উঠিয়াছে, উৎপাদনের মাত্রাতেও দীর্ঘকালীন সম্ভাব্য সকল প্রকার রদবদল ঘটিয়াছে। যখন শিল্পে প্রচুর সংখ্যক নূতন ফার্ম প্রবেশ করে, তখন প্রতিটি ফার্মের সম্মুখের চাহিদা রেখা LAC রেখার স্পর্শক হইয়া পড়ে। এই শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলি আর স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা করিতে পারে না। নূতন নূতন ফার্ম প্রবেশের প্রেরণা আর থাকে না।

এই অবস্থায় ফার্ম ও শিল্প উভয়ই ভারসাম্যে থাকে। পৃথকভাবে প্রত্যেকটি ফার্মের ক্ষেত্রেই LMC ও SMC উহার MR-এর সমান হয়। OX_1 উৎপাদন ও বিক্রয়ের ভারসাম্যের পরিমাণ। উহা অপেক্ষা ফার্মটি উৎপাদন বাড়াইলে বা কমাইলে লোকসান হইবে। উৎপাদনের মাত্রা বদলাইলেও তাহার লাভ নাই। SAC ও LAC সমান এবং উভয়ের দামের সমান। সমগ্র শিল্পে ভারসাম্য আছে, অর্থাৎ দলগত ভারসাম্য (Group equilibrium) দেখা দিয়াছে, কারণ দল ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়ার বা বাহির হইতে দলে নূতন প্রবেশের কোনো প্রেরণা দেখা যাইতেছে না।

বিক্রয়-ব্যয় (Selling Costs)

বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রচলিত দামে সকল ফার্ম তাহাদের দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু একচেটীয় প্রতিযোগিতা এবং অলিগোপলির অবস্থায় প্রতিটি ফার্ম নিজের দ্রব্যকে পৃথক বলিয়া জাহির করিয়া বাজারে দ্রব্য-পৃথকীকরণ (product differentiation) করিতে থাকে। এইজন্য তাহাকে বিজ্ঞাপন দিতে হয় এবং নিজ দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে। নিজের দ্রব্যের রঙ্, আকৃতি, প্যাকিং, গন্ধ প্রভৃতি দরকারমত বদল করিয়া নিজের ছোটখাট একচেটিয়া-ক্ষেত্রের পরিধি প্রসারিত করিতে হয়। ক্রেতা যাহাতে অপর ফার্মের দ্রব্য না কিনিয়া আমার নিকট হইতে কেনে—এই উদ্দেশ্যেই ফার্মসমূহ বিক্রয়-জনিত ব্যয় বা বিক্রয়-ব্যয় করিয়া থাকে।*

বিক্রয়-ব্যয় কাহাকে বলে

* "Selling costs may be defined as the costs necessary to persuade a buyer to buy one product rather than another, or to buy from one seller rather than another."

বিক্রয় ব্যয়ের সাহায্যে প্রতিযোগী দ্রব্যগুলির তুলনায় লোকচক্ষুর সম্মুখে নিজে ফার্মের দ্রব্যটিকে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিলে দুই ধরনের সুবিধা হয়ঃ (ক) অন্য দ্রব্য ছাড়িয়া ক্রেতা আমার দ্রব্য কিনিতে মনস্থ করিতে পারে, (খ) আমার দ্রব্যের বর্তমান ক্রেতারা আমার দ্রব্যটিকে আরও বেশি পছন্দ করা শুরু করিতে পারে। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, প্রথমক্ষেত্রে চাহিদা-রেখাকে ডান দিকে সরাইয়া দেওয়া এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহার স্থিতিস্থাপকতা কমাইয়া দেওয়া, অর্থাৎ উহারা আকৃতি অধিকতর খাড়া (steeper) করিয়া তোলা, এইরূপ বিক্রয়-ব্যয়ের উদ্দেশ্য।

ইহার লক্ষ্য কি

অবশ্য কতকগুলি বিজ্ঞাপন-ব্যয় আছে, যাহাদের এইরূপ কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। যেমন, অনেক সময় কোন শিল্পের তরফ হইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতে থাকে, যাহাতে অন্য শিল্প হইতে সেই শিল্পে চাহিদা সরাইয়া আনিতে পারা যায়। যেমন ভারতীয় বা বোর্ড বিজ্ঞাপনের সাহায্যে কফির বাজার হইতে চাহিদা সরাইবার চেষ্টা করে। তাঁতের কাপড় কিনুন, দেশী শিল্প বাঁচিবে', 'শাড়ি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আভরণ,' 'আরও বেশি ফল খান', 'উলের মত জিনিস আর নাই'—এই সকলই শিল্পের তরফ হইতে বিজ্ঞাপন। এইরূপ বিজ্ঞাপনের ফলে কোনো বিশেষ ফার্মের নিজস্ব দ্রব্যের জন্য চাহিদা বাড়িবে কি না তাহা কিছু বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় সরকার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে তথ্য-মূলক বিজ্ঞাপন (Informative advertisement) দেওয়া হইতে থাকে। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোনো ফার্মের কোনো সুবিধা নাই। বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও এই সকল বিজ্ঞাপন চলিতে পারে। ফার্মের তরফ হইতে আকর্ষণমূলক বিজ্ঞাপন-দানই (Persuasive advertisement) তাহার সম্মুখের চাহিদা-রেখাকে প্রভাবিত করিতে পারে এবং ব্যয়রেখার আকৃতি বদলাইয়া দিতে পারে।

কোন ধরনের বিজ্ঞাপন আমাদের বিচার্য বিষয়

চাহিদার উপর ইহার প্রভাব ক্রমে আলোচনা করা যাউক। বহু বিভিন্ন ধরনে ও পদ্ধতিতে বিক্রয় ব্যয় করা চলে এবং চাহিদা-রেখার উপর ইহার ফলও তাই বিভিন্ন হইতে পারে। ফার্ম স্থির করিল এই মাসে 1000 টাকা বিক্রয়-ব্যয় করিবে। এই টাকা দিয়া সে কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় বা দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে পারে, হ্যাণ্ডবিল ছড়াইতে পারে বা দেওয়ালে

পোস্টার লাগাইতে পারে, আকাশে রঙীন আলোর সাহায্যে জিনিসটির নাম লিখিয়া রাখিতে পারে, বা কয়েকজন লোক লাগাইয়া বাড়িতে বাড়িতে ফেরি করাইতে পারে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে প্রতিমাসে একপাতা, প্রতিসপ্তাহে আধপাতা বা বারবার কয়েক ইঞ্চি জায়গাতে রোজ বিজ্ঞাপন দিতে পারে। এই সকল বিভিন্ন পদ্ধতির প্রভাব চাহিদা রেখার উপর সমান নয়। অবশ্য ইহাদের মূল উদ্দেশ্য হইল যাহাতে সকল দামেই তাহার দ্রব্যটির চাহিদা বাড়িতে পারে; অথবা চাহিদা-রেখার উপরের বা নিচের দিক বা কোনো কোনো অংশ অধিকতর খাড়া হইয়া উঠিতে পারে।*

চাহিদার উপর ইহার প্রভাব

চাহিদার উপর বিক্রয়-ব্যয়ের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অনেকখানি অনিশ্চিত, (indeterminate) তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ক্রেতার অভ্যাস, তাহার মনে যুক্তি ও বিচার-বিবেচনার প্রভাব, তাহা ব্যক্তিগত ও দলগত মনস্তত্ত্ব, প্রভৃতি সকল কিছুর উপর ইহা নির্ভর করে। আজিকার কোনো বিজ্ঞাপনের প্রভাব বহু বছর পরে শুরু হইতে পারে। অল্প বয়সে দেখা বা শোনা কোনো এক চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন মনের কোনো এক অবচেতন স্তরে স্তিমিত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় লুকাইয়া ছিল; হঠাৎ বৃদ্ধ বয়সে ক্রেতাকে সেই দ্রব্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে। সর্বোপরি, এক ফার্মের বিজ্ঞাপন দ্বারা অপর কোনো ফার্ম লাভবান হইতে পারে।†

চাহিদার উপর উহার প্রভাব বিশেষ অনিশ্চিত

এইবার যোগানের উপর বিক্রয়-ব্যয়ের প্রভাব আলোচনা করিতে হইবে। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, চল্‌তি দামে বেশি পরিমাণ বিক্রয় করিতে হইলে

* "Depending upon circumstances, the new demand curve, that is the result of advertising and selling effort, may be more or less elastic, or parts of it may be more less elastic, than the old demand curve, that existed before the selling effort was made."

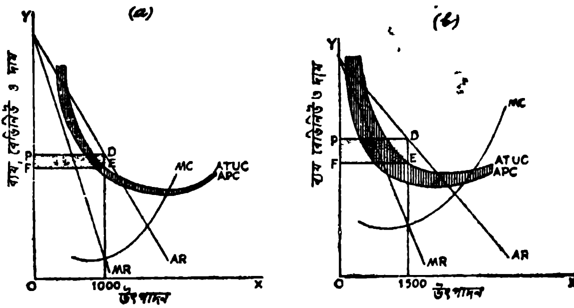
† যেমন মার্গো সাবান-এর বিজ্ঞাপন দেখিয়া এক ব্যক্তি স্থির করিল যে এখন পাউডার না কিনিয়া সাবান কিনিবে। সাবানের দোকানে গিয়া অনেক সাবানের মধ্য হইতে সে মার্গো ক্রয় না করিয়া অন্য কোন ফার্মের সাবান কিনিয়া লইয়া আসিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। আধুনিক কালে চাহিদা বাড়াইবার জন্য বিক্রয়-ব্যয় না করিলেও ফার্মটির বর্তমান চাহিদাটুকু রক্ষা করার জন্যই বিক্রয়-ব্যয় করিতে হইতে পারে। কোনো এক পেট্রল বিক্রেতা প্রথম দিকের চাহিদা বাড়াইবার জন্য বিনা দামে চাকায় বাতাস যোগাইতে শুরু করিল। কিন্তু ক্রমে সকল ফার্মই এইরূপ শুরু করায় সে আর এই বিক্রয়-ব্যয় বন্ধ করিতে পারে না, ইহা সাধারণ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

অধিক বিক্রয়-ব্যয় করা দরকার অথবা একই পরিমাণ দ্রব্য বেশি দামে বিক্রয় করিতে হইলে এইরূপ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এইরূপ বিক্রয়-ব্যয় ফার্মের উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া যায়। সুতরাং ফার্মের ভারসাম্য আলোচনায় সময়ে উৎপাদন ব্যয়ের সহিত বিক্রয়-ব্যয় যোগ করিয়া মোট ব্যয় বাহির করিতে হয় এবং মোট রেভিনিউ হইতে উহা বিয়োগ করিতে হয়। অর্থাৎ, (দাম × বিক্রয়ের পরিমাণ)—(উৎপাদন ব্যয় + বিক্রয় ব্যয়) = নীট রেভিনিউ।

নীট রেভিনিউর পরিমাণ প্রভাবিত হয় ব্যয়ের মাধ্যমে

আমরা ধরিয়া লইতেছি, উৎপাদনের বিভিন্ন পরিমাণে কি কি বিভিন্ন



পরিমাণ মোট ব্যয় হয় তাহা আমাদের জানা আছে। কি কি বিভিন্ন উপায়ে বিক্রয় বাড়ান যায়? প্রথমত, দাম কমাইয়া একই চাহিদা-রেখার উপর থাকিয়া বেশি বিক্রয় করা চলে, অথবা, দ্বিতীয়ত, একই দামে থাকিয়া বিক্রয়-ব্যয় বাড়াইয়া নূতন চাহিদা-রেখা তৈয়ারী করা চলে; অথবা, তৃতীয়ত, উভয় পদ্ধতি একযোগে ব্যবহার করা চলে, অর্থাৎ দাম কমাইয়া এবং সেই সময়ই বিক্রয়-ব্যয় বাড়াইয়া নূতন চাহিদা-রেখায় নূতন দামের বিন্দুতে সরিয়া যাওয়া চলে। কথা হইল, যে-উপায় অবলম্বন করিলে ফার্মের নীট রেভিনিউ সর্বাধিক হইবে, ফার্ম সেই উপায় অবলম্বন করিবে।

উপরের চিত্রে বামদিকের (a) চিত্রে APC হইতেছে উৎপাদন পরিমাণের বিভিন্ন বিন্দুর গড় উৎপাদনব্যয়-রেখা আর ATUC হইল উহার সহিত গড় বিক্রয়-ব্যয় যোগ করিয়া গড় ইউনিট ব্যয়-রেখা। চিহ্নিত এলাকার সাহায্যে প্রতিটি উৎপাদন-পরিমাণে ইউনিট-প্রতি বিক্রয়-ব্যয় দেখানো হইতেছে। ধরা যাউক, বিক্রয়-ব্যয় হইল এক হাজার টাকা। FPDE আয়তক্ষেত্র নীট

রেভিনিউ প্রকাশ করিতেছে। ডানদিকের (b) চিত্রটিতে আমরা বেশি পরিমাণে, যেমন পাঁচহাজার টাকা বিক্রয় ব্যয়ের ফল দেখিতে পাইতেছি। ATUC বাড়িয়া গিয়াছে, AR রেখাও ডানদিকে সরিয়া গিয়াছে, নীট রেভিনিউর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপে যতখানি বিক্রয়-ব্যয় করিলে ফার্মটি সর্বাধিক নীট রেভিনিউ পাইবে সেই পরিমাণ উৎপাদনে উহার ভারসাম্য অবস্থা দেখা দিবে।

অলিগোপলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ (General Characteristics of Oligopoly)

অলিগোপলি কাহাকে বলে (What is Oligopoly)

কোন বাজারে মাত্র কয়েকটি ফার্ম উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজ করিতে থাকিলে সেই অবস্থাকে অলিগোপলি বলে। কয়েকটি বলিলে সংখ্যার দিক হইতে ঠিক কতজন তাহা বলা হইল না, মোট কথা বিক্রেতার সংখ্যা এমন হইবে যাহাতে প্রত্যেকেরই মনে এইরূপ ধারণা থাকে যে, সে দাম, বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ, বিক্রয়-ব্যয় প্রভৃতি বদল করিলে অন্যান্য বিক্রেতারা সকলে বা কেহ কেহ বাধা দিতে পারে।* একচেটিয়া বাজার হইতে অলিগোপলির পার্থক্য হইল, একচেটিয়ায় একজন বিক্রেতা, কিন্তু অলিগোপলিতে কয়েকটি। বিশুদ্ধ ও একচেটিয়া প্রতিযোগিতা হইতে ইহা পৃথক, সেখানে বিক্রেতা ফার্মের সংখ্যা অধিক। অলিগোপলিতে মাত্র কয়েকটি ফার্ম থাকায় প্রত্যেক ফার্ম অপর ফার্ম সম্বন্ধে খুবই সচেতন। সে জানে দাম ও উৎপাদন সম্পর্কে আমার কোনো নীতি বা সিদ্ধান্ত অপর ফার্মের দাম, উৎপাদন ও মুনাফাকে প্রভাবিত করিবে, এই সকল বিষয় সম্পর্কে অপরের কার্যকলাপ আমাকেও প্রভাবিত করিবে। সকল ফার্মের মনেই এই সচেতনতা থাকে। প্রত্যেকটি ফার্মই জানে যে, আমার কাজকর্ম ও নীতি সম্পর্কে অন্য ফার্ম সচেতন। নিজের ফার্মের প্রভাব অন্যের উপর কতটা পড়িবে, ফলে তাহাদের কাজে কিরূপ প্রতিক্রিয়া

অলিগোপলি কাহাকে বলে

* "All market in which there are a small number of sellers are classified under the heading oligopoly. The adjective 'small' must be interpreted operationally, the number of sellers of a homogeneous or differentiated product must be such that each believes that any change in his selling price and sales, or in the quality of his product, or in his advertising expenditure or in any other variable whose value is under his control, is likely to evoke rataliation from most or all of the sellers."

(reaction) দেখা দিবে, উহা আমার উপর কতটা প্রভাব ফেলিবে—এই সকল বিষয় হিসাব করিয়া দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে সকল ফার্ম নিজের নীতি স্থির করে। এই অবস্থাই অলিগোপলির বৈশিষ্ট্য।

এইরূপ অলিগোপলি সাধারণত দুই শ্রেণীর হইতে পারে। যদি ফার্মগুলি ঠিক একই প্রকার দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে বিশুদ্ধ অলিগোপলি (pure oligopoly) বলে। যদি এইরূপ বাজারে দ্রব্য পৃথকীকরণ (product differentiation) থাকে, তবে তাহাকে পৃথকীকৃত অলিগোপলি (differentiated oligopoly) বলা হয়। পৃথকীকৃত অলিগোপলি এবং একচেটীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য খুব কম। উভয়-ক্ষেত্রেই দ্রব্য পৃথকীকরণ আছে এবং নিজের একদল ক্রেতা থাকায় একচেটিয়া অধিকার কিছুটা প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে বিক্রেতা ফার্মটির সংখ্যা কম, একচেটীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সংখ্যা অনেক বেশি। বিক্রেতা ফার্মটির সংখ্যা বেশি বলিয়া একচেটীয় প্রতিযোগিতায় কোন ফার্ম অপর সকল ফার্মকে একত্রভাবে (en masse) পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু অলিগোপলিতে প্রতিযোগীদের কাজকর্ম এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া (reactions) সম্পর্কে ফার্মকে অনেক বেশি সজাগ থাকিতে হয়।

অলিগোপলির ভিত্তি (Bases of Oligopoly)

যে সকল অবস্থা বাজারে একচেটিয়া ফার্মটির উদ্ভব ঘটায় মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে ঐ সব অবস্থাই অলিগোপলির সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল মাত্রাবৃদ্ধির দরুন প্রাপ্ত ব্যয়সংকোচগুলি। অনেক শিল্পেই, বিশেষত যেখানে অধিক মাত্রায় যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেখানে কোনো ফার্ম দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু পাইতে পারে একমাত্র যদি সে বিরাট আয়তনে গঠিত হয়। অর্থাৎ ফার্মটির মোট উৎপাদন সমগ্র শিল্পের উৎপাদনের অতি বৃহৎ অংশ পাইলে তবেই সে সর্বনিম্ন-ব্যয়-এর স্তরে পৌঁছিতে পারে। স্বভাবতই এইরূপ কয়েকটি বৃহৎ ফার্ম মিলিয়া সমগ্র বাজার করায়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারে। এইরূপে ফার্মগুলির সর্বোত্তম উৎপাদনের মাত্রায় পৌঁছিবার ইচ্ছার দরুন অনেক সময়ে অলিগোপলির সৃষ্টি হয়। অবশ্য ইহা হইতে এমন মনে করা চলে না যে কেবলমাত্র অধিক যন্ত্র বিশিষ্ট শিল্পের উৎপাদনের মাত্রার দরুণই বাজার অলিগোপলীয় হইয়া পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে

মাত্রাবৃদ্ধির ব্যয়সঙ্কোচ, ক্ষুদ্র বাজার, শুল্ক ও পেটেন্ট আইন

দেখা যায় যে স্থানীয় ছোট বাজারে, গ্রামে বা সহরে, কয়েকটি দক্ষ ব্যবসায়ী-ফার্ম সমগ্র চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে। এইজন্য স্থানীয় ছোট বাজারেও অনেকক্ষেত্রে অলিগোপলীয় অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক সময়ে দেশের সরকার শুল্ক বা পেটেন্ট আইনের মাধ্যমে বড় বড় ব্যবসায়ী-ইউনিট উদ্ভবে সাহায্য করে। দেশের সরকার যদি মনে করে যে ফার্মটির বৃহৎ আয়তন বা অপরিমিত শক্তি কোনটিই দূষণীয় নহে অথচ ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে দাম সম্পর্কে চুক্তি খুবই নিন্দনীয় তাহা হইলে ফার্মেরা দাম-চুক্তি করিতে না-পারিয়া পরস্পর মিলিয়া গিয়া বৃহৎ ফার্ম গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হয়।

ইহা ছাড়া সাধারণ ব্যবসায়ীর বুদ্ধি ও ব্যক্তি-মনের ইচ্ছা অলিগোপলি সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। প্রভূত মুনাফা, শক্তি ও সম্মান, নেতৃত্ব লাভ, পরিবারের নামকে বিখ্যাত করার প্রবণতা এইরূপ সকল কিছুই বড় ফার্ম গড়িয়া তোলার পেছনে সক্রিয়ভাবে কাজ করিতে পারে। কার্টেল ও ট্রাষ্ট গঠন, আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে প্রতিযোগীদের জোর করিয়া হঠাইয়া দেওয়া এই কাজে সাহায্য করে। বড় বড় ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলি) এইরূপ ছোট ছোট ফার্মকে একত্র করিয়া সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সাহায্য করে। সর্বশেষে, কোনো শিল্পে ফার্মের সংখ্যা কম থাকে অনেক সময়ে শিল্পে প্রবেশের পথে বাধা থাকার দরুন। অনেক শিল্পে দেখা যায় যে উৎপাদন সুরু করিতে হইলে প্রভূত পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয়। নূতন কোনো ফার্ম ঐ শিল্পে প্রবেশের পূর্বে চিন্তা করে যে সে প্রবেশ করিলে উৎপাদন বাড়িয়া দাম কমিয়া যাইতে পারে, ফলে দাম কমিয়া লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হইতে পারে। প্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলি তাহাকে হটাইবার জন্য দামের লড়াই সুরু করিতে পারে। প্রাচীন ফার্মগুলির দ্রব্য ছাড়িয়া তাহার নূতন ট্রেডমার্ক যুক্ত দ্রব্য কেহ ক্রয় না-ও করিতে পারে। ইহার জন্য যে প্রভূত পরিমাণ বিজ্ঞাপন ব্যয় দীর্ঘদিন ধরিয়া চালাইতে হইবে তাহার পরিমাণ কম নয়। আধুনিক জগতের অলিগোপলি বিশেষভাবে দ্রব্যপৃথকীকৃত অলিগোপলির ফলে যে প্রভূত পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার দরুণ স্বাধীন ব্যবসায় সম্পর্কে মানুষের ধারণা বর্তমানে অনেক পরিবর্তিত হইতেছে। যেখানে ছোট ছোট ফার্ম থাকে সেখানে ব্যবসায়ে প্রবেশের স্বাধীনতা থাকিতে পারে।

নানা কারণে প্রতিযোগিতার অবলোপ

অলিগোপলিতে দাম ও উৎপাদন-পরিমাণের অনির্দিষ্টতা (Indeterminacy of Price and output under Oligopoly)

অলিগোপলির বাজারে দ্রব্যের দাম নিরূপণের সমস্যা অন্যরূপ বাজারের তুলনায় অনেক পৃথক। বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া বাজারে কোনো ব্যক্তিগত বিক্রেতা সর্বাধিক মুনাফার নীতি গ্রহণ করিয়া চলে বটে কিন্তু সে অপর কোনো ফার্মের দাম ও উৎপাদন সম্পর্কীয় নীতি সম্পর্কে খোঁজখবর না-ও রাখিতে পারে। নিজস্ব সর্বাধিক মুনাফার বিন্দুতে উৎপাদন করিয়া সে স্থায়ী ভারসাম্যে (stable equilibrium) পৌছে। সে নিজের দাম বা উৎপাদনের নীতি বদলাইলে তাহার প্রতিযোগীরাও তাহাদের নীতি কিরূপে কতটা বদলাইবে এই বিষয়ে ফার্মের কোনো চিন্তা থাকে না। একচেটীয় প্রতিযোগিতামূলক বাজারেও অবস্থা একই রূপ। সেখানে এককভাবে কোনো একটি ফার্ম অনেকের মধ্যে একা, তাই সে জানে যে তাহার দামের নীতি অপর ফার্মকে ততটা প্রভাবিত করিবে না, যেমন বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় করে না। সেইরূপ বাজারে শিল্পের অন্তর্গত অন্যান্য ফার্মের তুলনায় একটু পৃথক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া নিজ দ্রব্যের দাম সে নিজেই কতকটা স্থির করিতে পারে, এবং কোনো প্রতিযোগীর নিকট হইতে তাহার ততটা ভয়ের কারণ নাই, যেমন বিশুদ্ধ একচেটিয়ার ক্ষেত্রে ঘটে। কিন্তু অলিগোপলিতে ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ এবং এই পার্থক্যের কারণ হইল বিক্রেতার সংখ্যা খুব কম। প্রত্যেকটি ফার্ম সমগ্র শিল্পের বৃহৎ অংশ উৎপাদন করে, ফলে তাহার প্রত্যেকটি কাজ ঐ শিল্পের অন্যান্য ফার্মের উপর প্রভাব ফেলে। নিজের কাজের ফলে অন্যান্য ফার্ম কি নীতি অবলম্বন করিবে সেই বিষয়ে প্রতিটি ফার্মকে অতি অবশ্য সচেতন থাকিতে হয়। যে কোনো কাজ সুরু করিলে প্রতিযোগীরা সকলে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে, ইহাও তাহাকে ভাবিতে হয়। তাহার প্রত্যেকটি নীতির দরুণ তাহার মুনাফা কিরূপে প্রভাবিত হইবে এই বিষয়ে তাহাকে সচেতন থাকিতে হয় এবং অনেক সম্ভাব্য গ্রহণীয় নীতির মধ্য হইতে তাহাকে এমনভাবে সঠিক নীতিটি বাছিয়া লইতে হয় যাহাতে তাহার সর্বাধিক লাভ হইতে পারে। অন্যান্য ফার্মগুলিও একইভাবে আচরণ করে। এইভাবে প্রত্যেকটি ফার্ম একে অপরের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে। অলিগোপলিতে প্রত্যেকটি ফার্মই 'চিন্তা করে অন্যান্য ফার্মগুলি কি করিবে। কতিপয় ফার্মের মধ্যে একধরণের প্রচ্ছন্ন পরস্পর সংলগ্নতা বজায় থাকে। বিভিন্ন ফার্মের দাম ও উৎপাদনের নীতি পরস্পর জড়াইয়া গিয়া

অলিগোপলিতে নানারূপ অবস্থা ও জটিলতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এই সকল কারণে অনেকে বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলিগোপলিতে ফার্মের দাম ও উৎপাদন নীতি অনিশ্চিত হইয়া পড়ে।

ধরিয়া লওয়া যাউক কোনো ফার্ম দামের ব্যাপারে তিন প্রকার পথ লইতে পারে: দাম বাড়ানো, দাম কমানো, এবং দাম সমান রাখা। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মও উহার প্রতিক্রিয়ায় এই তিনটি উপায় গ্রহণ করিতে পারে। ইহার ফলে নয়টি অবস্থা দিতে পারে, প্রতিটি অবস্থা তাহার মুনাফার পরিমাণে প্রভাব আনিবে। অধ্যাপক স্কিটভস্কি (Scitovsky) এইরূপ পরস্পর নির্ভরশীলতা ও অনিশ্চয়তা বুঝাইবার জন্য একটি সুন্দর তালিকার সাহায্য লইয়াছেন।*

উহার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মের বিভিন্ন পথ অবলম্বন

দাম-পরিবর্তনকারী ফার্মের বিভিন্ন পথ অবলম্বন

	↑	=	↓
↑	G	L	L
=	G	O	L
↓	G	G	L

এই তালিকাতে চারিটি স্তম্ভ (column) ও চারিটি সারি (row) আছে। একেবারে বাঁদিকের স্তম্ভের তিনটি সারিতে দেখান হইয়াছে দাম পরিবর্তনকারী ফার্মটি দাম বাড়াইতে পারে (↑ চিহ্ন), দাম সমান রাখিতে পারে (= চিহ্ন), এবং দাম কমাইতে পারে (↓ চিহ্ন)। তাহার প্রত্যেকটি কাজের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় ফার্মটি যে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পারে তাহা প্রথম সারিতে দেখান হইয়াছে। G হইল প্রথম ফার্মটির লাভ, L হইল তাহার লোকসান, এবং O হইল তাহার শূন্যাবস্থা, লাভ বা লোকসান কিছুই নয়। প্রথম ফার্মটি দাম বাড়াইলে প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় ফার্মটি যদি দাম বাড়ায়, তবে প্রথম ফার্মটির লাভ হইবে, দ্বিতীয়টি দাম সমান রাখিলে তাহাতে প্রথমটির লোকসান হইবে, দ্বিতীয়টি দাম কমাইলে (প্রথমটির) বেশি লোকসান হইবে। প্রথমটি দাম সমান রাখিয়াছে, এই অবস্থায় দ্বিতীয়টি দাম বাড়াইলে প্রথমের লাভ, দ্বিতীয়টি সমান রাখিলে প্রথমের শূন্যাবস্থা, সে দাম কমাইলে প্রথমের ক্ষতি। প্রথম দাম কমাইলে দ্বিতীয় যদি দাম বাড়ায় তবে প্রথমের লাভ, সে দাম সমান রাখিলেও প্রথমের লাভ, সে দাম কমাইলে প্রথমের ক্ষতি।

Scitovsky—*Welfare and Competition*, P, 386.

অলিগোপলিতে কেবলমাত্র দামের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে তাহা নহে। উপরন্তু, দ্রব্যের উৎকর্ষসাধন ও বিক্রয়-ব্যয়ের ভিত্তিতেও প্রতিযোগিতার তীব্রতা নিতান্ত কম নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মের উপর উহারও প্রায় সমান প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। পরস্পর নির্ভরশীলতার মাত্রা এত বেশি বলিয়া ফলাফলও অনিশ্চিত। অবশ্য কোনো ফার্ম যদি নেতা হিসাবে দেখা দেয় এবং অন্যেরা অনুচর হিসাবে তাহার দ্বারা নির্দিষ্ট দাম ও উৎপাদন নীতি অনুসরণে প্রস্তুত থাকে, তবে ফার্মগুলির দাম ও উৎপাদন পরিমাণে নির্দিষ্টতা আসে (determinate)। অনেক সময়ে অলিগোপলীয় ফার্মেরা প্রকাশ্য বা গোপন বোঝাবুঝি বা চুক্তির মাধ্যমে দাম স্থির করে এবং বাজার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে। কিন্তু একাধিক ফার্ম নেতা হইতে চাহিলে অবস্থা অনিশ্চিত। অনেকদিন পূর্বে 1838 সালে ফরাসী ধনবিজ্ঞানী অগাষ্টিন কুর্ণো ডুয়োপলির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির ফার্মের দাম ও উৎপাদন নির্দিষ্ট হওয়া সম্ভব, এইরূপ একটি নমুনা বা মডেল উপস্থিত করিয়াছিলেন।

অলিগোপলিতে দামের অপরিবর্তনশীলতা বা মোচড়ানো চাহিদা রেখা (Price rigidity under Oligopoly and Kinky Demand curve)

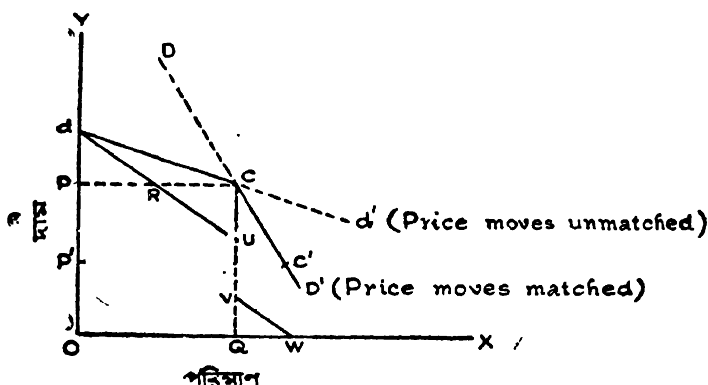
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের সম্মুখে তাহার দ্রব্যের জন্য চাহিদা রেখা-X-অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা রূপে প্রতিভাত হয়। অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে একচেটিয়া বা একচেটীয় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের সম্মুখে চাহিদারেখা ডাহিনে নিম্নাভিমুখী। কিন্তু অলিগোপলির ক্ষেত্রে ফার্মের সম্মুখে কোনো সুনির্দিষ্ট আকারের চাহিদা-রেখা থাকিতে পারে না। কোনো ফার্ম তাহার দাম বা বিক্রয় বদলাইলে প্রতিযোগী ফার্মগুলি তাহাদের দাম বা বিক্রয় নীতি কিরূপে বদলাইবে এই সম্পর্কে ফার্মকে আন্দাজ করিতে হয়। প্রতিযোগী ফার্মগুলির মনে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এবং তাহার স্থলে তাহারা বহু বিভিন্ন ধরণের দাম বা উৎপাদন নীতি গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং কোনো ফার্ম সঠিক ভাবে অনুমান করিয়া বলিতে পারে না দাম কমাইলে বা বাড়াইলে তাহার দ্রব্যের জন্য চাহিদারেখা কি আকার ধারণ করিবে। বিভিন্ন অনুমানের ভিত্তিতে সে তাহার সম্মুখে বিভিন্ন চাহিদা-রেখা দেখিতে পায়।

অধ্যাপক ক্যালডর (Nicholas Kaldor) 1934 সালে প্রথমে অলিগোপলীয় ফার্মের সম্মুখে চাহিদা-রেখা লইয়া আলোচনা শুরু করেন। তাঁহার পরে

অধ্যাপক সুইজি (Sweezy) ও তাঁহার পরবর্তী ধনবিজ্ঞানীরা অলিগোপলির অবস্থায় চাহিদা রেখার গড়ন সম্পর্কে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।

সুইজির অভিমতে অলিগোপলীয় বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য দামের অপরিবর্তনশীলতা। তিনি বলেন যে, এই অপরিবর্তনশীলতার কারণ হইল ফার্মের সম্মুখে চাহিদা-রেখার রূপ মোচড়ানো বা দোমড়ানো। দ্রব্যটির চলিত দামে ফার্মটি লক্ষ্য করে যে তাহার সম্মুখে চাহিদা রেখাটির উপর একটি মোচড় (kink) আছে। অর্থাৎ ফার্মটি যদি ঐ চলতি দাম হইতে একটু বেশি দাম দাবী করে তবে তাহার প্রতিযোগী ফার্মেরা দাম বাড়াইবে না, ফলে তাহার বিক্রয় কমিয়া যাইবে। সে দাম বাড়াইল অথচ অন্যেরা দাম সমান রাখিল—এই অবস্থায় তুলনামূলকভাবে তাহার দ্রব্যটি বেশি-দামী হওয়ায় প্রতিযোগী ফার্মগুলির দ্রব্যের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। আবার ফার্মটি যদি চল্‌তি দাম হইতে দাম কমাইয়া দেয় তাহা হইলে অন্যেরাও দাম কমাইবে। ইহার ফলে পরিবর্ত সামগ্রীগুলি হইতে চাহিদা তাহার দ্রব্যের দিকে সরিয়া আসিতে পারে না, ফলে বিক্রয় বেশি বাড়িবে না (কেবলমাত্র আয় প্রভাবের দরুণ অল্প একটু বিক্রয় বাড়িতে পারে)। অর্থাৎ, দাম-বৃদ্ধির অঞ্চলে চাহিদা-রেখাটি স্থিতিস্থাপক অল্প দাম বৃদ্ধিতে বিক্রয় বেশি কমিয়া যায়, ফার্মের মোট রেভিনিউ কমে; এবং দাম-হ্রাসের অঞ্চলে চাহিদা-রেখাটি অস্থিতিস্থাপক, অল্প একটু দাম কমিলে চাহিদা উহা অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পায়, মোট রেভিনিউ হ্রাস পায়। নিচের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

দুইটি অনুমানের ভিত্তিতে আমরা এই চিত্রটি আলোচনা করিতে পারি:



প্রথমত আমাদের ফার্মটি দাম কমাইলে অন্যান্য প্রতিযোগীরাও দাম কমাইয়া দেয় ফলে যে দাম কমাইল তাহার দ্রব্যের বিক্রয় বাড়িতে পারে না। এই

অবস্থায় ইহার সম্মুখে চাহিদা-রেখা DD´ তুলনামূলকভাবে অস্থিতিস্থাপক। দ্বিতীয়ত, মনে কর আমাদের কোম্পানী একমাত্র দাম কমাইল এবং অন্য কেহ দাম কমাইল না। ইহার ফলে চাহিদা অনেকটা বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ যদি কেহ তাহার দাম-পরিবর্তনকে অনুসরণ না করে তবে তাহার সম্মুখে চাহিদা-রেখা তুলনামূলকভাবে স্থিতিস্থাপক। যেমন, dd´। মনে কর, আমাদের ফার্মটি C বিন্দুতে আছে, অর্থাৎ OP দামে OQ বিক্রয় করিতেছে। স্যুইজির অভিমতে কোনো অলিগোপলীয় ফার্মের ক্ষেত্রে তাহার দাম-পরিবর্তন হইলে প্রতিযোগীদের মধ্যে নিম্নলিখিত ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতে পারে।

দাম কমাইলে: যদি আমাদের ফার্মটি দাম কমায় তখন প্রতিযোগীরা নিজেদের ক্রেতা হারাইবার ভয়ে নিজেদের দামও কমাইয়া দিবে। অর্থাৎ আমাদের ফার্মটি দেখিবে যে C বিন্দু হইতে দাম কমাইলে তাহার সম্মুখে চাহিদা রেখা হইল CD´ বা অস্থিতিস্থাপক।

দাম বাড়াইলে: যদি আমাদের ফার্মটি দাম বাড়াইয়া দেয় তবে তাহার প্রতিযোগীরা তাহাকে অনুসরণ করে না এবং ক্রেতারা তাহাকে ছাড়িয়া পরিবর্ত সামগ্রীর দিকে বা প্রতিযোগী ফার্মগুলির দিকে বেশি ঝুঁকিয়া পড়ে। অর্থাৎ দাম বাড়িলে তাহার সম্মুখের চাহিদা-রেখার রূপ হইল dc বা স্থিতিস্থাপক।

এইরূপে দেখা যায় যে অলিগোপলির কোনো ফার্মের সম্মুখে এই দুই অবস্থার মিলনের স্থল হিসাবে যে মোট চাহিদা-রেখা দেখা যায় তাহার গড়ন হইল dcD´, উহার C বিন্দুতে একটি মোচড় আছে এবং ফার্মটি OP দামে OQ বিক্রয় করিতেছে এবং কোনদিকে দাম পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা তাহার নাই। ইহারই ফলে দামের অপরিবর্তনীয়তা দেখা দিয়াছে।

অনুশীলনী

1. Distinguish between the concepts of pure and differentiated oligopoly.
2. Why is uncertainty of such great importance in oligopoly ?
3. Discuss the shape of the demand curve facing an oligopolist producer.
4. When the demand curve facing a firm is kinked ? What will be the optimum price and output ?

12

দাম-নিরূপণের বিবিধ সমস্যা

Miscellaneous problems of Pricing

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো একটি ফার্মের ভারসাম্যের অবস্থা আলোচনা করিয়াছি। সেই বিশ্লেষণের সময় আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, দ্রব্যসামগ্রীর প্রান্তিক উপযোগিতা এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় আমাদের জানা আছে, অথবা উহা আমরা বাহির করিতে পারি। এইরূপ অবস্থায় দ্রব্যের দাম ও ফার্মের ভারসাম্য কিরূপ অপেক্ষাকৃত সহজ, ইহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানে আমরা দামনিরূপণের সহিত জড়িত আরও কয়েকটি সমস্যা আলোচনা করিব।

আমাদের মনে রাখা দরকার, সমাজে কেবল একটি দ্রব্যই ক্রয় বিক্রয় হয় না, বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী একে অন্যের সহিত বিভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্কের দরুন একটি দ্রব্যের দামে উঠানামা অন্যান্য দ্রব্যের দামের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আমাদের তাই এইরূপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দামসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে। বাস্তব জীবনে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি কয়েকটি দ্রব্য একসঙ্গে ভোগ করে, এই অবস্থায় আমরা একত্রভাবে ঐ দ্রব্যসম্মিলনের প্রান্তিক উপযোগিতা জানিতে পারি, কিন্তু পৃথকভাবে একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতা বাহির করিতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রে একই উৎপাদন ধারার মধ্য দিয়া একাধিক দ্রব্য উৎপাদন হয়, অর্থাৎ একটি ফার্মে এক উৎপাদন ধারায় একাধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থায় প্রায় একটি দ্রব্যের পৃথক প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় বাহির করা চলে না। এইরূপ সংযুক্ত চাহিদা বা "সংযুক্ত যোগানের" ক্ষেত্রে দ্রব্যটির দাম কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহা আমাদের আলোচনা করা দরকার।

১ যুক্ত চাহিদা ও যোগান

আমরা এতক্ষণ আলোচনার সময় ধরিয়া লইয়াছি যে রাষ্ট্রের কোনরূপ কাজকর্মের দ্বারা দ্রব্যের দাম-নিরূপণ যেন প্রভাবিত হয় না। বাস্তবে কিন্তু

ইহা সত্য নয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা হিসাবে ব্যক্তির কাজকর্ম আধুনিক কালে বহু বিচিত্র উপায়ে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই রাষ্ট্রীয় প্রভাব-মুক্ত দাম নিরূপণ তত্ত্বের আলোচনা বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না। দাম নিরূপণের উপর সাধারণভাবে তিন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের প্রভাব আলোচনা করা প্রয়োজন।

দাম নিরূপণের উপর রাষ্ট্রীয় প্রভাব তিনদিক হইতে বিবেচ্য

অনেক সময় রাষ্ট্র দ্রব্যের উৎপাদন বা বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করে। কর আরোপের ফল দামের উপর কি হইবে এবং ইহার ফলে ফার্মের ভার-সাম্যবস্থায় কিরূপ পরিবর্তন আসিবে তাহা জানা দরকার। দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া ফার্মের মুনাফা কমাইবার অভিপ্রায়ে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ (price control) করে। দামের এবং ফার্মের উপর রাষ্ট্রীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রভাবও জানা প্রয়োজন।

কর আরোপণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সর্বোপরি, আধুনিক জগতে প্রায় প্রতিটি দেশেই রাষ্ট্রের মালিকানায় ও পরিচালনায় দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে। ক্রেতার সার্বভৌমতা এবং উদ্যোক্তার স্বাধীনতা এই সকল দেশে সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংগঠনের এই ঝোঁক প্রবল হওয়ায় রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে ভোগ, উৎপাদন ও দামনিরূপণের কাজ চলিতেছে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া অথবা অলিগোপলি, বাজারে এই সকল রূপের কোনটিই বাস্তব জীবনে দেখা যায় না। ক্রেতা ও বিক্রেতাগোষ্ঠীর পারস্পরিক কাজকর্মের ফলস্বরূপ দাম স্থির হইবে, এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতির বাস্তব কার্যকারিতা, প্রয়োগগত বা ব্যবহারিক উপযোগিতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে অথবা রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক দেশে পরিকল্পনা কমিশন অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক দাম নিরূপণের বিবিধ সমস্যা আমাদের আলোচনা করিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় দাম নিরূপণ

সংযুক্ত যোগান ও চাহিদা (Joint Demand and Supply)

দামসমূহের পরস্পর নির্ভরশীলতা কাহাকে বলে (Interdependent prices)

কোনো দ্রব্যের দামে পরিবর্তনের প্রভাব শুধু সেই দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের উপরেই আবদ্ধ থাকে না ; সেই দ্রব্যটির সহিত চাহিদা ও যোগানের দিক দিয়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের উপরেও পড়ে। সুতরাং কোনো দ্রব্যের দামে পরিবর্তন হইলে অন্যান্য দ্রব্যের দামও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। একটি

দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের সহিত এই সকল অন্যান্য দ্রব্যের দামে পরিবর্তন চারি প্রকারে যুক্ত থাকিতে পারে বলিয়া মনে করা হয়।

প্রথমত, সংযুক্ত যোগান (Joint Supply)। অনেক দ্রব্য এরূপ আছে যাহারা একই উৎপাদন-ধারায় উৎপন্ন হয়; তখন একটি দ্রব্য অপর প্রধান দ্রব্যটির (Main-product) উপদ্রব্য (By-product); যেমন—ধান ও খড়, পশম ও মাংস, গ্যাস ও কোক ইত্যাদি। ইহাদের সহোৎপন্ন দ্রব্য (Joint product), সংযুক্ত যোগান সামগ্রী বা যুক্তদ্রব্য বলা হয়।

যদি ইহার মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম বাড়ে, তাহা হইলে উহার উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অপর দ্রব্যটির উৎপাদনও বাড়িয়া যায়। কিন্তু উহার জন্য চাহিদা স্থির থাকায় যোগান-বৃদ্ধির ফলে তাহার দাম কমিয়া যায়। অপর পক্ষে, যদি দ্রব্যের দাম কমে, তবে তাহার উৎপাদন কমাইলে অন্য দ্রব্যটির উৎপাদন ও যোগান কমিবে এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে সংযুক্ত-যোগানের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দামে পরিবর্তনের ফলে অপর দ্রব্যটির দাম পরিবর্তিত হয়।

দ্বিতীয়ত, সংযুক্ত চাহিদা (Joint Demand)। একই অভাব মিটাইবার জন্য যখন কয়েকটি দ্রব্যের একত্রে চাহিদা হয়, যখন সেই সকল দ্রব্যকে সংযুক্ত-চাহিদা দ্রব্য বলা হয়। এই সকল দ্রব্য একটি অপরটির অনুপূরক (Complementary goods)। অনুপূরক দ্রব্যসমূহের দামও পরস্পরের বিপরীতাভিমুখী। কলমের দাম কমিলে উহার চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কালির চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার দাম বাড়িবে। ইহাদের মধ্যে একটি দুষ্প্রাপ্যতর (Scarcer) হইয়া উঠিলে অপরটির দাম কমিবার সম্ভাবনা, কারণ ইহার চাহিদাও কমিয়া যাইবে।

তৃতীয়ত, মিশ্রিত যোগান (Composite Supply)। একটি অভাব মিটাইতে পারে এইরূপ প্রতিযোগী বহু দ্রব্য থাকিতে পারে। ইহারা পরস্পরের প্রতিযোগী সামগ্রী, ইহাদের একটিকে অন্যের পরিবর্ত-দ্রব্যও বলা চলে। প্রতিযোগী সামগ্রীসমূহের দাম সাধারণত একই দিকে পরিবর্তিত হয়। যেমন চায়ের দাম বাড়িলে কফির চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। চায়ের দাম কমিলে, কফির চাহিদা কমিবার ফলে উহারও দাম কমিয়া যাইতে পারে।

চতুর্থত, মিশ্রিত চাহিদা (Composite Demand)। যদি বিভিন্ন কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি দ্রব্যের চাহিদা হয় তাহা হইলে তাহাকে মিশ্রিত চাহিদা (Composite demand) বলা হয়। যেমন—আলো জ্বালানো, যন্ত্র চালানো, প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লোকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে।

এক ব্যবহারে উহার দাম বৃদ্ধি পাইলে সকল ব্যবহারেই উহার দাম বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায়।

সহোৎপন্ন দ্রব্যের দাম নিরূপণ (Pricing of Joint products)

কোনো একটি ফার্ম ইচ্ছা করিয়া বা বাধ্য হইয়া একসঙ্গে একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। অনেক সময়ে দেখা যায়, একটি দ্রব্য উৎপাদন করিলে অপর কোনো দ্রব্য সস্তায় উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন, A দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে কম ব্যয়ে B দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় সম্ভবপর হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ফার্মটি ইচ্ছা করিয়া উভয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতেছে এইরূপ সম্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে টেক্‌নিকাল বা প্রাকৃতিক কারণে একটি দ্রব্যের উৎপাদনের ফলে অপর কোনো দ্রব্য আপনা-আপনি উৎপন্ন হইয়া যায়; ফার্মটি বাধ্য হইয়া অবস্থার চাপে একই উৎপাদনধারায় একাধিক দ্রব্যকে উৎপাদন করিতেছে, এইরূপ ঘটিতে পারে। এই অবস্থায় এই সকল দ্রব্য বলা হয় সহোৎপন্ন দ্রব্য (joint products) এবং উৎপাদন ধারার এই অবস্থার নাম হইল সহোৎপাদন (joint production); যেমন, পশম ও মাংস, ধান ও খড় গ্যাস ও কোক প্রভৃতি।*

সহোৎপাদন কাহাকে বলে

এই সকল সহোৎপন্ন দ্রব্যসমূহের দামনির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অসুবিধা হইল যে, প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক উৎপাদন-ব্যয় জানা যায় না। ইহাদের একত্র উৎপাদনের মোট ব্যয় জানা আছে, কিন্তু প্রতিটি দ্রব্যের পৃথক প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন ব্যয় জানা নাই। অথচ দ্রব্যের দাম, দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে উহার গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে। এইরূপ অবস্থায় দ্রব্যের দাম নিরূপণ হইবে কি ভাবে?

উৎপাদন ধারা হইতে যে-অনুপাতে এই দ্রব্যগুলি উৎপন্ন হয় তাহা স্থির (Fixed) বা পরিবর্তনীয় (Variable) হইতে পারে। দুই বা ততোধিক দ্রব্য যদি কেবলমাত্র স্থির অনুপাতেই উৎপন্ন হইতে থাকে—যেমন 1 ইউনিট A উৎপাদনের সহিত যদি সর্বদাই 2 ইউনিট A উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দাম নিরূপণের কোনো অসুবিধা নাই। আমরা 1A+2B এই যোগসমষ্টিকেই

উৎপন্ন দ্রব্যগুলির অনুপাত স্থির হইতে পারে

* "........Of things which cannot *easily* be produced seperately; but are joined in a common origin and may therefore be said to have a *joint supply* such as beef and hides or wheat and straw. Marshall, *Principles*, P. 853.

এক ইউনিট বলিয়া মনে করিতে পারি। উভয়ের এই মিলিত যোগসমষ্টিকে আমরা একটি নূতন দ্রব্য যেমন X বলিয়া মানিয়া লইতে পারি। এখন X দ্রব্যটির বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের গড় ও প্রান্তিক ব্যয় অনুযায়ী উহার ব্যয়-রেখাগুলি বাহির করাও আর অসুবিধাজনক নয়। ফার্ম যদি দামগ্রহীতা (Price taker) হয়, তবে A ও B দ্রব্য দুইটিকে দুই বাজারের চলতি দামে সে বিক্রয় করিতে পারিবে। এইরূপে তাহার মোট রেভিনিউ-রেখার আকৃতিও বাহির করা সম্ভবপর। ব্যয় ও রেভিনিউ-রেখা জানিতে পারিলে ফার্মের উৎপাদন ও বিক্রয়-পরিকল্পনা জানিতে পারা যায়।

A অথবা B দ্রব্যের প্রত্যাশিত দামে পরিবর্তন আসিলে ফার্মের এই বিক্রয় পরিকল্পনা বদলাইয়া যায়। যেমন,A-র দাম যদি বাড়ে অথচ B-র দাম সমান থাকে, তবে A ও B-র উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে। A-র দাম বদলাইলে বিভিন্ন দামে কি-পরিমাণ A বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিবে তাহা সাজাইয়া আমরা A-র যোগান রেখা গঠন করিতে পারি। এইরূপে B-র যোগান রেখাও গঠন করা চলে। সাধারণ যোগান রেখার সহিত সহোৎপন্ন যোগান-রেখার পার্থক্য হইল একটুকু যে, A দ্রব্যের যোগান-রেখা B দ্রব্যের দামের উপর কিছুটা নির্ভরশীল, কারণ B দ্রব্যের দাম বাড়িলে বা কমিলে উৎপাদন বাড়াইবার বা কমাইবার ফলে A দ্রব্যের উৎপাদনও আপনা-আপনি বাড়িবে বা কমিবে।

দাম কিরূপে স্থির হয়

সহোৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে যদি পরিবর্তনীয় অনুপাতে উৎপাদন করা যায় তবে বিষয়টি একটু জটিল হইয়া পড়ে। অবশ্য এক্ষেত্রে ফার্ম দুই (বা ততোধিক) দ্রব্যের বিভিন্ন সম্মিলনের নিম্নতম মোট ব্যয় জানিতে পারে এবং উহাদের দাম ও চাহিদা জানা থাকিলে প্রতিটি সম্মিলন হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ-এর হিসাব করিতে পারে। ব্যয় ও রেভিনিউর এই সকল তথ্য জানা থাকিলে ফার্মের পক্ষে সর্বাধিক সুবিধাজনক উৎপাদন ও বিক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব।

অনুপাত পরিবর্তনের যোগ্য হইলে

দামের উপর সরকারের প্রভাব (Influence of Government on Prices)

কর আরোপের ফলাফল (Effects of Taxes)

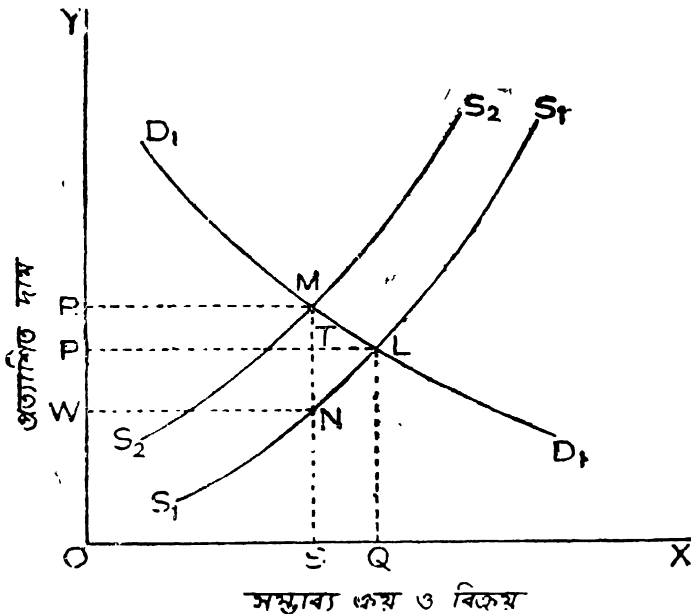
আধুনিক কালে প্রতিটি দেশের সরকারই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করিয়া থাকেন। এইরূপ কর আরোপের কি

ফলাফল হইতে পারে, তাহা আলোচনা করা দরকার। নীচের ছবি হইতে ইহা অনেকটা বোঝা যাইবে।

কর আরোপের পূর্বে চাহিদা ও যোগানের অবস্থা D_1D_1 এবং S_1S_1 রেখা দুইটির দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। OP হইল ভারসাম্যের দাম, আলোচ্য সময়ের মধ্যে OQ পরিমাণ ক্রয় ও বিক্রয় হইতেছে। মনে কর, প্রতি-ইউনিট বিক্রয়ের উপর সরকার কিছু পরিমাণ (50 পঃ বা 1 টাকা) কর ধার্য করিল।

যোগান রেখার অবস্থানে পরিবর্তন

করের ফলে তৎক্ষণাৎ যোগান রেখা ইউনিট-প্রতি করের পরিমাণ অনুযায়ী বাম দিকে সরিয়া যাইবে। কারণ প্রতিটি বিক্রেতা নিজের মনে এইরূপ চিন্তা করিবে: আমার উৎপাদন ব্যয় নির্দিষ্ট আছে, এই অবস্থায় আমাকে ইউনিট পিছু 1 টাকা পাইতে হইলে আমি 100 ইউনিট উৎপাদন করিব। সরকার যদি আমার নিকট 50 পঃ কর আদায় করে, তবে এই সর্বাধিক নীট রেভিনিউ বজায় রাখিতে গেলে ক্রেতারা ইউনিট-পিছু টাঃ 1·50 পঃ দিবে। কর আরোপের পরে, তাই ভারসাম্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়া OR হইয়াছে, এবং সেই সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ



হ্রাস পাইয়া OS হইয়াছে। পূর্বেকার ভারসাম্য বিন্দুর (L) সহিত

পরবর্তী ভারসাম্য বিন্দুর (M) তুলনা করিলে আমরা করের ফলাফল পরিমাপ করিতে পারি। ক্রেতা এখন QS (=LT) পরিমাণ কম দ্রব্যের জন্য ইউনিট-প্রতি PR (=MT) পরিমাণ বেশি দাম দিতেছে ; বিক্রেতারা OS পরিমাণ বিক্রয়ের উপর ইউনিট-পিছু TN কম পাইতেছে। কর আরোপনের পরে অর্থাৎ করোত্তর ভারসাম্যে (post-tax equilibrium) আলোচ্য সময়ের মধ্যে ক্রেতারা OSMR ব্যয় করে, ইহার মধ্যে WNMR সরকারকে দিয়া বিক্রেতারা মোট OSNW নিজেরা পাইতে পারে। চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, ইউনিট-পিছু MN কর আরোপ করিলে MT বহন করে ক্রেতারা এবং TN বহন করে বিক্রেতারা।

কে কতটা বহন করিবে তাহা নির্ভর করে

দ্রব্যটির দামের অনুপাতে কর যদি খুবই কম হয়, তবে দেখানো যায় যে, TN-র সহিত MT-র অনুপাত (the ratio of MT to TN) নিশ্চয়ই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহিত যোগানের স্থিতিস্থাপকতার অনুপাতের সমান। এই সকল স্থিতিস্থাপকতার মান বা শক্তি জানিতে পারিলে আমরা উৎপাদন ও দামের উপর করের আপেক্ষিক চাপ আন্দাজ করিতে পারি। চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যত কম, উৎপাদন তত কম হ্রাস পাইবে, দামও তত বৃদ্ধি পাইবে। চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি, উৎপাদন হ্রাস পাইবে তত বেশি, দামবৃদ্ধিও হইবে তত কম।

যোগান ও চাহিদা-রেখার ঢালের উপর

দাম-নিয়ন্ত্রণ (Price Control)

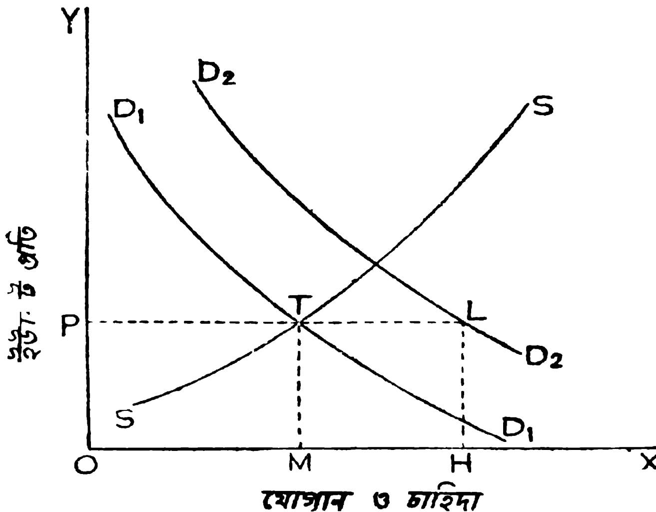
আধুনিক কালের ধন-বিজ্ঞানীরা দামতত্ত্ব আলোচনার সময়ে এমন সামাজিক পরিবেশ কল্পনা করেন যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতারা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করিয়া ভারসাম্যে পৌছিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আজকাল রাষ্ট্রও অনেকক্ষেত্রে দাম-নিরূপণের উপর নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় দেখা যায়, অবশ্য-প্রয়োজনীয় কোনো ভোগ্য দ্রব্য বা উৎপাদক দ্রব্যের যোগান বাজারে চাহিদার তুলনায় খুবই কম। এই অবস্থায় ঐ দ্রব্যের উৎপাদক বা বিক্রেতাগণ প্রচুর মুনাফা করিতে পারেন, ঐ দ্রব্যের ব্যবহারকারী ক্ষতিগ্রস্ত হন। অপর একটি অবস্থা কল্পনা করা যাউক। কোনো দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলে পূর্বের ভারসাম্য বিন্দু হইতে দাম এখন নিশ্চয় উপরে উঠিতে

কি অবস্থায় দাম নিয়ন্ত্রণের কথা আসে

চাহিবে। কিন্তু হয়ত সরকার মনে করেন যে, পূর্বের ভারসাম্য-দাম বজায় থাকা উচিত বা দরকার। এই অবস্থায় রাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করিয়া সেই দামের ঊর্ধ্বে ক্রয় বা বিক্রয় আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিতে পারে।

1. পূর্বের ভারসাম্য বিন্দুতে ঊর্ধ্বতম দাম স্থির করা

এইরূপ দাম-নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্মের আচরণ কি ভাবে পরিবর্তিত হইবে তাহা আলোচনা করা দরকার। নীচের চিত্রটি হইতে ইহা দেখা যাইতেছে। D_1D_1 এবং SS হইল চাহিদা ও যোগান রেখা, OP ভারসাম্যের দাম, সকল ফার্ম মিলিয়া OM পরিমাণ যোগান দিতেছে। এই অবস্থায় চাহিদার বৃদ্ধি পাইল, পূর্বের চাহিদা রেখা D_1D_1 ডানদিকে সরিয়া গিয়া নূতন চাহিদা রেখা D_2D_2 দেখা দিলে। পূর্বের চাহিদা ছিল OM, বর্তমানে চাহিদা হইল OH, সরকার OP দাম সর্বোচ্চ সীমা বলিয়া ঘোষণা করিল। এই দামে যোগান হইল OM, তাই এই অবস্থায় MH পরিমাণ বাড়তি চাহিদা (excess demand) দেখা যাইতেছে।



যোগান ও চাহিদা

দাম নিয়ন্ত্রণ যদি সম্পূর্ণ সফল হয় অর্থাৎ সরকার যদি দক্ষ হয়, তবে এই অবস্থা অনির্দিষ্টকাল ধরিয়া চলিতে পারে, কারণ উৎপাদন বা ব্যবসায়ী কেহই নিয়ন্ত্রিত দাম অপেক্ষা বেশি দাম চাহিতে পারে না। যতদিন বাজারের দাম বাড়ান না যায়, ততদিন এই বাড়্তি চাহিদা-র বিলোপ সম্ভব নয়। OH মোট চাহিদা অথচ OM হইল যোগান, এই অবস্থায় ঐ দামে সকল ক্রেতার

চাহিদা কিছুতেই মিটিতে পারে না। প্রতিটি ক্রেতার প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী দ্রব্যটি স্বাভাবিকভাবে বণ্টিত হইতে পারে না। বিক্রেতারা যখন কি ভাবে সকলের মধ্যে কম পরিমাণ দ্রব্য বণ্টন করিয়া দিবে সেই সম্পর্কে বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করিতে থাকে। কোনো কোনো ফার্ম এইরূপ নীতি অবলম্বন করে যে, আগে আসিলে আগে পাইবে (first come first served) অনেক সময়ে তাহারা টেবিলের তলায় লুকাইয়া রাখিতে পারে এবং ক্রেতার অতীত ক্রয়ের পরিমাণ বা আচরণ বিচার করিয়া অথবা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বা হাতে রাখার উদ্দেশ্যে বা বিভিন্নপ্রকার অন্যায় সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য বিশেষ কোনো কোনো ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিতে পারে। নিজেদের এই সকল পদ্ধতির মধ্য দিয়া বিক্রেতারা আপনা-আপনি একপ্রকার রেশনিং ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে। এই অবস্থা সরকারের মনোমত না হইলে রাষ্ট্র নিজে ব্যবস্থা করিয়া সরকারী রেশনিং (Rationing) প্রবর্তন করে। OM পরিমাণ দ্রব্যকে মোট ক্রেতার বা জনসংখ্যার পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে ক্রেতা-পিছু বা জনসাধারণের মাথা-পিছু কোটা (Quota) পাওয়া যায়। ক্রেতাদের হাতে রেশন কুপন দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা কোটা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ দ্রব্য কিনিতে পারে।

সরকার দক্ষ হইলেও রেশনিং ও কোটার দরকার

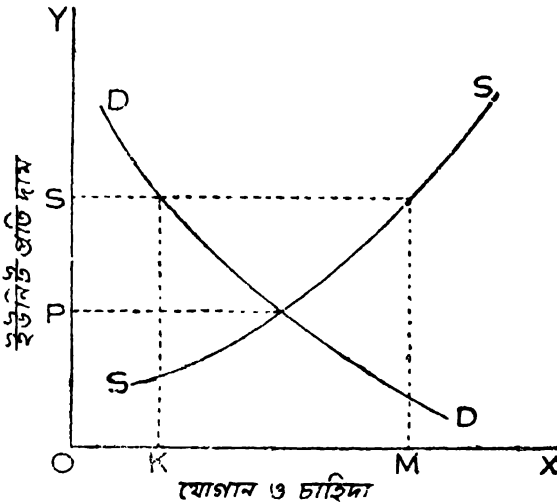
সরকার যদি কোটা ও রেশনিং প্রথার প্রবর্তন না করে অথবা তাহা উপযুক্তভাবে কার্যকরী করিতে পারে, অর্থাৎ যদি দক্ষ না হয়, তবে দাম-নিয়ন্ত্রণের স্থলে কালোবাজার (black market) দেখা দিবে। সরকার-নির্ধারিত দামের বেশি দামে গোপনে বিক্রয় হওয়াকে কালোবাজার বলে। কালোবাজারের দাম কতদূর উপরে উঠিবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে চাহিদার তীব্রতার উপর। সকল বিক্রেতা যদি কালোবাজারে একই দাম বা সমান দাম চায়, তবে বলা যায় যে, কালোবাজারী দাম ততখানি উপরে উঠিবে যাহাতে সেই 'বাড়তি চাহিদা'-র বিলোপ ঘটে এবং চাহিদা ও যোগানের মধ্যে এক ধরনের কালোবাজারী ভারসাম্য (blackmarket equilibrium) স্থাপিত হয়। এই অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকার কোনো সম্ভাবনা-ই আর থাকে না। প্রত্যেক বিক্রেতাই এক একজন দাম-প্রভেদকারী একচেটিয়া-দারে (discriminating monopolist) পরিণত হয়।

সরকার দক্ষ না হইলে কালোবাজার দেখা দিবে

প্রতিটি ক্রেতার নিকট হইতে প্রতিটি ইউনিটের জন্য বিক্রেতা এমন দাম আদায় করিতে চেষ্টা করে, যাহাতে ক্রেতা কোনরূপ ভোগোদ্বৃত্ত না পায়।

দ্বিতীয়ত, আমরা এইরূপ অবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারি যে (বর্তমানে বিভিন্ন উপাদানের দাম বাড়িয়া যাওয়ায়) পুরানো ভারসাম্যের দামে অধিকাংশ ফার্মের মোট রেভিনিউ মোট ব্যয় অপেক্ষা কম। এই সকল ফার্ম কালপ্রবাহে উঠিয়া যাইবে, শিল্পে ফার্মের সংখ্যা হ্রাস পাইবে। বহুবিধ কারণে—রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক বা মানবিক—রাষ্ট্র মনে করিতে পারে যে, এইরূপ উচিত নয়। এই অবস্থা রোধ করার উদ্দেশ্যে সরকার এমন বিন্দুতে দাম বাঁধিয়া দিতে পারে যাহা ভারসাম্যের উপরে। নিচের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে, সরকারী দাম নির্দিষ্ট হইয়াছে OS.

2. ভারসাম্য বিন্দুর উপরের উর্ধ্বতম দাম স্থির করা



সরকারী-নির্দিষ্ট এই OS দামে সকল ফার্ম মিলিয়া OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে, কিন্তু এই দামে চাহিদা হইবে মাত্র OK, অর্থাৎ এই দামে চাহিদার তুলনায় 'বাড়তি যোগান' (excess supply) KM. এই বাড়্তি যোগান অনির্দিষ্ট কালের জন্য মজুত করিয়া রাখা সম্ভব নয়, তাই কোনো ফার্ম (অন্তত যাহাদের উৎপাদন ব্যয় সরকারী দাম অপেক্ষা কম) দাম একটু কমাইয়া নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করার চেষ্টা করিতে থাকিবে। সকলে এইরূপ চেষ্টা করিতে থাকিলে দাম হ্রাস পাইয়া OP বিন্দুতে পৌছিবে। সরকার

সরকারী দাম রক্ষা-নীতি (Price Support policy)

যদি তাহা না চায়, সে যদি দাম OS বিন্দুতেই বাঁধিয়া রাখিতে চায়, তবে রাষ্ট্র বা কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ঐ KM পরিমাণ ক্রয় করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে থাকিবে বা দেশের বাহিরে কোনো বাজারে পাঠাইয়া দিতে থাকিবে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে ব্রেজিলের কফি উৎপাদনের কিছু অংশ সেখানকার রাষ্ট্র কিনিয়া লইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিত, অথবা বর্তমানে যেমন মার্কিন সরকার নিজের দেশে গমের দাম বেশি রাখার উদ্দেশ্যে বাৎসরিক গম উৎপাদনের এক অংশ কিনিয়া লইয়া বিদেশে ঋণ বা সাহায্যের নামে প্রেরণ করে।

ফাটকা ব্যবসা (Speculation)

ভবিষ্যতের দাম-পরিবর্তন পূর্বে অনুমান করিয়া সেই দাম-পরিবর্তন হইতে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মারফৎ মুনাফা করার নাম ফাট্‌কা ব্যবসায়। যদি ফাট্‌কা ব্যবসায়ীর ধারণা হয় যে, ভবিষ্যতে দ্রব্যটির দাম কমিবে তাহা হইলে সে তাহার সকল মজুত দ্রব্য বর্তমানে চড়া দামে বিক্রয় করিয়া দিবে। অপর পক্ষে, যদি তাহার ধারণা হয় যে ভবিষ্যতে দ্রব্যটির দাম বাড়িবে তাহা হইলে বর্তমানের কম দামে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য সে মজুত করিবে। ভবিষ্যতের দাম-পরিবর্তন সম্বন্ধে ফাট্‌কা ব্যবসায়ীর ধারণা সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহার লাভ হইবে, ভুল প্রমাণিত হইলে তাহার লোকসান হইবে। দ্রব্যের দামে পরিবর্তন লইয়া সে ব্যবসায় করিতেছে সেই দ্রব্যটিকে বাস্তবে মজুত করার দরকারও তাহার হয় না। যদি তাহার ধারণা হয় যে ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে, তাহা হইলে সে বর্তমানের দরে উৎপাদকের সহিত ভবিষ্যতে যোগান পাইবার জন্য চুক্তি করিয়া রাখে, নিজের নিকট মাল মজুত রাখার প্রয়োজন হয় না। যদি ভবিষ্যতে দাম কমিবে এরূপ ধারণা তাহার হয় তাহা হইলে সে ঐ দ্রব্যের কোনো ক্রেতাকে বর্তমানের বেশি দরে ভবিষ্যতে যোগান দিবে এইরূপ অগ্রিম চুক্তি করে। উভয়ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ দামের গতিবিধি সম্বন্ধে তাহার ধারণা সঠিক হইলে, অর্থাৎ দামের পরিবর্তন সঠিক আন্দাজ করিতে পারার দরুণ সে মুনাফা করিতে পারে।

দাম পরিবর্তনের ঝুঁকি লইয়াই ব্যবসায়

যখন একটি দ্রব্যের দাম কোনো বাজারে কম থাকে এবং কোনো বাজারে বেশি থাকে তখন ব্যবসায়ীরা কম দামী বাজার হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া বেশি-দামী বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করে। ইহাকে বলা হয় আরবিট্রেজ (Arbitrage)। ফাট্‌কা ব্যবসায়ও বিভিন্ন সময়ের মধ্যে একপ্রকারের আরবিট্রেজ্‌।

চাহিদা কিরূপ থাকিবে তাহা আন্দাজে ধরিয়া লইয়া বর্তমানে ফার্মসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা যায়। আধুনিক কালে উৎপাদনধারা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে এবং তাহা সময় সাপেক্ষ। উৎপাদন সুরু ও উৎপাদন শেষের মধ্যে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়; ইতিমধ্যে চাহিদা পরিবর্তিত হইতে পারে উৎপাদনের ব্যয়েও পরিবর্তন আসা অসম্ভব নহে। এমন অবস্থায় প্রায় সমস্ত উৎপাদন প্রচেষ্টা স্বভাবতই ঝুঁকিবহুল। ফাট্‌কা ব্যবসাদার উৎপাদন সুরু হইবার সময়েই উৎপাদকের সহিত দ্রব্য ক্রয়ের অথবা কাঁচামাল বিক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রিম চুক্তি করায় উৎপাদকের নিজস্ব ঝুঁকি অনেকটা কমিয়া যায়, ইহার ফলে সে অধিকতর মনোযোগের সহিত দ্রব্যের উৎপাদন চালাইতে পারে। এই ভাবে ঝুঁকি বহন করা আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাকে বিশেষত্বশীল কার্য বলিয়া (Specialized function) ধরা হইতেছে। শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের একটি ফল হইল শুধু মাত্র ঝুঁকি লইয়া ব্যবসায় করা বা ফাট্‌কা ব্যবসায়।

গতিশীল জগতের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ফাট্‌কা ব্যবসায়ের ভিত্তি

ফাট্‌কা ব্যবসায়ের সহিত জুয়ার লেনদেনের (Gambling) পার্থক্য আছে। জুয়ারী যে ধরনেব বাজী ফেলেন তাহা উৎপাদন কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এবং কোনো অর্থনৈতিক উপকার উহার দ্বারা সাধিত হয় না। রাজস্থান ও মোহনবাগান মধ্যে যে জিতিবে এবং কে কয় গোলে জিতিবে তাহা লইয়া বাজী ধরায় সমাজের কোনো অর্থনৈতিক উপকার হয় না, কারণ ইহা উৎপাদন ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। দাম-পরিবর্তন যে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এবং সমাজের গতিশীলতার সহিত যে উঠানামা জড়িত, সেই স্বাভাবিক পরিবর্তনের ঝুঁকি যে ব্যবসায়ে বহন করা হয় সমাজের পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয়।

জুয়া ও ফাটকার পার্থক্য

সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই ফাট্‌কা ব্যবসায় চালান সম্ভব নহে, কোনো দ্রব্য লইয়া ফাট্‌কা ব্যবসায় গড়িয়া উঠিবার পক্ষে উপযোগী বৈশিষ্ট্য তাহার থাকা প্রয়োজন। (ক) দ্রব্যটির জন্য বিপুল চাহিদা থাকিতে হইবে, তাহা না হইলে ভবিষ্যতে বিক্রয় করার অসুবিধা হইবে। এই চহিদা নিয়মিত হওয়া দরকার, তাহা না হইলে উহার দামের পরিবর্তন লইয়া ব্যবসায় করা চলে না। যেমন তুলা, গম, ধান ইত্যাদি। (খ) দ্রব্যটি সম্পূর্ণ একজাতীয় হইতে হইবে (standardised)। যদি দ্রব্যটির বহু রকম থাকে তাহা হইলে প্রতিটি রকমের বৈশিষ্ট্য ও মান

ফাট্‌কাবাজার সৃষ্টির শর্তসমূহ

নির্দিষ্ট থাকিতে হইবে। (গ) দ্রব্যটি দেখিয়াই সহজে চিনিতে পারার উপযোগী হওয়া চাই, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রতীয়মানতা (cognizability) থাকা চাই। (ঘ) দ্রব্যটির যোগান যত অনিশ্চিত হইবে ও মানুষের আয়ত্তের বাহিরে থাকিবে ততই তাহার দাম পরিবর্তন লইয়া ব্যবসায় করার সুবিধা হইবে। বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য এবং কোম্পানীর শেয়ার বা স্টকসমূহ ফাট্‌কা ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সামগ্রী। কোম্পানীর শেয়ার হইতে ভবিষ্যতে কিরূপ লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে এবং কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হইবে তাহার ভিত্তিতে উহার শেয়ারের দামের ভবিষ্যৎ-পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি লইয়া ব্যবসায় চালান আধুনিক জগতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ফাট্‌কা বাজারের সংগঠন (Organisation of Speculative Markets)

দ্রব্যের দামের পরিবর্তন লইয়া যে ব্যবসায় তাহা চলে দ্রব্যের ফাট্‌কা-বাজারে (Produce-exchanges), আর শেয়ারের দামে পরিবর্তন লইয়া ফাট্‌কা ব্যবসায় চলে শেয়ার বাজারে (Stock exchanges)।

শেয়ার বাজারে দুই জাতীয় লোক থাকে, মূল শেয়ার ব্যবসায়ী (Jobbers) ও দালাল (Brokers)। শেয়ারের মূল ব্যবসায়ীরা শেয়ার লইয়া আসল ব্যবসায় করে এবং শেয়ারেব ক্রয়-বিক্রয় দাম মোটামুটিভাবে স্থির করে। সেই দাম লইয়া দালালরা জনসাধারণের নিকট শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যায়। মূল শেয়ার-ব্যবসায়ীরাই আসলে ফাট্‌কাদার (Speculator), দালালেরা তাহাদের অনুচর মাত্র, ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণের উপর কমিশন পাইয়া কাজ করিয়া থাকে।

যদি ফাট্‌কা ব্যবসায়ীদের ধারণা হয় যে, ভবিষ্যতে দাম কমিয়া যাইবে তাহা হইল বর্তমানের দরে ভবিষ্যতে যোগান দিবে এইরূপ অগ্রিম চুক্তি করিয়া লয় এবং ভবিষ্যতে দ্রব্যের দাম কমিলে তাহা কম দামে ক্রয় করিয়া পূর্বের দামে যোগান দিয়া লাভ করে। কিন্তু ভবিষ্যতে দাম না কমিলে তাহার লোকসান হইবে, তাই সে লোকসানের সম্ভাবনা এড়াইতে চায়। এই উদ্দেশ্যে সে অপর ব্যবসায়ীর সহিত একই সময়ে অগ্রিম চুক্তির দ্বারা তাহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে কম দামে দ্রব্য ক্রয় করিবার ব্যবস্থা বর্তমানেই করিয়া রাখে। এইরূপে এক ঝুঁকির দ্বারা অন্য ঝুঁকি হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। ইহাকে ব্যবসায়ীদের চলতি ভাষায়

ফাট্‌কা ব্যবসায় পদ্ধতি

হজ্‌ করা (Hedging) বলে। যে ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে দাম কমিবে এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া বর্তমানের দরে ভবিষ্যতে যোগান দিবে বলিয়া অগ্রিম চুক্তি করে অথবা বর্তমানে অধিক বিক্রয়ের চেষ্টা করে, তাহাদের কার্যের ফলে দাম কমিয়া আসিতে চাহে, এইজন্য তাহাদের মন্দীওয়ালা (Bears) বলা হয়। অপর পক্ষে, যাহারা ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে এই আশায় বর্তমানে দ্রব্য মজুত রাখে অথবা ভবিষ্যতে তখনকার দামে যোগান দিবে বলিয়া অগ্রিম চুক্তি করে, তাহারা তাহাদের কার্যের ফলে দাম বাড়াইয়া দেয়। তাহাদের তেজীওয়ালা (Bulls) বলে।

ফাট্‌কা ব্যবসায়ের উপকার (Benefits of Speculation)

(ক) ফাট্‌কা ব্যবসায়ের ফলে উৎপাদকের ঝুঁকি কমিয়া যায় : দ্রব্য বিক্রয় বা কাঁচামালের যোগানে উভয় ব্যাপারেই নিশ্চিত থাকিয়া সে উৎপাদনে মনোনিয়োগ করিতে পারে। উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দামের তারতম্য কমিয়া আসে। দ্রব্যের বিভিন্ন ধরন ও প্রকারের মধ্যে দামের সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

(খ) বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দামের উঠানামার তীব্রতা কমাইয়া দেওয়া এইরূপ ফাট্‌কা ব্যবসায়ের অন্যতম কার্য। ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে এইরূপ আশায় বর্তমানে দ্রব্য মজুত রাখিয়া তাহারা বর্তমানের যোগান কমাইয়া দেয় এবং ভবিষ্যতের যোগান বাড়াইয়া দেয়। ফলে বর্তমানেই দাম বাড়িবার ঝোঁক দেখা দেয়, ভবিষ্যতে যোগান বৃদ্ধির ফলে দাম ততটা বাড়িতে পারে না। বাজারে যদি অনেক ফাটকাদার থাকে এবং প্রত্যেকেরই আন্দাজ যদি সঠিক হয় তাহা হইলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দামে পার্থক্য থাকে না ; কাহারও কোন লাভ হয় না। এইজন্য বলা হয় যে, নিখুঁত ফাট্‌কা ব্যবসায় নিজেই নিজের সর্বনাশ করে, কিন্তু সমাজের উপকার করে।

(গ) ভবিষ্যতে যে দ্রব্যের দাম বাড়িতে পারে ফাটকাদার বর্তমানেই তাহা কিনিতে চাহে বলিয়া উৎপাদকগণ উহার উৎপাদন এখনই সুরু করিয়া দিতে পারে। ফাটকাদারদের মারফৎ উৎপাদকগণ ভবিষ্যৎ চাহিদার রূপ ও পরিমাণ সম্বন্ধে আভাস পায়।

(ঘ) শেয়ার বাজারে ফাটকা ব্যবসায়ের উপকার হইল যে, তাহা শিল্পে সঞ্চয়ের বিনিয়োগে (Investment) সাহায্য করে এবং এইরূপে দেশে মূলধন-গঠনে (Capital Formation) সহায়তা করে। নিজের সঞ্চয়কে কিরূপে

বিভিন্ন শেয়ারে খাটাইবে তাহা জনসাধারণ শেয়ার-বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের দাম ও উহাদের উঠানামা বুঝিয়া স্থির করে। যে শেয়ার হইতে ভবিষ্যতে লভ্যাংশের পরিমাণ বেশি আশা করা যায় এবং যে ফার্মের অবস্থা ভাল, ব্যবসাদারেরা অধিক দামে সেই শেয়ার ক্রয়ে প্রবৃত্ত হয়। জনসাধারণও সেই শিল্পে অর্থ বিনিয়োগে অগ্রসর হয়।

(ঙ) নূতন কোম্পানী গঠন করিতে হইলে যে মূলধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন তাহা শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের মারফৎ উঠ.ন সম্ভব হয়। এইরূপে দেশে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের (Long-term investment) পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। বাজারে চলতি সুদের হারের সহিত নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন হইতে সম্ভাব্য মুনাফার হারের তুলনা করিয়া জনসাধারণ এইরূপ বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বলে। সাধারণভাবে, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (The marginal efficiency of capital in general) যদি সুদের হার হইতে বেশি থাকে তাহা হইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে এবং উহা কম হইলে বিনিয়োগ কম হইবে। বিভিন্ন প্রকার মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন হইতে ভবিষ্যৎকালে সম্ভাব্য মুনাফার হার শেয়ার বাজার হইতেই জনসাধারণ জানিতে পারেন এবং সেই ভাবে তাহাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন। শেয়ারের গতিবিধি দ্বারাই বর্তমানকালে উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় ধারণা গড়িয়া উঠে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধে দীর্ঘকালীন আন্দাজ ও আশা-নিরাশা (Long-term expectations) ব্যবসায়ীদের মনের মধ্যে শেয়ার বাজারের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াই গড়িয়া উঠে।

(চ) নূতন কোম্পানী ছাড়াও পুরাতন কোম্পানীগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় মূলধন শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দ্বারা শেয়ার বাজারের মারফৎ তুলিতে পারে।

(ছ) বিনিয়োগের তারল্যরূপ বা তরলতা (Liquidity) বজায় রাখিবার পক্ষে শেয়ার বাজার যথেষ্ট সহায়তা করে। যখন খুসী শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের সুবিধা থাকায় বিনিয়োগকারীর অর্থ দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিবার বা আয়ত্তের বাহিরে থাকিবার ভয় থাকে না।*

* "For the fact that each individual investor flatters himself that his commitment is liquid.........calms his nerves and makes him much more willing to run a risk." J. M. Keynes. The General Theory. P. 160.

ফাট্‌কা ব্যবসায়ের দোষত্রুটি (The evils of Speculation)

(ক) মনে রাখা দরকার যে, সকল ফাট্‌কা ব্যবসায়কে প্রতিযোগিতামূলক ফাট্‌কাদারী (Competitive speculation) বলা চলে না। বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে আধুনিক কালে যাহা চলিতেছে তাহাকে লার্ণারের ভাষায় আক্রমণাত্মক ফাট্‌কাদারী (Aggressive Speculation) বা একচেটিয়া ফাট্‌কা ব্যবসায় (Monopolistic Speculation) বলা যাইতে পারে। ধনী ও শক্তিশালী ফাট্‌কাদারগণ একসঙ্গে অধিক পরিমাণে ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া বাজার দামকে পরিবর্তন করে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়ায়। দামে উঠানামার তীব্রতা কমাইবার পরিবর্তে এই ধরনের ফাট্‌কাদারী এই তীব্রতা আরও বাড়াইয়া দেয় ; স্থান কাল নির্বিশেষে দামের পার্থক্য মুছিয়া ফেলিতে সহায়তা করে না।

আক্রমণাত্মক ফাট্‌কাদারী—দামের উঠানামার তীব্রতা ও পরিধি বৃদ্ধি

(খ) ফাট্‌কাদারগণ প্রায়ই অসৎ হইয়া থাকে। বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালক বা কর্মচারীদের নিকট হইতে গোপন খবর সংগ্রহ করিয়া বাজারে মিথ্যা গুজব ছড়াইয়া তাহারা শেয়ারে বা দ্রব্যের দামে নিজ স্বার্থের উপযোগী কৃত্রিম পরিবর্তন ঘটায়। যেমন, কোনো প্রভাবশালী ফাট্‌কাদার যদি ভাবে একটি কোম্পানী ভবিষ্যতে বেশি লভ্যাংশ দিবে এবং সেই শেয়ারের দাম ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইলে সে হঠাৎ প্রচার করিতে সুরু করে যে, ঐ কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হইবে, অবিলম্বে ইহার শেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত। বহু প্রচারের মারফৎ সে চতুর্দিকে ইহা রটাইয়া দেয় যে, সে নিজেও শেয়ার বিক্রয় করিতেছে। ইহারা ফলে বাজারে সেই শেয়ারের দাম কমিয়া যায়। তখন সেই ফাট্‌কাদারই গোপনে এই শেয়ারগুলিকে কম দামে বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইতে পারে, ভবিষ্যতে দাম বাড়িলে ইহার ফলে প্রচুর মুনাফা করিতে পারে। এইরূপ দুর্নীতি, ভাঁওতা ও অপরকে ঠকান ফাট্‌কাদারদের প্রচলিত রীতিনীতি।

শেয়ার-বাজারের অন্যায় কাজকর্ম

অনেক সময় তাহারা কোনো দ্রব্যের যোগানের বৃহৎ অংশ নিজেরা করায়ত্ত করিয়া ফেলে এবং বাজারে এক ধরনের অস্থায়ী একচেটিয়া অবস্থা সৃষ্টি করিয়া অতিরিক্ত লাভের চেষ্টা করে।

(গ) শেয়ার বাজারে অসৎ ফাট্‌কাদারী সমাজের বিপুল অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। কোনো কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা, তাহার লভ্যাংশ দিবার

ক্ষমতা এবং সেই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এই সকল বিষয় অনুযায়ী ঐ শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ হওয়া উচিত। যে শিল্প হইতে সম্ভাব্য মুনাফার হার অধিক, সেখানে বিনিয়োগ বেশি হওয়া দরকার। কিন্তু কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি, গুজব ছড়ান ও অসৎ প্রচারের সাহায্যে ফাট্‌কাদাররা এমন ফার্মের শেয়ারের দাম বাড়াইয়া রাখে যেদিকে সমাজের অর্থনৈতিক স্বার্থে বিনিয়োগ কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমাজের স্বার্থে বিভিন্ন শিল্পের সম্ভাবনা অনুযায়ী মূলধনের প্রয়োগ ইহাদের কাজের ফলে সম্ভবপর হয় না।

মূলধনের নিয়োগ সুবিন্যস্ত না-ও হইতে পারে

(ঘ) শেয়ার বাজারে এইরূপ অসৎ পদ্ধতিসমূহ প্রচলিত থাকিবার দরুণ দেশে মূলধন-গঠন (Capital Formation) ব্যাহত হয়। বিশেষত, অনুন্নত দেশসমূহে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগে স্বভাবতই অনেক লোকের একটু দ্বিধা থাকে, সেই সকল দেশে শেয়ার বাজারের মারফৎ যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান-সমূহে মূলধন নিয়োগের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। ফলে, শিল্পে যথোপযুক্ত পরিমাণে মূলধন-বিনিয়োগ হয় না। সমাজের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া, ব্যক্তিগত লাভালাভের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্পে মূলধন প্রবাহিত হয়। কেইন্‌স্ বলিয়াছেন যে, শিল্প ও ব্যবসার প্রবহমান স্রোতের উপর বুদ্বুদের মতন হইলে ফাট্‌কাদারি কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না বটে, কিন্তু যদি ফাট্‌কাদারির ঘূর্ণিতে শিল্পোদ্যোগ বুদ্বুদের ন্যায় নাচিতে থাকে এবং এক এক সময় হঠাৎ ফাটিয়া তলাইয়া যায়, তাহা হইলে অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া উঠে। যখন কোনো দেশের মূলধন-গঠন ভাড়াটে নাচঘরের কাজকর্মের ফলস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তখন কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইবারই সম্ভাবনা।*

মূলধন-গঠন ব্যাহত হইতে পারে

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের কারণ হিসাবে শেয়ার বাজারের ফাট্‌কাদারী বহুলাংশে দায়ী, ইহাই কেইন্‌সের অভিমত। যদি অভিজ্ঞ ও সংব্যক্তিগণ ভবিষ্যৎ-দামের হ্রাস-বৃদ্ধির তীব্রতা সঠিক আন্দাজ করিতে পারেন তাহা হইলে এই হ্রাস-বৃদ্ধির তীব্রতা কমিয়া সমাজের উপকার

* "Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise. But the position is serious when enterprise becomes the bubble on a whirlpool of speculation. When the capital development of a country becomes the by product of the activities of a Casino, the job is likely to be illdone."
J. M Keynes, *The General Theory*.

হয়। কিন্তু তেমন বুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তি খুব অল্প ফাট্‌কাদারের আছে। তাহারা সকলেই শেয়ারের স্বল্পকালীন দাম-পরিবর্তন হইতে মুনাফা চাহে, কিন্তু শিল্পের দীর্ঘকালীন উন্নতি বা অবনতির সম্ভাবনা বিচার করিয়া বিনিয়োগ বা ঝুঁকি বহন করে না। স্বল্পকালীন দামের উঠানামাও তাহারা নিজের বিবেচনা শক্তি প্রয়োগ না করিয়া বুঝিতে চায়। সাধারণ ফাটকাদারগণ প্রত্যেকেই ভাবিতে চেষ্টা করে যে, দামের উঠানামা সম্বন্ধে সাধারণ ফাট্‌কাদারের মধ্যে সাধারণ ধারণা কিরূপ। অনভিজ্ঞ একদল লোকের দলীয় উচ্ছৃঙ্খল মনস্তত্ত্বের প্রভাবে (Mass psychology) শেয়ারের দাম স্থির হয় এবং সেই দলীয় জনমত বহু বিভিন্ন অর্থনীতি-বাহ্য কারণে পরিবর্তিত হওয়ায় শেয়ারের দামের উঠানামা তীব্র ও ব্যাপকভাবে ঘটিয়া থাকে। শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা চিন্তা না করিয়া সাধারণ ফাটকাদারগণ সাধারণ ফাটকাদারদের গতিবিধি সম্পর্কে কিরূপ চিন্তা করিতেছেন তাহা আন্দাজ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। কেইন্‌স ইহাকে তৃতীয় স্তরের ফাটকাদারী বলিয়াছেন (Speculation of the third degree)।

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যাপক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা আসে

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে দাম নিরূপণ (Pricing in a Socialist Economy)

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে মৌলিক পার্থক্য (The fundamental difference between Capitalism and Socialism)

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিরূপিত হয় বাজারের শক্তিসমূহের দ্বারা। এই শক্তিগুলি ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার ঊর্ধ্বে থাকিয়া দাম নিরূপণে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। কোনো দ্রব্যের বাজারে ব্যক্তিগত যোগান-সমূহ ও ব্যক্তিগত চাহিদা-সমূহ যোগ করিয়া বাজার-যোগান ও বাজার চাহিদা সৃষ্টি হইলে উহাদের টানাটানিতে পণ্যের দাম উঠানামা করে। এই সমষ্টিগত শক্তিগুলি কোনো ব্যক্তিগত ক্রেতা ও বিক্রেতার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়, এবং দ্রব্যের দাম বাজারী শক্তি-সমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। প্রত্যেকটি দ্রব্যের বাজারেই এই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (impersonal) সমষ্টিগত শক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে, 'লাভ ক্ষতি টানানানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ'-এর মধ্য দিয়া বিভিন্ন বিষয়ের দাম নিরূপিত হইতে থাকে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুলভ্রান্তির

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম নিরূপিত হয় বাজারী শক্তিগুলির প্রভাবে

মধ্য দিয়া (by trial & error) ব্যক্তিরা বাজারের উঠানামার সহিত নিজেদের ক্রয় ও বিক্রয়কে খাপ খাওয়াইতে থাকে. পরস্পর নির্ভরশীল এই বিষয়গুলি অসংখ্য সামঞ্জস্য সাধনের মধ্য দিয়া এক সামগ্রিক ভারসাম্যের অভিমুখে ধাবিত হয়।

দাম-গঠনের (Price formation) এই ধারাপথকে আমরা সাতটি স্তরে বিভক্ত করিতে পারি : (1) বিশেষ কোনো একটি দ্রব্যের বাজারে প্রতি-যোগিতামূলক যোগান ও চাহিদা দাম নিরূপণ করিতে থাকে ; (2) ক্রেতার চাহিদা-রেখার পিছনে আছে তাহার আপেক্ষিক উপযোগিতা বা নিরপেক্ষ পছন্দের মাত্রাসমূহ ; (3) বিক্রেতার যোগান রেখার পিছনে থাকে মোট, প্রান্তিক এবং ইউনিট-প্রতি ব্যয় ; (4) এই ব্যয়রেখাগুলির পিছনে থাকে উৎপাদনের টেক্‌নিকাল সম্পর্কসমূহ বা উৎপাদন-কারণ (production-function)। উপাদান-উৎপন্নের সম্পর্ক বা ইন্‌পুট-আউটপুট সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদনের এই টেক্‌নিকাল দিকটি নির্ধারিত। ফার্মগুলির চেষ্টা থাকে নিম্নতম ব্যয়ে পৌছানো. ইহা সম্ভব হয় যখন ফার্ম ততদূর পর্যন্ত ইনপুটগুলির চাহিদা বাড়াইতে পারে যে তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন ও দামের অনুপাতগুলি সমান ; (5) সকল ফার্মের ইনপুটগুলির প্রান্তিক উৎপন্ন যোগ করিয়া উপাদানগুলির চাহিদা পাওয়া যায় ; (6) ভূমি, শ্রম ও মূলধনী দ্রব্যের চাহিদাসমূহ তাহাদের যোগানের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নিজেদের দাম অর্থাৎ খাজনা, মজুরি ও সুদের হার নিরূপণ করিতে থাকে ; (7) মুনাফা বাড়ানো এবং ক্ষতি এড়াইয়া চলা—ইহাই সমগ্র প্রতিযোগিতামূলক ধারার পিছনে প্রধান প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। এই স্তরগুলি প্রতিটি অপরের সহিত সংযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল—যোগান ও চাহিদা, ব্যয় ও পছন্দ. উপাদানের উৎপাদন-ক্ষমতা এবং চাহিদা—এই সকলের একত্র অবস্থান সামগ্রিক ভার-সাম্যের কাঠামো গড়িয়া তোলে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে অনেকটা পৃথক। এইরূপ অর্থনৈতিক কাঠামোতে অর্থনৈতিক কাজকর্ম বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে পরিচালিত হয় না। উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সকল কিছু কেন্দ্রীয় কোনো কর্তৃপক্ষের নীতি ও ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়। সমাজের শ্রম, ভূমি ও মূলধন অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন দিকে দামের প্রভাবে চাহিদা-যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে আপনা-আপনি নিযুক্ত হইয়া পড়ে না. নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন দিকে নিয়োজিত হয়। ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে বিভিন্ন

সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য কোথায়

ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘটে বহুসংখ্যক স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর দ্বারা। ইহা নির্ভর করে তাহাদের আন্দাজ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর, দীর্ঘকালে এই আন্দাজ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি সমস্ত দ্রব্যের বাজার-দামে উঠানামার মধ্য দিয়া ক্রমাগত সংশোধিত হইতে থাকে। এইরূপে পূর্ব ঈপ্সিত (ex ante) ও উত্তর-লব্ধ (ex post) বিনিয়োগ-বিন্যাসের পার্থক্য দূরীভূত হইয়া যায়। অপর দিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল কথাই নির্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষ্য স্থির করিয়া পূর্ব হইতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্পর্কে সুসম্বদ্ধ কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এই কাঠামোতে পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন দ্রব্যগোষ্ঠীর দাম এমন ভাবে নির্দিষ্ট করেন যাহাতে আকাঙ্ক্ষিত হারে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভবপর হয়। ভোগ্যদ্রব্যের বিভিন্ন গোষ্ঠী, উপকরণ এবং মূলধনী সম্পত্তি সকল কিছুর দাম নির্ধারিত হয় নির্দিষ্ট কোনো এক লক্ষ্য অনুসারে, প্রকৃত পক্ষে এই দামগুলি পরিকল্পনার কৌশল বা প্রয়োগাস্ত্রের অংশ বিশেষ।*

সমাজতন্ত্রে দাম নিরূপণ (Pricing under Socialism)

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে কিরূপে দাম নিরূপিত হয়, সেই বিষয়ে সাধারণত দুই ধরনের মতবাদ দেখা যায়: এক দলকে বলা যায় কেন্দ্রিকতাবাদী (Centralists) এবং অপর দলকে বলা প্রতিযোগিতাবাদী (Competitionists)। অধ্যাপক ডব্ এবং ডিকিন্‌সন্ প্রভৃতি লেখকেরা মূলত কেন্দ্রিকতাবাদী। তাঁহাদের মতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে যে-সকল নীতি ও কৌশল গৃহীত হওয়া দরকার উহাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও একক ভারসাম্যের দাবি মিটানো সম্ভব নয় (The demand for growth and of micro-economic adjustments stand in conflict)। তাঁহাদের মতে পরিকল্পনা কমিশন বাজারের অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে; বাজারের শক্তিসমূহ, অর্থাৎ ব্যক্তির পছন্দ, নির্বাচন ও চাহিদার প্রভাব অস্বীকার করিয়া উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে। তবে তাহারা এমনভাবে সরকারী দোকানের খুচরা দাম স্থির

কেন্দ্রিকতাবাদ: উৎপাদন ও উপকরণের নিয়োগ বাজারীশক্তির প্রভাবমুক্ত

* "Two major price-relations may be put forward as examples of this. Firstly, there is the prices of labour (or wages) and the price level of capital goods. Secondly, there is that between wages and the retail price level of consumer goods. The second of these will define the level of real wages ; and the first will influence the choice of technique by defining, the cost of substituting capital goods for labour in production." Maurice Dobb.

করিবে যাহাতে সংকটজনক ভারসাম্যহীনতা দেখা না দেয়, যেমন মালের ঘাট্‌তি বা দোকানের সম্মুখে দীর্ঘ 'কিউ' বা লাইন না ঘটে। অর্থাৎ বাজার যেন উৎপাদনকে প্রভাবিত করিতে না পারে, নিয়ন্ত্রণ করা তো দূরের কথা। বাজারী শক্তিসমূহ উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব করিতে পারিলে উহা পরিকল্পনার 'বিরুদ্ধ' অবস্থা, 'বিশুদ্ধ' অবস্থা নয়, তাই বিশুদ্ধ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে উৎপাদন ও উপকরণের নিয়োগ-বিন্যাসকে বাজারের প্রভাব হইতে দূরে রাখা আবশ্যক। তবে এক সরকারী উৎপাদনকেন্দ্র হইতে অপর সরকারী উৎপাদনকেন্দ্রে মালপত্র যাতায়াত করার সময়ে হিসাব রাখার জন্য এক ধরনের দাম ধরা হইবে; কিন্তু সেই দাম নিতান্তই খাতায়-পত্রে হিসাব রক্ষার ব্যাপার, সরকার বা পরিকল্পনা কমিশন নিজস্ব কোনো নীতি অনুসারে এই হিসাব-রক্ষণোপযোগী দামগুলি (accounting prices) নির্ধারণ করিবেন। অবশ্য দক্ষতা এবং অন্যান্য দিক বিচার করিয়া পরিকল্পিত উৎপাদনের ব্যয়ের সঙ্গে এই উপকরণের দামগুলির সামঞ্জস্য থাকিবে ঠিকই, কিন্তু ইহারা মূলত বাজারের প্রভাবমুক্ত এবং পরিকল্পনার অস্ত্র-বিশেষ, নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছিবার দরুন ব্যবহার্য প্রয়োগাস্ত্র। উৎপাদনের সময়ে এই দামগুলিকে পরিকল্পনা কমিশন নিজে ব্যবহার করেন ঠিকই, কিন্তু ইহারা পরিকল্পনা কমিশনের উৎপাদন-সংক্রান্ত হিসাব ও সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করিতে পারে না।

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন যাহারা প্রতিযোগিতাবাদী, যেমন লাঙ্গে, টেলর প্রভৃতি। তাঁহাদের মতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে উৎপাদনের কাজকর্ম জাতীয়করণ হয় বটে, কিন্তু ভোগের ক্ষেত্র জাতীয়করণ না করিলেও চলে।

প্রতিযোগিতাবাদ: বাজারের শক্তি দ্রব্যের দাম ও উৎপাদনের উপর প্রভাব বিস্তার করে

সুতরাং রাষ্ট্রীয় উৎপাদন কেন্দ্রের পরিচালকেরা জিনিসের দাম ও চাহিদা অনুযায়ী অর্থাৎ ভোগকারীর পছন্দ অনুসরণ করিয়াই উৎপাদন করিতে পারেন, তাহাতে সমাজতন্ত্র ব্যাহত হয় না। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে ভোগ্য দ্রব্যাদির অবাধ দাম ব্যবস্থা (free pricing system) বজায় থাকিতে পারে এবং ইহার ফলে প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যে পৌছিবার ঝোঁকও থাকিতে পারে। সমস্যা হইল, উৎপাদনের প্রাথমিক উপকরণগুলির দাম নিরূপণ কিরূপে হইবে তাহা লইয়া। সমাজতন্ত্রে ইহাদের কোনো 'বাজার' নাই, অর্থাৎ খোলাবাজারে দরাদরির মধ্য দিয়া উপকরণের দাম নিরূপণ হয় না। তাই পরিকল্পনা কমিশন কিরূপে সর্বোত্তম উপকরণের নিয়োগ-বিন্যাস ঘটাইবে, ইহাই সমস্যা। ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় বিশেষ কোনো এক উপাদানের

গুরুত্ব নিরূপিত হয় উহাদের দাম হইতে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া উপাদানের বাজারে এই দাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রের উপাদানগুলির 'বাজার' নাই, দাম স্থির হইবে কি উপায়ে?

অধ্যাপক মাইসেস্ (Von Mises) বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে উপাদানগুলির 'বাজার-দর' থাকে না ; তাই অর্থনৈতিক হিসাব সম্ভবপর নয়। কিন্তু লাঙ্গের মতে, দামগুলিকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কেবলমাত্র বিনিময়ের অনুপাত হিসাবে দেখা উচিত নয়, ইহারা এমন এক একটি মানদণ্ড যাহার দ্বারা একটি উপাদানের গুরুত্ব বা উৎপাদন-ক্ষমতার সহিত অন্য উপাদানের 'গুরুত্ব ও উৎপাদন-ক্ষমতাকে আমরা তুলনা করি। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে 'ভুল-ভ্রান্তির পদ্ধতির মধ্য দিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশেও অর্থনৈতিক হিসাব রচনা করা সম্ভব। অধ্যাপক হায়েক ও রবিন্সের মতে এইরূপ অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে দামে উপাদানগুলির সর্বোত্তম নিয়োগ-বিন্যাস ঘটিতে পারে ; তাহা 'নিরূপণ করিতে হইলে কোটি কোটি সমীকরণের একত্র সমাধান করা দরকার। লাঙ্গের মতে ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং পছন্দের স্বাধীনতা থাকায় এত বেশি জটিলতা দেখা দিবে না, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়াই আপনা-আপনি এই সমীকরণগুলির সমাধান ঘটিয়া যায়।

প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক পরিবেশে দাম = প্রান্তিক ব্যয়—নিম্নতম গড ব্যয় (Price = MC = AC at its minimum) ; অর্থাৎ দ্রব্যটির দাম উহার উৎপাদন ব্যয়ের সমান এবং উৎপাদন-ব্যয় নিম্নতম স্তরে অবস্থিত। লাঙ্গের মতে

কেন্দ্রীয কমিশন চাহিদা-যোগান অনুসারে নিজের দাম বাডায কমায

যেখানে ক্রেতাদের পছন্দ-প্রকাশের সুস্পষ্ট সুযোগ থাকে এইরূপ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেও ইহা সত্য। এই সমাজে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বোর্ড বা কমিশন নিজেই বাজারের ন্যায় কাজ করে এবং পরীক্ষা ও ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া এমন দাম নিরূপণ করে যাহা নিম্নতম ব্যয়ের সমান। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদকেরা বাজার দর স্থির থাকিবে ধরিয়া লইয়া নিজেদের উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া-বাড়াইয়া দরের সহিত সামঞ্জস্য আনে। সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে ক্রেতাদের পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী দামে উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের—এই কমিশনই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া দাম নির্ধারণ করিয়া সর্বোত্তম নিয়োগ বিন্যাস ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

ডিকিন্সন এবং বার্গসন্-এর মতে, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের অধীন বা ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অধীন শিল্পগুলি ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেও

সর্বাধিক মুনাফা আয়ের সূত্র, প্রান্তিক ব্যয়=প্রান্তিক রেভিনিউ=দাম (MC =MR=Price) প্রযুক্ত হয়। ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের অধীন শিল্পগুলিতে দ্রব্যটির দাম উহার প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইলে উৎপাদন স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে মুনাফাই প্রধান প্রেরণা-শক্তি নয় বলিয়া ঐ স্তর অতিক্রম করিয়া ঐ শিল্পে উৎপাদন আরও অনেক দূর বা সর্বোত্তম স্তর পর্যন্ত বাড়ানো চলে তাহাতে দামের হিসাবে লোকসান হইলেও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। তাই সমাজতন্ত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়মাধীন শিল্পগুলিতে মুনাফা-সর্বাধিক করা একমাত্র প্রেরণা-শক্তি বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না।

সমাজতন্ত্রে কিরূপে মোট কল্যাণ বৃদ্ধি পায়

অধ্যাপক লার্নারের মতে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে, প্রান্তিক ব্যয়ের ভিত্তিতে দাম নিরূপণ করিয়া উপকরণের সর্বোত্তম নিয়োগ-বিন্যাস সম্ভবপর হয়। তিনি গড় ব্যয়ের ভিত্তিতে দাম-নিরূপণকে সমালোচনা করিয়াছেন। লার্নারের মতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেও দাম-ব্যবস্থা সুন্দরভাবে কাজ করে এবং পূর্ণ ভারসাম্যে পৌছিবার দিকে ঝোঁক বজায় থাকে। পরিকল্পনা বোর্ডের কাজ হইল কোনো দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও দাম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আরোহণ করা। যদি সকল ক্ষেত্রে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় সমান করিয়া তোলা যায় তবে উপকরণের সর্বোত্তম নিয়োগ-বিন্যাস ঘটিবে এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যের অবস্থা দেখা দিবে।

লার্নারের অভিমত

উপরে আলোচিত তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বাস্তব জগতের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে তাকাইতে পারি। এই সকল দেশে, সমাজতান্ত্রিক প্রথম যুগে কেন্দ্রিকতাবাদী প্রাধান্য ছিল, বর্তমানে তাঁহাদের বক্তব্য বহুলাংশে পরিবর্তিত হইতেছে। আজকাল বলা হয় যে, "সমাজতন্ত্রে মূল্যের নিয়ম এখনও কার্যকরী হয়" ("Law of value still functions under socialism"), বাজারের প্রাণশক্তিরূপে আর কাজ করে না বটে, কিন্তু "রূপান্তরিত ভাবে" ইহার প্রভাব বর্তমান। বলা হয় যে, "ভোগ্যদ্রব্যের বাজারে, সীমাবদ্ধভাবে হইলেও মূল্যের নিয়ম এখনও নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করে," এবং ইহার প্রভাব "কেবলমাত্র" পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে নয়, উপরন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অনুভূত হইতেছে। উপাদানের বাজারে ইহার কোন নিয়ন্ত্রণীশক্তি নাই বটে, তবুও ইহা উৎপাদনকে

সোভিয়েট রাশিয়ায় কি ঘটিতেছে

প্রভাবিত করে এবং উৎপাদন পরিচালনার সময়ে ইহার প্রভাব এড়াইয়া চলা যায় না।

অনুশীলনী

1. Define joint products. How would you determine their values ?

2. State briefly.

(*a*) The relation between prices of competing goods.

(*b*) The relation between prices of complementary goods,

(c) The relation between prices of joint cost goods,

3. Give an account of the main principles of pricing in a socialist economy. (B. U. B. A,)

4. Explain carefully the possible beneficial and harmful results of the actions of the speculators. (C. U. B. Com. 1951)

5. Discuss the nature and necessity of Speculation in a modern community. (C. U. B. A. 1958, B. Com. '58)

6. Do you think that the modern productive organisation would suffer a great loss if all stock and produce-exchanges are closed down ? (C. U. B. Com. 1955)

7. Discuss the function of Stock Exchanges indicating in particular how they promote the investment of Capital. (C. U. B. Com. 1956)

8. What are the economic function of Speculation ? Do you think it necessary to put restriction on Speculation ?

9. Trace the economic implications of Speculation.

13

বণ্টন বা উপাদানের দাম নিরূপণ

Distribution or the Pricing of the Factors of Production

উপাদানের চাহিদা ও যোগান (Demand and Supply of Factors)

ক্লাসিকাল শ্রেণীবিভাগ

ক্লাসিকাল পণ্ডিতগণ উৎপাদনের উপাদানসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন, ভূমি, শ্রম ও মূলধন। এই সকল বিভিন্ন উপাদানের দাম বা পাওনাকে তাঁহারা যথাক্রমে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন, খাজনা, মজুরি ও সুদ। দেশের অর্থনীতি অনুন্নত থাকিলে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। কারণ এই অবস্থায় সমাজের অধিবাসীরা প্রত্যেকে এক একটি উপাদানের মালিক হয় তাই উপাদানের শ্রেণীবিভাগের সহিত সামাজিক শ্রেণীসমূহের অস্তিত্বের কিছুটা সমতা লক্ষ্য করা যায়, যেমন জমিদার বা ভূম্যধিকারী, শ্রমিক এবং পুঁজিপতি।

আধুনিক কালে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আর মানিয়া লওয়া চলে না। জমি বলিলে বুঝা যায়, এমন ভূমি যাহাতে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া উন্নত করা হইয়াছে, শ্রম বলিলে বুঝিতে হয় এমন মানুষ যাহার শ্রমদক্ষতা বাড়াইবার জন্য শিক্ষার দরকার হইয়াছে অর্থাৎ মূলধন খরচ হইয়াছে। এই অবস্থায় উপাদানের এই প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ বজায় রাখিলেও তাহাদের পারিশ্রমিকের এই শ্রেণীবিভাগ আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ কখনো কখনো জমি ব্যবহার করিতে দেওয়ার দরুন প্রাপ্য খাজনার মধ্যে বেশ খানিকটা সুদের অংশ থাকে, কোনো ডাক্তারের পারিশ্রমিকের মধ্যেও মজুরির সঙ্গে সুদ মিশানো থাকে। তাহা ছাড়া, বর্তমানের উন্নত দেশগুলিতে উপাদানের মালিকানা অনুযায়ী সামাজিক শ্রেণীবিভাগ আর সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ বেশির ভাগ ব্যক্তির আয়ই আজকাল দেখা দেয় বিভিন্ন সূত্র হইতে। কিছুটা মজুরি, কিছুটা খাজনা ও কিছুটা সুদ এবং লভ্যাংশ—এই সকল মিশাইয়া আধুনিক জগতে ব্যক্তির আয় হয়। ব্যক্তি যদি তাহার সঞ্চিত অর্থ দিয়া জমি কেনে, তবে সেই

আধুনিককালে গ্রহণ করা চলে না

জমি হইতে আয়কে সে খাজনা বলিবে কি না সন্দেহ, তাহার দিক হইতে দেখিতে গেলে উহাকে মূলধনের দাম বা সুদ হিসাবে গণ্য করাই স্বাভাবিক। সুতরাং উপাদানসমূহকে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে না, সেইরূপ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা নামে বিভিন্ন আয়কেও সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভব নয়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা এই কারণে উপাদানের দাম নিরূপণ তত্ত্বকে বণ্টন বলেন না। অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায় বিভিন্নরূপ বাজারে উপাদানের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে উহার দাম স্থির হয়—ইহাই তাঁহারা মনে করেন।

উপাদানের চাহিদা ও যোগানের সাধারণ তত্ত্ব (The general theory of the demand and supply of factors)

কোনো একটি দ্রব্যের বাজারে বিক্ষিপ্ত ক্রেতাদের ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা যোগ করিয়া দ্রব্যটির বাজারে চাহিদা পাওয়া যায়। ঠিক সেইরূপ, কোনো একটি উপাদানের বাজারেও, বিভিন্ন ফার্মের ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা যোগ করিয়া উপাদানটির বাজার-চাহিদা-তালিকা গঠিত হয়। কোনো ফার্ম বিভিন্ন দামে প্রতিটি ইনপুটের যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করিবে বা সাময়িক ব্যবহারের জন্য ভাড়া করিবে, তাহাকে বলে ফার্মটির ক্রয়-পরিকল্পনা (Purchase plan of the firm)। ফার্মের এই ক্রয়-পরিকল্পনা নির্ভর করে প্রথমত, উৎপাদন সম্ভাবনার উপর; দ্বিতীয়ত, উপাদানগুলির দামের উপর; তৃতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিক্রয়-মূল্যের উপর; এবং চতুর্থত; ফার্মের লক্ষ্যের উপর। এই সকল বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য বিষয় সমান অবস্থায় যে কোনো একটি বিষয়ের পরিবর্তন আসিলেই ফার্মের ক্রয়-পরিকল্পনা বদল হইয়া যাইবে। এই সব বিষয়ের একটিতে পরিবর্তন আসিলে কোনো একটি ফার্ম বিশেষ কোনো উপাদান ব্যবহারের পরিমাণ পাল্টাইয়া দিবে।

উপাদানের চাহিদা-তালিকা

যেমন, কোনো এক দ্রব্যের বাজারে বিক্ষিপ্ত বিক্রেতাদের ব্যক্তিগত যোগান-তালিকা যোগ করিয়া দ্রব্যটির বাজার-যোগান-তালিকা গঠন করা হয়, ঠিক সেইরূপ কোনো এক উপাদানের বাজারেও, বিভিন্ন উপাদান-বিক্রেতাদের ব্যক্তিগত যোগান-তালিকা যোগ করিলে উপাদানটির বাজার-যোগান-তালিকা পাওয়া যায়। বিভিন্ন দামে প্রতিটি ইনপুটের যে-সকল বিভিন্ন পরিমাণ

কোনো এক উপাদান-বিক্রেতা বিক্রয় করিবে বা সাময়িক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিবে, তাহাকে বলে উপাদান বিক্রেতার বিক্রয়-পরিকল্পনা (sales plan of the household)। উপাদান-বিক্রেতার এই পরিকল্পনা নির্ভর করে প্রথমত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সম্ভাবনার উপর, অর্থাৎ বিভিন্ন বিকল্প ব্যবহারের উপাদানটির ব্যবহারের সুযোগ-সম্ভাবনার উপর (on the sales possibilities open or alternative uses and opportunities open to the household); দ্বিতীয়ত, উপাদানের দামের উপর, তৃতীয়ত, বিক্রেতার লক্ষ্যের উপর। এই সকল বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য বিষয় সমান অবস্থায় যে-কোনো একটি বিষয়ে পরিবর্তন আসিলেই উপাদান-বিক্রেতার বিক্রয়-পরিকল্পনা বদল হইয়া যাইবে। এই সকল বিষয়ের একটিতে পরিবর্তন আসিলে উপাদান-বিক্রেতা উপাদান বিক্রয়ের পরিমাণ পাল্টাইয়া দিবে।

উপাদানের যোগান-তালিকা

দ্রব্যের দাম নিরূপণ-তত্ত্বের সহিত উপাদানের দাম নিরূপণ-তত্ত্বের তাই অনেকাংশে মিল রহিয়াছে। বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় উহাদের বাজার যোগান ও চাহিদার দ্বারা, উপাদানগুলির দামও (খাজনা, মজুরি ও সুদ) উহাদের বাজারে যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে স্থির হয়। দ্রব্যের দাম যেমন ভারসাম্যের বিন্দুতে ক্রেতাদের প্রান্তিক উপযোগিতার সমানুপাতিক হয়; মজুরি ও সুদও তেমন ভারসাম্যের বিন্দুতে উহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার সমানুপাতিক হইয়া উঠে। যেমন কোনো উদ্যোক্তা কোনো উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার সহিত উহার পারিশ্রমিকের সমতা বিধান করে, ঠিক সেইরূপ উপাদানের মালিকও তাহার প্রান্তিক ত্যাগের (marginal sacrifice) সহিত উহার পারিশ্রমিক সমান করিয়া তুলিতে চায়।

দ্রব্যের ও উপাদানের বাজারের বিশ্লেষণের মিলই বেশি

দ্রব্যের ও উপাদানের দাম নিরূপণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল (ক) উপাদানের ক্ষেত্রে মানবিক ও সামাজিক পটভূমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এবং (খ) উপাদানের জন্য চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা। কিন্তু এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যের বা উপাদানের দাম নিরূপণে আমরা একই অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলি (চাহিদা-কারণ, যোগান-কারণ প্রভৃতি) প্রয়োগ করিতে পারি।

পার্থক্য কম

প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার তত্ত্ব (Theory of Marginal Productivity)

মোট জাতীয় আয় কিরূপে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়, সেই সম্পর্কে আলোচনার জন্য নয়া ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই তত্ত্বের প্রাথমিক আলোচনা করেন থুনেন (T. H. Von Thunen), 1826 সালে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জে, বি, ক্লার্ক (J. B. Clark), মেঙ্গার, হুাইজার, বম্‌বোয়ার্ক, ওয়ালরাস্, জেভনস, এজ্‌ওয়ার্থ, উইকষ্টীড্ (Wicksteed) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই তত্ত্বকে আধুনিক রূপ দান করেন। ইহাদের মতে, উপাদানের দাম-নিরূপণের মূল বিষয় হইল উহার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা। ভারসাম্যের বিন্দুতে দ্রব্যের দাম যেমন ক্রেতাদের প্রান্তিক উপযোগিতার সমান থাকে, সেইরূপ, ভারসাম্যের বিন্দুতে কোনো একটি উপাদানের দামও উহার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার সমান। তাঁহারা আরও মনে করিতেন যে, সকল উপাদানকে যদি প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তবে পূর্ণপ্রতিযোগিতায় মোট জাতীয় উৎপন্ন (total national product) নিঃশেষ হইয়া যাইবে (exhausted) *

উপাদানের দাম নিরূপণের মূল তত্ত্ব

উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা কাহাকে বলে? একটি উৎপাদন-ধারায় অনেক উপাদান নিযুক্ত থাকে, এবং তাহাদের সম্মিলিত কাজের ফলে কিছু পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। যদি অপর সকল উপাদানের নিয়োগ স্থির রাখিয়া কেবল একটি উপাদানের এক ইউনিট বাড়ানো যায়, তাহা হইলে মোট উৎপন্ন যতটুকু বৃদ্ধি পাইবে তাহাই সেই উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা (marginal productivity)। অপর সকল উপাদানটির পরিমাণে কোনো পরিবর্তন হয় নাই ধরিয়া লইলে মোট উৎপাদনে এই বৃদ্ধির সকলটুকুই বর্ধিত উপাদানটির নিয়োগের ফল, ইহাই তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ। যদি সেই উপাদানটির এক ইউনিট অধিক নিয়োগের ফলে অন্যান্য

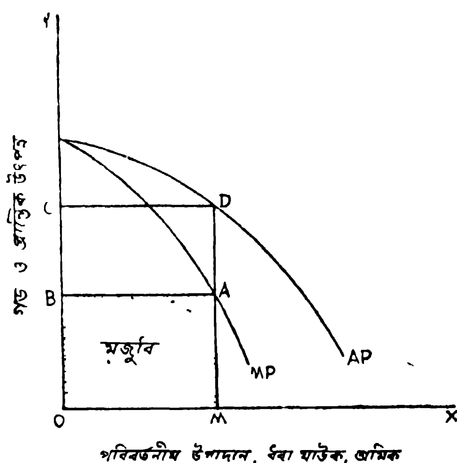
প্রান্তিক ও নীট উৎপাদন ক্ষমতা কাহাকে বলে

* প্রথম যখন অধ্যাপক ক্লার্ক এই তত্ত্বকে আলোচনা করেন (1890), তখন তাঁহার ধারণা ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য উপাদানগুলির মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হইবে এই তত্ত্ব শুধু তাহাই ব্যাখ্যা করে একপ নয়। উপরন্তু এই তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, বর্তমানে আয় বণ্টনকাঠামো কোনরূপ অন্যায় কিছু নয়। বরং নীতিগত দিক হইতে ইহা ন্যায্য এবং বিজ্ঞানসম্মত। আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা, অবশ্য, এই তত্ত্ব আলোচনার সময়ে আয় বণ্টনের নৈতিক দিকটি আলোচনা করেন না।

উপাদানের রদবদল অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং তাহাদের দরুন ব্যয় কিছুটা বাড়ে, তাহা হইলে বর্ধিত উৎপাদনের পরিমাণ হইতে সেই ব্যয় বাদ দিতে হয়, (যেমন, একজন শ্রমিক অধিক নিয়োগের ফলে একটি কোদাল বা কিছুটা কাঁচামাল বেশি ক্রয় করিতে হইল)। প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ হইতে এই সকল অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদ দিলে উপাদানটি প্রান্তিক নীট উৎপাদন-ক্ষমতা (Marginal Net Productivity) পাওয়া যায়।

আমরা জানি, অন্যান্য সকল উপাদান স্থির রাখিয়া কোনো একটি উপাদানের নিয়োগ যত বাড়ানো যায়, উহার গড় এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমশ তত কমিয়া আসে—উপাদানের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা নিয়ম (Law of Diminishing Marginal Productivity of a factor) কার্যকর হইতে থাকে, ততক্ষণ ফার্মটি পরিবর্তনীয় উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া ফলে, উপাদানটির আরও বেশি ইউনিট সে নিয়োগ করিতে চায়। ফলে উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমশই কমিয়া আসে এবং অবশেষে উপাদানের দামের সমান হয়। ফার্মটি এই স্তরের পরে আরও উপাদানের নিয়োগ ও চাহিদা করিবে না, কারণ আরও বেশি উপাদান নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপন্নের দামের তুলনায় উপাদানের দাম বেশি দিতে হয়, ফার্মের

কেন ও কিরূপে উহা উপাদানের দামের সমান হয়



লোকসান শুরু হইয়া যায়। তাই, বলা চলে, ভারসাম্যের বিন্দুতে উপাদানের প্রান্তিক-উৎপাদন-ক্ষমতা উহার দামের সমান থাকে।

এই তত্ত্বটিকে আমরা উপরের রেখাচিত্রে প্রকাশ করিতে পারি :

X অক্ষে আমরা পরিবর্তনীয় উপাদান, ধরা যাউক, শ্রমিকের সংখ্যা পরিমাপ করিতেছি, অন্যান্য উপাদানের পরিমাপ সমান আছে। Y অক্ষে আমরা ঐ পরিবর্তনীয় উপাদানটির গড ও প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা পরিমাপ করি। Ap ও Mp হইল যথাক্রমে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের দরুন ইহারা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

যখন OM সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হইতেছে তখন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা হইল AM শ্রমিকের সকল ইউনিট এই হারে মজুরি পায় বলিয়া মোট মজুরির পরিমাণ হইল OM × AM = OMAB আয়তক্ষেত্র। শ্রমিকের গড় উৎপাদন-ক্ষমতা হইল DM, সুতরাং মোট উৎপাদন হইল OM × DM = OMDC আয়তক্ষেত্র। মোট উৎপন্ন হইতে শ্রমিকের পাওনার অংশ বাদ দিলে, অন্যান্য উপাদানগুলির পাওনার পরিমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ OMDC − OMAB = ABCD অন্যান্য স্থির উপাদানগুলির প্রাপ্য অংশ। তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দিতে হইলে ঠিক ঐ পরিমাণই প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, সকল উপাদান তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইলে মোট উৎপাদন নিঃশেষ হইয়া যায়।

আর একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা বা প্রান্তিক নীট উৎপাদন-ক্ষমতা বলিলে আমরা তিন প্রকার ধারণা বুঝিতে পারি। (ক) প্রান্তিক উৎপন্ন দ্রব্য (Marginal Physical Product) (খ) প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (Value of the marginal Product), এবং (গ) প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ (Marginal Revenue Product)। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা দরকার।

প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার বিভিন্ন রূপ

মনে কর 10 জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে, 160 ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে প্রতি ইউনিট 4 টাকা দামে বিক্রয় হওয়ায় মোট রেভিনিউ হইল 400 টাকা। এই অবস্থায় 1 জন শ্রমিকের নিয়োগ বাড়ানো হইল। মোট উৎপাদন হইল 107 ইউনিট, মোট রেভিনিউ হইল 428 টাকা। উদাহরণ অনুযায়ী, (ক) প্রান্তিক উৎপন্ন দ্রব্য (MPP = 107 − 100 = 7 ইউনিট), (খ) প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (VMP) = 7 × 4 = 28 টাকা এবং (গ) প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ (MRP) = 428 − 400 = 28 টাকা।

দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তবে ফার্মটি পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্য একই দামে বিক্রয় করিতে পারে, উহা বিক্রয়ের জন্য দাম কমাইতে হয় না,

প্রান্তিক রেভিনিউ দামের সমান থাকে। এইক্ষেত্রে MVP=MRP. কিন্তু দ্রব্যটির বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতা থাকিলে পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্য সমান দামে বিক্রয় করা যায় না, সকল ইউনিটের দামই কমাইতে হয়, প্রান্তিক রেভিনিউ দাম হইতে কম থাকে। এই অবস্থায় MRP<MVP.

উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউর (MRP) সমান হয় কেন? MRP হইতে দাম যদি কম হয়, তবে ফার্ম এই উপাদান ক্রমশ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে থাকিবে, তাহার মুনাফাও বৃদ্ধি পাইবে। বেশি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে উপাদানের MRP-ও হ্রাস থাকিবে। এইভাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত উপাদানের দাম=উহার MRP হয়, ততক্ষণ এই উপাদানটির নিয়োগ বাড়িতে থাকে। উহারা সমান হইলে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক। এই স্তরের পরেও ঐ উপাদানটির নিয়োগ বাড়াইলে উপাদানের দামের তুলনায় তাহার MRP কম এবং ফলে ফার্মটির পক্ষে উহা ক্ষতিজনক। তাই ফার্মটিতে ভারসাম্যের অবস্থায় উপাদানের দাম=উহার MRP.

কোনো উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউর সমান

এই তত্ত্ব বিশ্লেষণের সময়ে কতকগুলি অনুমান স্বীকার করিয়া লইতে হয়। প্রথমত, আমাদের ধরিয়া লইতে হয় যে, একটি উপাদানের সকল ইউনিট গুণ ও যোগ্যতার ব্যাপারে সমান, উহারা সর্ববিষয়ে সমগুণসম্পন্ন (homogeneous) এবং একটির পরিবর্তে অপরটি সমভাবে নিয়োগযোগ্য (perfect substitute)। দ্বিতীয়ত, সকল উপাদানই পূর্ণরূপে বিভাজ্য, ইহা আমাদের ধরিয়া লইতে হয়। উৎপাদন-সূত্রের মধ্যে যে টেকনিকাল সহগগুলি রহিয়াছে (technical coefficients of production) তাহাতে অন্যান্য উপাদান সমান রাখিয়া একটি উপাদানের এক ইউনিট বাড়ানো সম্ভবপর—এই অবস্থা মানিয়া লইতে হয়। বৃহৎ আকারে, একত্রে নির্ভরযোগ্য (lumpy) বা অবিভাজ্য (indivisible) উপাদান থাকিলে ইহা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, প্রতিটি ফার্ম সর্বাধিক মুনাফা লাভের চেষ্টা করিতেছে এবং এই লক্ষ্য সাধনের জন্য উপাদানের চাহিদা ও নিয়োগ করিতেছে।

এই তত্ত্বের অনুমান-সমূহ

সমালোচনা (Criticism)

সকল উপাদানকে তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দিলে মোট উৎপন্ন নিঃশেষ হইয়া যায়—এই অবস্থা তখনই সম্ভবপর যদি

আমরা ধরিয়া লই যে, উৎপাদন ক্ষেত্রে সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে। যেমন, যদি সকল উপাদানের পরিমাণ দ্বিগুণ করিলে মোট উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তাহা হইলে বলা চলে, বর্ধিত উপাদানগুলিকে তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দিলে মোট উৎপাদন-বৃদ্ধির পরিমাণ নিঃশেষ হইয়া যাইবে। যদি ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকর হয় (অর্থাৎ সকল উপাদান দ্বিগুণ করিলে যদি মোট উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ হইতে বেশি হয়), তবে প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা অনুযায়ী সকল উপাদানকে পারিশ্রমিক দিতে হইলে মোট উৎপন্নের পরিমাণে কুলাইবে না। কারণ প্রতিবার নবনিযুক্ত ইউনিটগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা পূর্বের ইউনিটগুলির তুলনায় বেশি। আবার, যদি ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকর হয় (অর্থাৎ সকল উপাদান দ্বিগুণ করিলে যদি মোট উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ হইতে কম হয়), তবে সকল উপাদানকে প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দিলে মোট উৎপন্ন ফুরাইয়া যাইবে না। কারণ প্রতিবারের নবনিযুক্ত ইউনিটগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা তাহাদের পূর্বের ইউনিটগুলির তুলনায় কম। সুতরাং বলা চলে যে, একমাত্র সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্যকর হইতেছে ইহা ধরিয়া লইলেই এই তত্ত্বকে স্বীকার করা চলে।

একমাত্র সমহার প্রতিদানের ক্ষেত্রেই ইহা সম্ভবপর

আমরা জানি যে, সমহার প্রতিদানের নিয়ম বাস্তবে কার্যকর হইতে হইলে যে-অনুমানগুলি আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা আমরা কখনই বাস্তব জগতের সঠিক চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সমহার প্রতিদান দেখা দিতে পারে, যদি (ক) উৎপাদন-সূত্র পরিবর্তনীয় হয় অর্থাৎ উপাদান-সম্মিলনে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাতে কোনরূপ নির্দিষ্টতা না থাকে, (খ) উপাদানগুলির প্রতিটি ইউনিট নিখুঁতভাবে বিভাজ্য হয়, অর্থাৎ কোনো অবিভাজ্য উপাদান নিযুক্ত হইতেছে না ; (গ) একটি উপাদানের সকল ইউনিট গুণ বা যোগ্যতার দিক হইতে সম্পূর্ণ একজাতীয় হয় ; এবং (ঘ) একটি উপাদানের সকল ইউনিট গুণ ও যোগ্যতার দিক হইতে সম্পূর্ণ একজাতীয় হয়, এবং (ঙ) কোনরূপ বাহ্য ব্যয়সংকোচ বা ব্যয়বাহুল্য না ঘটে। এই সকল অনুমান গ্রহণ করিলে আমরা বাস্তব জগতের প্রকৃত চিত্র পাই না।

কিন্তু বাস্তবে সমহার প্রতিদান দেখা দিতে পারে না

নয়া ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা আরও ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, উপাদানগুলি

তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইতে পারে যখন পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে। কিন্তু আমরা জানি, সমহার প্রতিদান ও পূর্ণ প্রতিযোগিতা একই সঙ্গে সাধারণত দেখা দেয় না। সমহার প্রতিদানের সময়ে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দেখা দিতে পারে স্থিতিশীল অবস্থায় (static state)। অর্থনৈতিক দেহ যখন গতিশীল ; যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন যখন সর্বদাই বর্তমান, সেই অবস্থায় সাধারণত সমহার প্রতিদান দেখা দেয় না। গতিশীল অবস্থায় প্রতিটি ফার্মই অবস্থার পরিবর্তনের উৎপাদনের মাত্রা ও ব্যয় পাল্টাইতে থাকে। তাহাদের কাজকর্মের ঝোঁক ভারসাম্যের দিকে, কিন্তু ভারসাম্যে পৌছিবার পূর্বেই চাহিদা বা উৎপাদন-পদ্ধতি বদল হয়, আবার নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার পালা চলে। সমহার দীর্ঘকালীন প্রতিদানের অবস্থায় ভারসাম্য কখনই খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই অয়লারের তত্ত্ব (Euler's Theorem) অনুযায়ী ইহা প্রমাণ করা খুবই শক্ত যে যখন "অস্বাভাবিক মুনাফা" বজায় আছে তখন প্রতিটি উপাদান তাহার প্রান্তিক উৎপন্ন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়। তাই এই তত্ত্ব অনেকাংশে অবাস্তব।

এই তত্ত্বকে আর একদিক হইতে সমালোচনা করা দরকাব। জমি বা শ্রমের ক্ষেত্রে এক ইউনিট নিয়োগ করার কথা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু মূলধনের ক্ষেত্রে ইউনিট হিসাবে আমবা উহাকে প্রকাশ করিতে পারি না। 100 টাকার মূলধন, 1000 টাকার মূলধন, 10000 টাকার মূলধন—কোনটিকে এক ইউনিট বলিব ? এই অসুবিধার হাত হইতে এড়াইবার জন্য উইকসেল বা অস্ট্রীয় ধনবিজ্ঞানীরা মূলধনকে 'সময়' ও 'শ্রমের' মিলিত সঞ্চিত ফল বলিয়া বর্ণনা কবিয়াছেন। তিনি ইনপুট নিয়োগ ও আউটপুট হওয়া এই ফলপ্রসূ কালটুকুকে হিসাব করিয়া তাহাকে'সময়ের' ইউনিট বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এক ইউনিট বেশি মূলধন নিয়োগের অর্থ হইল এক ইউনিট বেশি 'সময়' নিয়োগ। পূর্বাপেক্ষা একটু বেশি সময় নিয়োগ করিলে উৎপাদন যতটুকু বাড়ে তাহাকে মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন বলিয়াছেন। কিন্তু সকল উপাদানের ক্ষেত্রে এই 'সময়টুকু' পরিমাপেব জন্য কোনো গড মানদণ্ড পাওয়া যায় না। তাই প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয়।

আর একটি বিষয় বলার আছে। সর্বশেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার তত্ত্ব অনুযায়ী মোট উৎপন্নের কত অংশ একটি উপাদান পাইবে, তাহা নির্ভর করে উপাদানগুলির পারস্পরিক পরিবর্ততার সম্ভাবনার

উপর, অর্থাৎ তাহাদের প্রান্তিক পরিবর্ততার হারের উপর। এই প্রান্তিক পরিবর্ততার হার তখন নির্ধারণ করা সম্ভব যদি আমরা উহাদের দাম পূর্বে জানিতে পারি। যেমন, সুদের হার এবং মজুরির হার পূর্বে জানা থাকিলে তবেই স্থির করা চলে এক ইউনিট শ্রমিক বা এক ইউনিট মূলধন নিয়োগ করিব কি না। প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার তত্ত্ব তাই আমাদের এক ধরণের বৃত্তাকৃতি তর্কের মধ্যে ঠেলিয়া দেয় (circular reasoning)।

উপাদানের বাজারে দাম নিরূপণ (Pricing in the Factor Market)

উপাদানের বাজার পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকিলে উপাদানের দাম কি ভাবে স্থির হয়—বণ্টন সম্বন্ধে চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব (How Factor price is determined in Perfect Factor Market or Demand and supply theory of Distribution)

আধুনিক ধনবিজ্ঞানে, বণ্টন সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব, দাম-নির্ধারণ তত্ত্বেরই প্রয়োগ মাত্র। দ্রব্যের দামের ন্যায়, উপাদানের দামও উপাদানের-বাজারে, যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ভারসাম্যের বিন্দুতে স্থির হইয়া থাকে। তাহা সত্ত্বেও যেহেতু প্রত্যেক উপাদানের যোগান ও চাহিদার কারণ ও অবস্থা পৃথক, সেইজন্য খাজনা, সুদ, মজুরি ও মুনাফা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে।

উপাদানের যোগান: দ্রব্যের ক্ষেত্রে যোগান নির্ভর করে উহার উৎপাদন-ব্যয়ের উপর। কিন্তু উপাদানের ক্ষেত্রে সেরূপ কোনো উৎপাদন-ব্যয় (Production Cost) নাই। উপাদানের বাজারে উহার যোগান নিভর করে তাহার সুযোগ-ব্যয়ের (Opportunity Cost) উপর বা কর্মান্তর ব্যয়ের (Transfer Cost) উপর।

উপাদানের মালিক যাহাতে উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য তাহার উপাদানকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হয় ওই জন্য তাহাকে দাম দিতে হয়। যদি বেশি দাম দেওয়া হয় তাহা হইলে উপাদানের যোগান বাড়িবে, যদি কম দাম দেওয়া হয় তাহা হইলে উপাদানের যোগান কমিবে। উপযুক্ত পরিমাণ উপাদানের যোগান পাইতে হইলে যতটুকু দাম না দিলে চলিবে না, তাহাকে সেই উপাদানের নিম্নতম যোগান-দাম (Minimum Supply price of factor) বলা হয়।

এক উপাদানকে বহু শিল্পে নিয়োগ করা চলে। তাই কোন্ ব্যবহারে

উপাদান নিয়োগ করিলে সর্বাধিক দাম পাওয়া যাইবে, উপাদানকে মালিক তাহা তুলনা করিয়া সেই দামে এবং সেই ব্যবহারে তাহার উপাদানকে নিয়োগ করিবে। সুতরাং কোনো উপাদানের নিম্নতম যোগান-দাম নির্ভর করে ওই উপাদানের সম্মুখে নিযুক্ত হইবার মত কিরূপ পরিবর্ত-ব্যবহার (alternative uses) আছে এবং সেই সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফার্মসমূহ কি দাম দিতে চাহিতেছে, তাহার উপর।

উপাদানের চাহিদা: কোনো উপাদানের চাহিদা-দাম (Demand Price) স্থির হয় উহার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার দ্বারা। উপাদানের একটি ইউনিট উৎপাদন-কার্যে নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বাড়ে তাহাকে সেই উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা বলে। উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপন্নের দাম অপেক্ষা বেশি থাকিলে উপাদানটির চাহিদা বাড়িতে থাকে এবং যে-বিন্দুতে উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপন্নের দাম সমান হয়, সেই পর্যন্ত উপাদানটির চাহিদা ও নিয়োগ করা হয়। এই অবস্থায় মোট উৎপন্নের পরিমাণ সর্বাধিক।

এই ভাবে উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের বিন্দুতে উপাদানের দাম স্থির হয়। এই তত্ত্ব কয়েকটি বিষয় স্বীকার করিয়া বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়, যেমন, কোনো উপাদানের সকল ইউনিট একই জাতীয় এবং একটির পরিবর্তে অপরটির ব্যবহার সম্ভবপর, প্রত্যেক উপাদানই সম্পূর্ণ বিভাজ্য এবং উপাদান-ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম কার্যকর আছে।

উপাদানের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে উপাদানের দাম কি ভাবে স্থির হয়—অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় বণ্টন তত্ত্ব (How Factor Price is determined in Imperfect Factor Market—Distribution under Imperfect Competition)

বাস্তবে দেখা যায়, উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না এবং ইহার ফলে যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যের বিন্দুতে (Competitive equilibrium) উপাদানের দাম স্থির না-ও হইতে পারে। উপাদানের বাজারে বহু কারণের ফলে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে। উহার ক্রয়ের দিকে, বা বিক্রয়ের দিকে অথবা উভয় দিকেই পূর্ণ প্রতিযোগিতার শর্তাদির অভাব দেখা দিতে পারে।

যদি কোনো বিশেষ ধরণের উপাদানের চাহিদা একটি মাত্র ফার্ম হইতে সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সেই উপাদানের বাজারে একক-ক্রেতা (Monopsonist buyer) আছে বলা হয়। এইরূপ একক-ক্রেতা উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে কম পারিশ্রমিক দিয়া সর্বদাই উপাদানের মালিককে শোষণ করিতে পারে। উপাদান বেশি নিয়োগ করিলে দাম বেশি দিতে হইতে পারে, এই কারণে কম উপাদানের নিয়োগ এবং কম উৎপাদন করিতেছে—একক উৎপাদকের পক্ষে তাহাও অসম্ভব নহে। এইরূপ শোষণ সম্ভবপর হয় কারণ সেই উপাদান অন্যত্র নিযুক্ত হইতে চলিয়া যাইতেছে না, অর্থাৎ উপাদানের চলনশীলতা (Mobility) কম। যতই উপাদানটির চলনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে, ততই তাহাকে নিজের ফার্মে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার জন্য অধিক পারিশ্রমিক দিতে হইবে। উপাদানের চলনশীলতা কমিয়া গেলে উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে পারিশ্রমিক কমিয়া যাইতে পারে, কারণ ফার্মটি জানে যে উৎপাদনের মালিকের স্থানান্তরে বা কর্মান্তরে চলিয়া যাইবার শক্তি, ইচ্ছা ও সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে।

ক্রয়ের দিকে : একক ক্রেতা, কতিপয় ক্রেতা। বিক্রয়ের দিকে : বিক্রেতার পছন্দ, একক বিক্রেতা। উভয় দিকে : দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া বা দ্বিপাক্ষিক অলিগোপলি

একক ক্রেতা দাম-স্বতন্ত্রতার দ্বারাও শোষণ করিতে পারে। উপাদানের যে ইউনিট যে-পারিশ্রমের কমে কাজ করিতে রাজী নহে, সেই নিম্নতম যোগান দামে উপাদানকে নিয়োগ করিতে পারা একক ক্রেতার পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব।

উপাদানের বাজারে যদি কতিপয়-ক্রেতা (Oligopsony) থাকে, তাহা হইতে দাম কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে কতিপয় ক্রেতার নিজেদের মধ্যে কতখানি একযোগে কাজ করার মনোভাব বা সমঝোতা (Collusion) আছে, তাহার উপর। পারস্পরিক সম্পূর্ণ বোঝাপড়া থাকিলে তাহারা প্রায় একক ক্রেতার ন্যায় কম দামে উপাদান ক্রয় করিতে পারিবে। নিজেদের মধ্যে একত্র কাজের মনোভাব যত কম থাকিবে, তত বেশি দামে তাহাদের উপাদান ক্রয় করিতে হইতে পারে।

বিক্রয়ের দিকে, উপাদানের বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হইবে যদি বিক্রেতাগণ কোনো ক্রেতাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে এবং তাহার নিকট উপাদান বিক্রয় করিতে অধিক ইচ্ছা প্রকাশ করে। (যেমন, সুনাম, প্রতিষ্ঠা, সম্মান অথবা অধিক নিরাপত্তার আশায় অনেক লোক কম মাহিনাতেও সরকারী চাকরি

বিক্রয়ের দিক (ক) বিক্রেতার পছন্দ

বেশি পছন্দ করে)। এইরূপ অবস্থায় সেই পছন্দশীল ক্রেতা বা ফার্ম কম দামে উপাদান ক্রয় করিতে পারে।

বিক্রেতাগণ সংঘবদ্ধ হইয়া এরূপ সংগঠন স্থাপন করিতে পারে যে তাহা উপাদান বিক্রয়ের কাজ নিজের আয়ত্তে রাখে এবং বিভিন্ন ক্রেতার উপর চাপ দিয়া অধিক দামে উপাদান বিক্রয় করিতে পারে। যেমন অনেক শিল্পে শুধু শ্রমিক সংঘের মারফতই শ্রমিকের নিয়োগ বা বিক্রয় হয়। এইরূপ অবস্থায় উহারা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা হইতে অধিক দামে উপাদান বা শ্রম বিক্রয় করিতেছে এরূপ ঘটিতে পারে।

(খ) একক বিক্রেতা

তবে, ইহা কেবল স্বল্পকালীন অবস্থায় সম্ভব। কারণ, দীর্ঘকালে সেই উপাদানের পরিবর্তে অপর উপাদান নিয়োগ করার চেষ্টা হইবে অথবা একক-বিক্রেতার ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইবে অথবা একক বিক্রেতার সহিত দর-কষাকষি ও শক্তি পরীক্ষার জন্য ক্রেতাদের সংগঠন স্থাপিত হইয়া দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়ার (Bilateral Monopoly) প্রতিষ্ঠা হইবে।

দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়ার ক্ষেত্রেও উপাদানের দাম কি হইবে, তাহা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। ক্রেতা-সংঘের ও বিক্রেতা-সংঘের পারস্পরিক শক্তির উপর, উৎপাদন-পদ্ধতিতে উপাদানটির প্রয়োজনীয়তার মাত্রার উপর এবং দ্রব্যের বাজারের অবস্থার উপর ইহা নির্ভর করে। ক্রেতা সংঘ যথাসম্ভব কম দাম রাখিতে চাহে, বিক্রেতা-সংঘ যথাসম্ভব বেশি দাম রাখিতে চেষ্টা করে।

দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া

সুতরাং দেখা যাইতেছে, দ্রব্যের বাজারে বা উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে উপাদানের পারিশ্রমিক সাধারণত উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে কম হয়। শ্রমের বাজারে এইরূপ ঘটিলে মিসেস রবিনসন্ বলিতে চাহেন যে, মালিক শ্রমিককে শোষণ (Exploitation) করিতেছে। তাঁহার মতে সমাজে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিবার ফলেই এরূপ শোষণ করা সম্ভব হইতেছে।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও শোষণ

কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে, সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন যোগ করিলে দেখা যায় উহা মোট উৎপন্ন হইতে অধিক, সুতরাং এমন কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না যাহাকে আমরা শোষণ বলিতে পারি। সকল উপাদানকে তাহাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার পরে মোট উৎপন্ন হইতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলেই বলা চলে মালিক বা উদ্যোক্তা তাহা শোষণ করিতেছে। দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে সকল ফার্মই মাত্র স্বাভাবিক মুনাফাটুকু পাইতে পারে, যাহা না পাইলে সে ব্যবসায়

ছাড়িয়া দিবে। সেই স্বাভাবিক মুনাফা ব্যতীত কোনো উদ্বৃত্ত লাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে ইহা ঠিক, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় যে-পারিশ্রমিক উপাদানের মালিক হইতে পারিত, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় সে তাহা হইতে কম পায়, কারণ তাহার প্রান্তিক উৎপন্নকে কম দামে বাজারে বিক্রয় করিতে হয়। প্রতিযোগিতার অপূর্ণতা যত দূর হইবে, উপাদানসমূহের পারিশ্রমিকও সাধারণভাবে, তত বাড়িতে থাকিবে। সুতরাং তাঁহার মতে, ইহা শোষণ নহে, উপাদানের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার দরুনই প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে উপাদানের দাম কম হইয়া থাকে।

আয়-বৈষম্য (Inequality of Incomes)

আয়-বৈষম্য ও উহার কারণ (Inequality of Incomes and its causes)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থাপিত হইলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সকল দেশে কম বেশি আয়-বৈষম্য দেখা যায়। মানুষ সকলেই সমান, ইহা ভগবানের চক্ষে বা আইনের চক্ষে সত্য হইলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে আয় ও সম্পদের বিপুল বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক সমাজে জনসংখ্যার একাংশ কায়ক্লেশে কোনমতে জীবন ধারণের উপযোগী আয় করে এবং অপর অংশ আরাম ও বিলাস দ্রব্য ব্যবহারের উপযোগী অধিক আয় পাইয়া থাকে। জাতীয় আয়ের বণ্টন এমন কখনো হয় না যে সকল ব্যক্তির আয় সমান। এইরূপে সমাজে নিম্ন-আয় গোষ্ঠীর (Low-income group) ও উচ্চ-আয় গোষ্ঠীর (High-income group) সৃষ্টি হয়। কোনো দেশের জাতীয় আয়ের কত অংশ দেশের কত পরিমাণ জনসংখ্যার নিকট চলিয়া যাইতেছে, সেই অনুযায়ী বুঝিতে পারা যায়, সেই দেশের আয়বৈষম্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা কি পরিমাণ। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে লর্ড স্ট্যাম্প হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, সেখানকার আয়কারীদের 1·3% অংশ মোট জাতীয় আয়ের 24·2% অংশ পাইয়া থাকে , এবং আয়কারীদের 71·3% অংশ জাতীয় আয়ের মাত্র 29% অংশ পাইয়া থাকে। আমেরিকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার 40% অংশ জীবনধারণের স্তরের উপযোগী আয় করিতে পারে না ; 30% অংশ মোটামুটি জীবনধারণের উপযোগী আয় করে এবং বাকী 30% অংশের আয় মোটামুটি পর্যাপ্ত।

জাতীয় আয়ের বিভাগ ও আয়বৈষম্যের প্রকৃতি

এইরূপ আয়বৈষম্যের বহু কারণ আছে। প্রথমত, বলা হয় যে, যাহারা অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন তাহাদের আয় অধিক, যাহাদের যোগ্যতা কম তাহাদের আয় স্বভাবতই কম। আয়বৈষম্য সমর্থনের উদ্দেশ্যে এইরূপ যুক্তি অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বহু অযোগ্য ব্যক্তি অধিক আয় লাভ করিতে পারিতেছে এবং বহু যোগ্য ব্যক্তি জীবনধারণের উপযোগী আয় লাভ করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, অধিক আয় লাভের সুযোগের ফলেই তাহাদের যোগ্যতা বাড়ে এবং অধিকতর আয় লাভের সুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত, আয়বৈষম্য বজায় থাকার প্রধান একটি কারণ হইল সম্পত্তি ও সম্পদের (Property and wealth) উপর ব্যক্তিগত মালিকানা। ব্যক্তিগত মালিকানার ফলেই সম্পদের সঞ্চয় ঘটে এবং উহা হইতে অধিক আয় লাভ করা সম্ভবপর হয়।

আয়বৈষম্যের কারণ: যোগ্যতা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার ও পরিবেশ

মনে রাখিতে হইবে যে, সম্পদ ও সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা না-থাকিলেও আয়বৈষম্য থাকিতে পারে, যথন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আয়বৈষম্য রহিয়াছে। ব্যক্তিগত মালিকানাহীন সমাজে যোগ্যতার পার্থক্য অনুযায়ী আয়-পার্থক্য থাকা সম্ভব। ব্যক্তিগত মালিকানাযুক্ত সমাজে যোগ্যতার তুলনায় সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকানাই আয়বৈষম্যের প্রধান কারণ, অধিক সম্পত্তির মালিক অন্য ব্যক্তির যোগ্যতা ও কর্মশক্তির উপর মালিকানা স্থাপন করিয়া অধিকতর আয়ের জন্য উহাদের ব্যবহার করিতে পারে। তৃতীয়ত, উত্তরাধিকারী ব্যবস্থা এইরূপ আয়বৈষম্যের অন্যতম প্রধান কারণ। সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকের উত্তরাধিকারীগণ জীবনের শুরুতেই সমাজের অন্যান্য অনেকের তুলনায় বহু সুযোগ, সুবিধা ও ক্ষমতা পাইয়া থাকে; ইহার ফলে প্রতিযোগীদের তুলনায় আয় ও উপার্জনের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রারম্ভিক সুবিধা বেশি থাকে। চতুর্থত, উচ্চ-আয় গোষ্ঠীর লোকজনই অধিক আয় লাভের সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ লাভ করে। সামাজিক সম্মান, সুপরিচিতি এবং সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে আনাগোনা প্রভৃতি, অন্যান্য সকলের তুলনায় তাহাকে বহু সুযোগ দেয়। মোটামুটি ভাবে তাই, বংশপরম্পরায়, ধনীরাই ধনী থাকে এবং গরীবগণই গরীব থাকে। সুতরাং বলা যায়, আয়বৈষম্যই অধিকতর আয়বৈষম্যের কারণ।

আয় বৈষম্যের ফলাফল ও প্রতিকার (Effects of Inequality incomes)

আয়বৈষম্যের প্রধান ফল হইল, ইহা সমাজ-দেহে এক ধরণের অশান্তি এবং সংঘর্ষের ভিত্তি রচনা করে ; জাতি নিজের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। বিপরীত স্বার্থসম্পন্ন যুধ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হইয়া পড়ে, শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীসংঘর্ষ শুরু হয়, শ্রেণীবিপ্লবই রাজনৈতিক কর্মাদর্শের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইয়া পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই আইনকানুন রচিত হয় , ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের ব্যাখ্যা শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিচালিত হয়। দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়া পড়ে। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, চরম আয়-অসাম্যই সমাজ-বিপ্লবের মূল কারণ। মার্কস বলিয়াছেন, পৃথিবীতে সকল বিপ্লবের সময় শ্রেণীহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠা করা ও সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ফিরাইয়া আনা বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে জড়িত থাকে।

শ্রেণীসংগ্রাম, অভিজাততন্ত্র, সমাজ-দেহে অশান্তি, বিপ্লব, উপকরণের অপ্রয়োজনীয় নিয়োগ, ইত্যাদি

ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, আয়বৈষম্যের ফলে সমাজে সম্পদের অযৌক্তিক এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার হয়, সমাজের পক্ষে ইহা অপচয়মূলক বলা চলে। সমাজে অল্পসংখ্যক লোকের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপকরণসমূহ নিযুক্ত হয়, অধিকসংখ্যক লোক জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। তাহা ছাড়া, আয়বৈষম্যের ফলে সামগ্রিক কল্যাণও হ্রাস পাইয়া থাকে। ধনী যে 100 টাকা বিলাস-দ্রব্যে ব্যয় করে তাহা গরীবের হাতে থাকিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ব্যয়িত হইতে পারিত, এবং ঐ অর্থ হইতে উপযোগিতা অধিক পাওয়া যাইত। সুতরাং আয়বৈষম্য কমাইলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (Total economic welfare) বৃদ্ধি পাইবে বলা চলে।

আয়বৈষম্য দূর করা উচিত, অথবা উহার গভীরতা হ্রাস করা উচিত, ইহা লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সকল মানুষই সমান এবং সকল অসাম্য মানবজাতির পক্ষে অপমানকর, ইহা যাঁহারা বলিতে চাহেন, তাঁহারা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপন এবং ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, এইরূপ বলপ্রয়োগের দ্বারা বিপ্লবের

আয়বৈষম্য দূর করা

ফলে উৎপাদনের ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতে পারে এবং জাতীয় আয় হঠাৎ খুবই কমিয়া যাইতে পারে।

অনেকে বলেন যে, আয়বৈষম্য সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নহে, কারণ যোগ্যতার প্রভেদ থাকিবেই ; এবং সম্পূর্ণ দূর করা উচিত নহে, কারণ অধিক আয় লাভ করিবার সম্ভাবনাই যোগ্যতা বৃদ্ধির প্রেরণাশক্তি হিসাবে কাজ করিবে।

উহা হ্রাস করা

তাঁহাদের মতে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আয়বৈষম্য কমাইয়া দেওয়া উচিত। ক্রমবর্ধমান হারে কর আরোপ, জনপ্রয়োজনীয় শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, উত্তরাধিকার-কর স্থাপন, শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক বীমাব্যবস্থা প্রবর্তন, নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারণ, একচেটিয়া ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্যে আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশে আয়বৈষম্যের হার কমাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

অনুশীলনী

1. Examine the main assumptions behind the marginal productivity theory of distribution.

2. Examine the Marginal Productivity theory of Distribution.

3. Discuss the statement that the earnings of any factor of production tend to be equal to the value of its marginal product.

4. Explain in what way the marginal pcoductivity of a factor is related to its earning.

14

খাজনা

Rent

খাজনা কাহাকে বলে (What is Rent)

জমির মালিকেরা তাহাদের জমি অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার দরুন বৎসরান্তে যে নিয়মিত শস্য বা অর্থ পাইয়া থাকে তাহাকে সাধারণ ভাষায় খাজনা বলে। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে বলা হইয়াছে যে, উন্নততর জমির মালিকেরা তাহাদের জমিতে উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় অধিক উৎপাদন হয় বলিয়া চাষীর নিকট হইতে খাজনা পাইয়া থাকে। আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রেই নহে, অপরাপর সকল উপাদানের মালিকেরাও ভোগ করিয়া থাকেন। যে-সকল উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ তাহাদের আয়ের মধ্যেই কিছুটা অংশ খাজনা। যে-পারিশ্রমিক না পাইলে সেই উপাদান মোটেই কাজ করিতে রাজি হইবে না, সেই নিম্নতম যোগানদাম হইতে সে যতটুকু বেশি পারিশ্রমিক পাইতেছে—সেই পার্থক্যটুকুকে বা উপাদানের আয়ের মধ্যে এইরূপ 'উদ্বৃত্ত অংশকে' খাজনা বলা চলে। সকল উপাদানের আয়ের মধ্যেই, তাই, এই খাজনাভাব (rent-element) থাকিতে পারে। যেমন, কোনো শ্রমিক 1·50 টাকাতেই কাজ করিতে রাজি ছিল, ইহাই তাহার নিম্নতম যোগান দাম। কিন্তু (কোনো কারণে) যদি মজুরি বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে সেও, ধরা যাউক, 2·25 মজুরি পাইতে লাগিল। উদ্বৃত্ত এই ·75 পঃ হইল মজুরের আয়ের মধ্যে খাজনার রূপ বা খাজনাংশ। যদি 1·50 টাকাতে যথেষ্ট মজুর পাওয়া যাইত, তাহা হইলে মজুরি বাড়িত না, শ্রমিকের আয়ের মধ্যে খাজনা-ভাব থাকিত না। 1·50 টাকাতে মজুরের যোগান সীমাবদ্ধ, সেইজন্য মজুরির হার বৃদ্ধি হইতেছে এবং এই খাজনাভাবের সৃষ্টি হইতেছে।

আয়ের মধ্যে 'উদ্বৃত্ত' অংশ সীমাবদ্ধ যোগানের দরুন যাহা সম্ভব হয়

জমির যোগান একেবারেই সীমাবদ্ধ বলিয়া জমি হইতে উহার মালিকের আয়কে সম্পূর্ণরূপে খাজনা বলা চলে। আমাদের দেশের সাধারণ ভাষায় অথবা ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে খাজনা শুধু জমির মালিকের আয় বলিয়াই ধরা হয়, অন্যান্য উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে নহে। জমির মালিক তাহার জমি অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার দরুণ যে-খাজনা পায় তাহাকে স্থূল খাজনা (Gross Rent) বলে। যদি সে জমিতে নলকূপ বা টিউবওয়েল স্থাপন করে বা যদি কোনো জমির উন্নতির জন্য বিশেষ ধরনের চেষ্টা করে তাহা হইলে এই সকল কাজের দরুন জমির মালিককে মূলধন ব্যয় করিতে হয়। মোট খাজনার মধ্যে এই মূলধনের দরুন সুদ আদায় করা হয়। মোট খাজনা হইতে এই সুদের অংশ বাদ দিলে নীট বা বিশুদ্ধ বা অর্থনৈতিক খাজনা (Economic Rent) পাওয়া যায়।

স্থূল খাজনা ও নীট খাজনা

এইরূপ অর্থনৈতিক খাজনাকে উদ্বৃত্ত (surplus) বলা হয়, কারণ জমিদার কোনরূপ পরিশ্রম বা চেষ্টা না-করিয়াই এই আয় পাইয়া থাকে। অ্যাডাম স্মিথ লিখিয়াছেন যে, অন্য সকল মানুষের মত জমিদাররাও নিজেরা যাহা বপন করে নাই উহার ফল লাভ করিতে খুব ভালবাসে। উপরন্তু, উপাদান ব্যয়ের তুলনায় যত অধিক উৎপন্ন হয়, সেই উদ্বৃত্ত জমিদারগণ খাজনার আকারে লাভ করেন বলিয়াও অনেকে খাজনাকে উদ্বৃত্ত বলেন।

উদ্বৃত্ত

রিকার্ডীয় খাজনা তত্ত্ব (Ricardian theory of Rent)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অন্যতম ডেভিড রিকার্ডো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে খাজনা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আলোচনা করেন। তাঁহার মতে "খাজনা হইল ভূমির উৎপন্নের সেই অংশ যাহা জমির আদি ও অক্ষয় শক্তির দরুন জমিদারকে দেওয়া হয়। জমিতে উন্নতির জন্য মূলধন নিয়োগ করিলে জমিদার তাহা হইতে যে-সুদ পায় উহাকে খাজনা হইতে পৃথক করিবার জন্য রিকার্ডো এইরূপে অর্থনৈতিক খাজনার নির্ণয় করিয়াছেন।

কিরূপে এই খাজনা স্থির হয়? মনে করা যাউক, কোনো দেশে বিভিন্ন স্তরের উর্বরতাশক্তিসম্পন্ন জমি আছে। জনসংখ্যাও যখন কম, তখন কেবলমাত্র সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি চাষের দ্বারা যে-পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবে তাহাতে

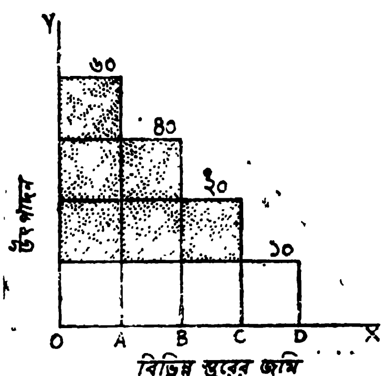
সকলের খাদ্যের অভাব মিটিবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যোৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা হইল। জমির পরিমাণ না বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিলে শ্রম ও মূলধনের ক্রমশ অধিকতর নিয়োগের ফলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকর হইতে শুরু করিবে, শস্যের ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িতে থাকিবে অথবা উর্বরতম জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হওয়ায় ক্রমেই কম উর্বর জমি চাষ হইতে থাকিবে; এইরূপে ক্রমাগত অনুর্বর জমিগুলির চাষ শুরু হইবে। কিন্তু অবশেষে উৎপাদন এমন এক স্তরে আসিয়া পড়িবে, যে-স্তরের জমিতে উৎপাদন ব্যয় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সমান। সেই জমিকে প্রান্তিক জমি বলা হয়। সেই প্রান্তিক জমির ঊর্ধ্বে যে-সকল জমিতে উৎপাদন-ব্যয় হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অধিক তাহাদের প্রান্তোর্ধ্ব জমি (Intra-marginal Land) বলে। প্রান্তিক জমির নিম্নে যে সকল জমিতে উৎপাদন-ব্যয় হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কম তাহাদের প্রান্তনিম্ন জমি (Sub Marginal Land) বলা চলে। প্রান্তিক জমিতে উৎপাদনের তুলনায় একই ব্যয়ে প্রান্তোর্ধ্ব প্রত্যেক স্তরের জমিতে যে উদ্বৃত্ত শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা সেই জমির খাজনা। কারণ সীমাবদ্ধ জমি ব্যবহারের সুযোগ পাইবার জন্য চাষীরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে এই উদ্বৃত্তের সমস্তটাই জমিদারকে খাজনা হিসাবে দিতে বাধ্য হইবে। নিম্নে তালিকার সাহায্যে ইহা দেখানো হইল :

রিকার্ডীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ

	মোট	উৎপাদনের পরিমাণ	মণ প্রতি দাম	উৎপন্নের মোট দাম	উদ্বৃত্ত বা খাজনা
প্রথম স্তরের জমি	10 টাকা	30 মণ	2 টাকা	60 টাকা	50 টাকা
দ্বিতীয় স্তরের জমি	10 টাকা	20 মণ	2 টাকা	40 টাকা	30 টাকা
তৃতীয় স্তরের জমি	10 টাকা	10 মণ	2 টাকা	20 টাকা	10 টাকা
চতুর্থ স্তরের জমি	10 টাকা	5 মণ	2 টাকা	10 টাকা	খাজনা নাই

দেখা যাইতেছে চতুর্থ স্তরের জমিতে 10 টাকা ব্যয়ে মোট 10 টাকা দামের শস্য উৎপন্ন হইতেছে। ইহা প্রান্তিক জমি, কোনো উদ্বৃত্ত নাই, সুতরাং ইহার ব্যবহারের জন্য কোনো খাজনা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এই জমির কোনো খাজনা নাই। ইহার ঊর্ধ্বে সকল জমির উদ্বৃত্তাংশ চাষীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে খাজনারূপে জমির মালিককে দিয়া দিতে হইবে। কিন্তু জমিদারকে না দিয়া চাষী নিজে লাভ করিলেও তাহা খাজনারই নামান্তর—উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত (Producer's Surplus) বলিয়া ইহাকে অভিহিত করা হইবে। প্রান্তিক জমির তুলনায় উন্নত স্তরের জমিসমূহে যে-পরিমাণে অধিক উৎপাদন হয় তাহাই উৎপাদকের উদ্বৃত্ত, ইহাকে পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত (Differential Surplus) বলা চলে।

এই তত্ত্বটিকে রেখাচিত্রের সাহায্যেও প্রকাশ করা চলে। নিচের চিত্রটিতে সমান আয়তনের চারিটি জমিখণ্ড আছে, OA, AB, BC ও CD. OA জমি খণ্ডে 10 টাকা ব্যয়ে 60 টাকা মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইতেছে, AB-তে 40 টাকার, BC-তে 20 টাকার এবং CD-তে 10 টাকার। CD প্রান্তিক জমি, উহার তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিখণ্ড-গুলিতে উদ্বৃত্ত বা খাজনা পাওয়া যাইতেছে। খাজনা হইল পার্থক্য-জনিত উদ্বৃত্ত, তাই প্রান্তিক জমি জানা না থাকিলে খাজনা বাহির করা অসুবিধা। মনে রাখা দরকার, প্রান্তিক জমি একেবারে সর্বনিকৃষ্ট নয় - কারণ ইহা অপেক্ষা কম উর্বরতাসম্পন্ন জমিও আছে, তবে সেইগুলি চাষ হইতেছে না।



রিকার্ডোর এই জমি হইতে জানিতে পারা যায় যে, খাজনার পরিমাণ দামের উপর নির্ভর করে। দাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট দাম বাড়িবে, ফলে উদ্বৃত্তের মূল্য এবং খাজনা উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে। দাম কমিলে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট দাম কমিবে, ফলে উদ্বত্তের মূল্য এবং খাজনা উভয়ই কমিয়া যাইবে। কিন্তু দামের উপর খাজনার কোনো প্রভাব নাই ; ইহা বাড়িলে বা কমিলে দাম পরিবর্তন হয় না। শস্যের দাম বাড়িলে প্রান্তিক জমিতে উদ্বৃত্ত দেখা দিবে, উহা তখন প্রান্তোর্ধ্ব জমিতে পরিণত হইবে। যেমন দাম

বাড়িয়া মণ-প্রতি 3 টাকা হইলে চতুর্থস্তরের জমিতে 10 টাকা ব্যয়ে 15 টাকা মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইবে, উহাতে 5 টাকা খাজনা হইয়া পড়িবে। সেই অবস্থায় পঞ্চম বা ষষ্ঠস্তরের জমি প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে, প্রান্তনিম্ন জমিগুলি ক্রমে প্রান্তের দিকে সরিয়া আসিবে। শস্যের দাম কমিলে সকল প্রান্তোর্ধ্ব জমির খাজনা কমিয়া যাইবে ; প্রান্তিক জমি আর প্রান্তিক থাকিবে না, উহা প্রান্তনিম্ন জমিতে পরিণত হইবে।

দাম ও চাষের প্রান্তিকতা

সমালোচনা

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে রিকার্ডীয় খাজনা-তত্ত্বকে বহু প্রকারে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, রিকার্ডো বলিয়াছেন যে, "খাজনা হইল জমি হইতে উৎপাদনের সেই অংশ যাহা ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তির দরুন জমিদারকে দেওয়া হয়।" কিন্তু আদি শক্তি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা মানুষ অনুর্বর জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করিতেছে, রাসায়নিক ও কৃত্রিম সারের সাহায্যে জমির শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং উহার শক্তিকে আদি শক্তি বলা চলে না। তাহা ছাড়া আণবিক বিস্ফোরণ ও তেজস্ক্রিয় রশ্মির যুগে কোনো কিছুকেই অক্ষয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে না। আবহাওয়া ও চাষের পদ্ধতিও জমির তথাকথিত আদি ও অক্ষয় শক্তিতে সবদাই হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতেছে। দ্বিতীয়ত, যেমন ক্যারে ও রশচার বলিয়াছেন ; বাস্তবে কৃষির প্রসার 'রিকাডো-প্রদত্ত' স্তর অনুযায়ী কখনই হয় না। সুতরাং রিকাডোর তত্ত্বকে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু রিকাডোর তত্ত্ব চাষের এই অনুক্রমের (order of cultivation) উপর নিভরশীল নহে। জমির উবরতা বা জমির অবস্থান (situation) যে-কোনো ব্যাপারেই যদি একখণ্ড অপর খণ্ডের উপর পার্থক্যজনিত সুবিধা (differential advantage) পাইয়া থাকে তাহা হইলেই খাজনার উদ্ভব হইবে।

1. ভূমির শক্তি
2. চাষের অনুক্রম,
3. দামের সহিত খাজনার সম্পর্ক
4. শুধু জমির নহে অন্য উপাদানের ক্ষেত্রেও

তৃতীয়ত, রিকার্ডীয় খাজনা তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত যে, দামের হিসাবের সময়ে খাজনাকে উহার মধ্যে ধরা হয় না—বাস্তবে ইহা ঠিক নহে। চাষীর অপরাপর ব্যয়ের মধ্যেই হিসাব হইয়া খাজনা দামকে প্রভাবিত করে।

চতুর্থত, আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, খাজনা শুধু জমির আয়ের ক্ষেত্রেই সম্ভব, তাঁহাদের মতে যে-কোনো দুষ্প্রাপ্য উপাদানের মালিকের আয়ের মধ্যেই কিছুটা খাজনা-ভাব বা খাজনাংশ থাকিতে পারে।

কেন খাজনার উদ্ভব হয় (Why rents arise ?)

খাজনার উদ্ভব হয় কারণ, জমির যোগান সীমাবদ্ধ। যদি উর্বরতম জমির যোগান সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক হইত (Perfectly Elastic), অর্থাৎ যত প্রয়োজন তত পাওয়া যাইত তাহা হইলে খাজনার উদ্ভব হইত না। কিন্তু যেহেতু জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক সেইজন্য শস্যের চাহিদা বাড়িলে বা দাম বাড়িলে কম উর্বরতাসম্পন্ন জমিও চাষ হয়। এই অবস্থায় তাহাদের সহিত বেশি উর্বরতা-সম্পন্ন জমির উৎপাদনের পরিমাণে পার্থক্য থাকায় খাজনার উদ্ভব হইয়া থাকে। উপাদানের যোগানেব সীমাবদ্ধতা ও পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত, ইহাই খাজনার উদ্ভবের কারণ।

যোগানের সীমাবদ্ধতা ও পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত

যদি সকল জমির উর্বরতাশক্তি সমান হয় তাহা হইলেও খাজনার উদ্ভব হইবে। কারণ সকল জমি সমান সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত নহে। যে-জমির অবস্থান সুবিধাজনক নহে, বাজার হইতে দূরে অবস্থিত, তাহাদের খাজনা কম হইবে, যে জমির অবস্থান বাজারের নিকটে, অর্থাৎ যাহাদের পণ্য আদান-প্রদানের ব্যয় কম, তাহাদের খাজনা বেশি হইবে। ইহাকে অবস্থানজনিত খাজনা (situational Rent) বলে। যেমন, কোনো জমি বাজারের নিকটে অবস্থিত বলিয়া উহার শস্য বিক্রয়ের জন্য কোনো যান-বাহনের ব্যয় হয় না, ধরা যাউক সেই জমির খাজনা 5 টাকা। একই উর্বরতাসম্পন্ন ও আয়তনের অপর একখণ্ড জমি বাজার হইতে এমন দূরে অবস্থিত যে, তাহার শস্য বিক্রয়ের জন্য 2 টাকা ব্যয় হয়। এইরূপ অবস্থায় প্রথমখণ্ড জমির মালিক চাষীর হইতে যে-খাজনা পাইয়া থাকে (5 টাকা), দ্বিতীয় খণ্ডের মালিক তত পাইবে না (3 টাকা পাইবে), কারণ বাজার হইতে দূরে অবস্থিত জমি হইতে উৎপাদনের মোট ব্যয় বেশি (উৎপাদন-ব্যয়+যানবাহনজনিত ব্যয়)। মোট ব্যয় হইতে উদ্বৃত্ত হইল খাজনা, তাই বাজারের নিকটে অবস্থিত জমির খাজনা বেশি, দূরে অবস্থিত জমির খাজনা কম।

যদি সকল জমির উর্বরতা সমান হয় তাহা হইলে কি খাজনার উদ্ভব হইবে?

যদি সকল জমির উর্বরতাশক্তি সমান হয় এবং তাহাদের অবস্থানও যদি সমান সুবিধাজনক হইয়া থাকে, তাহা হইলেও খাজনার উদ্ভব হইবে। জমির ব্যবহার বহু উদ্দেশ্যে হইতে পারে; বহুপ্রকার দ্রব্য ব্যবহারে জমির নিয়োগ সম্ভবপর। বিভিন্ন শস্য উৎপাদন (যেমন ধান, গম, ভুট্টা বা চা ইত্যাদিতে) জমির নিয়োগ ঘটে। মনে করা যাউক, গম উৎপাদনে নিযুক্ত হইলে সেই জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য মোট ব্যয়ের সমান, কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না এবং সেইহেতু কোনো খাজনার উদ্ভব হয় না। সেই জমিতে চা উৎপন্ন হইলে মোট ব্যয়ের তুলনায় 5 টাকা বেশি উৎপাদন হয়। জমির মালিক নিশ্চয়ই সেই জমি চা উৎপাদনে নিয়োগ করিবে, গম উৎপাদনে নহে। গম, তুলা বা ভুট্টা উৎপাদনকারী চাষীকে ওই জমির ব্যবহারের জন্য নিশ্চয় অন্তত 5 টাকা খাজনা দিতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে জমির মালিক চা-উৎপাদনকারী চাষীকে এই জমি ব্যবহার করিতে দিবে, সেই চাষীও মোট ব্যয় হইতে উদ্বৃত্ত 5 টাকা খাজনা দিতে বাধ্য হইবে। অন্য দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হইলে জমিতে যে উদ্বৃত্ত হইতে পারিত, জমির খাজনা এক্ষেত্রে তাহাই হইবে। পরিবর্ত-ব্যবহারে নিযুক্ত হইলে জমির যাহা খাজনা হইত তাহা না দিলে কোনো বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য জমি ভাডা পাওয়া সম্ভব নয়। চা-উৎপাদনকারী যে-পরিমাণ খাজনা দিতে চায় অন্য শস্য উৎপাদনকারীকেও অবশ্যই অন্তত সেই পরিমাণ খাজনা দিতে হইবে। সুতরাং খাজনা নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যবহারে নিয়োগজনিত তুলনামূলক উদ্বৃত্তের উপর। গৃহনির্মাণ, গোচারণ, শস্য উৎপাদন – প্রত্যেক ব্যবহারেই জমির খাজনা হইল অন্য ব্যবহারে নিয়োগকারী যত খাজনা দিতে প্রস্তুত উহা অপেক্ষা কত অধিক পারিশ্রমিকে কোনো একটি বিশেষ ব্যবহারে সেই জমিকে পাওয়া যায়। এই বদলি-ব্যবহারের প্রান্তের (margin of transference) উপর জমির এক এক ব্যবহার হইতে অন্য ব্যবহারে নিয়োগ নির্ভর করে। বদলি-ব্যবহারের (transfer use) দরুন এই দাম ব্যয়েরই অন্তর্ভুক্ত।

উর্বরতা শক্তি ও অবস্থান সমান হইলেও খাজনার উদ্ভব হয়: খাজনা ও সুযোগ-ব্যয়

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইবার ফলেও খাজনার উদ্ভব হয়। যখন একই জমিতে বারবার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বাড়ানো হয়, তখন প্রত্যেক পরবর্তী বারের শ্রম ও মূলধন নিয়োগ হইতে উৎপাদন-বৃদ্ধি ক্রমশ কম হইতে থাকে। অবশেষে এমন এক স্তরে পৌছায় যে,

সেইবারের শ্রম ও মূলধনের দাম ইহাদের নিয়োগের ফলে বর্ধিত উৎপন্নের দামের সমান। পূর্ববর্তীবারের শ্রম ও মূলধনের দামের তুলনায় তাহাদের নিয়োগ দ্বারা বর্ধিত উৎপন্নের দাম অধিক ছিল: এই উদ্বৃত্তকে পূর্ববর্তী বারে শ্রম ও মূলধনের খাজনা মনে করা চলে। প্রগাঢ়-চাষের (intensive cultivation) সময়ে শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক-দফার (marginal dose) তুলনায় পূর্ববর্তী বা প্রান্তোর্ধ্ব-দফার উৎপাদনের (intra-marginal doses) পার্থক্যকে খাজনা বলা যাইতে পারে।

প্রগাঢ়-চাষ, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম ও খাজনা

প্রায়-খাজনা (Quasi-Rent)

রিকার্ডো ও ক্লাসিকাল লেখকগণের মতে শুধু জমি হইতে আয়কেই খাজনা বলা হয়, অপর উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা-ভাব নাই।

মার্শাল প্রমুখ নয়া-ক্লাসিকাল লেখকগণ খাজনা-তত্ত্বকে অগ্রসর করাইয়াছেন এবং মানুষের দ্বারা সৃষ্ট স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য (যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) হইতে আয়ের ক্ষেত্রেও খাজনার উদ্ভব হইতে পারে তাহা বলিয়াছেন। মার্শালের মতে খাজনার উদ্ভব হয় যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুণ। যেহেতু উপাদানের যোগানকে প্রয়োজনানুযায়ী বাড়ানো চলে না সেইজন্য তাহার মালিক উদ্বৃত্ত আয় লাভ করিবার সুযোগ পায়। জমির যোগান প্রচুর হইলে, কোনো সীমাবদ্ধতা না থাকিলে, চাষীর নিকট হইতে জমির মালিক খাজনা আদায় করিতে পারিত না, কোনো উদ্বৃত্তের সৃষ্টিও হইত না।

যোগানের সীমাবদ্ধতা শুধু জমির ক্ষেত্রে নহে, মানুষের দ্বারা তৈয়ারী স্থায়ী মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে দেখা যায়। অন্তত স্বল্পকালের মধ্যে উহার যোগান বাড়ানো চলে না এবং তাহার ফলে উহার মালিক পূর্বাপেক্ষা অধিক আয় করে; এই উদ্বৃত্ত আয়কে খাজনা বলা চলে। মার্শাল ইহাকে মাছ ধরার উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়াছেন।

মাছের দাম বাড়িলে তৎক্ষণাৎ যোগান বাড়াইবার জন্য উহার উৎপাদনে নিযুক্ত নৌকা জাল ইত্যাদি (স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য) সহসা বাড়ানো চলে না। কারণ ঐ সকল দ্রব্য মানুষের দ্বারা তৈয়ারী এবং তাহা প্রস্তুত করিতে সময় লাগে। যে-সময়ের মধ্যে ওই যন্ত্রপাতির যোগান বৃদ্ধি পায় না, ততদিন

উহাদের মালিকেরা এই দামবৃদ্ধিজনিত অধিক আয় নিজেরা উদ্বৃত্ত হিসাবে পাইবে, ইহাকে খাজনা রূপে ধরা যাইতে পারে।

মার্শাল ইহাকে খাজনা বলিয়াছেন এইজন্য যে, ইহার উদ্ভবের কারণ হইল যোগানের সীমাবদ্ধতা। কিন্তু ইহাকে প্রায়-খাজনা বলিয়াছেন এইজন্য যে, এই সীমাবদ্ধতা স্বল্পকাল স্থায়ী ; দীঘকালে ইহার যোগান জমির মতন সীমাবদ্ধ নহে। দীর্ঘকালে এই উপাদানের যোগান বৃদ্ধি পাইবে, আয় কমিয়া আসিবে, আর উদ্বৃত্ত থাকিবে না, প্রায়-খাজনা লোপ পাইবে। বিশুদ্ধ খাজনা (Pure Rent) সর্বদাই থাকে, প্রায়-খাজনা কেবল স্বল্পকালেই সম্ভবপর। বিশুদ্ধ খাজনার পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত চাহিদার উপর, চাহিদার বৃদ্ধি হইলে খাজনা বাড়ে, চাহিদা হ্রাস পাইলে খাজনা কমে ; কারণ চাহিদা বাড়িলেও যোগান বৃদ্ধি কখনই সম্ভব নহে। ঠিক সেইরূপ প্রায়-খাজনার ক্ষেত্রেও চাহিদা বাড়িলেই উপাদান হইতে আয় বৃদ্ধি হইবে, কারণ স্বল্পকালে উহার যোগান বাড়িতেছে না। কিন্তু দীর্ঘকালে যোগান বাড়িবে, উদ্বৃত্ত-আয়ের বা খাজনারও বিলুপ্তি হইবে। স্থায়ী মূলধনী দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে যত অধিক সময় প্রয়োজন, তত অধিক কাল যাবৎ উহার মালিকের পক্ষে এই খাজনা পাওয়া সম্ভব হইবে। জমির ক্ষেত্রে উহা চিরস্থায়ী।

কেন খাজনা এবং কেন "প্রায়" খাজনা

এই প্রায়-খাজনা তত্ত্বের বহু প্রকার সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল যে, কেবলমাত্র যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুন খাজনার উৎপত্তি হয়, ইহা ঠিক নহে। খাজনার উদ্ভবের কারণ বিনির্দিষ্টতা (Specificity)। যদি যন্ত্রপাতির যোগান সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলেই উহার আয় বৃদ্ধি হয় না, আয়ের উদ্বৃত্তাংশ সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ উপাদানটির যোগান সীমাবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্যোক্তা বা ফার্ম ওই উপাদানটির পরিবর্তে অন্য উপাদান নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিবে এবং ওই উপাদানের পরিমাণ কম ব্যবহারের চেষ্টা করিবে। যদি তাহা সম্ভব

সমালোচনা : নিছক যোগানের সীমাবদ্ধতাই খাজনার কারণ নহে, উহা বিশেষ নির্দিষ্ট হওয়া চাই

* মার্শাল এইরূপ স্বল্পকালীন দুষ্প্রাপ্য উপাদান হইতে সম্পূর্ণ আয়কেই খাজনা বলিতেছেন। কিন্তু কেহ কেহ, যেমন ফ্রাঙ্ক বলেন যে, পূর্বের স্বাভাবিক আয়ের তুলনায় দুষ্প্রাপ্যতার দরুন বর্তমানে যে অধিক আয় ঘটিতেছে, আয়ের সেই পার্থক্যটুকুই খাজনা—সম্পূর্ণ আয় নহে। যদি বর্তমানে আয় স্বাভাবিক আয়ের তুলনায় কম হয় তাহা হইলে উহাকে বিয়োগাত্মক খাজনা ঋণাত্মক খাজনা (Negative Rent) বলে।

হয় তবে উহার আয় বৃদ্ধি হইবে না ; খাজনার উদ্ভব হইবে না। কিন্তু যদি সেই উপাদানের নিয়োগ অপরিহার্য হয় তবে উহাকে বাদ দেওয়া চলিবে না, উহার পরিবর্তে অপর উপাদানের নিয়োগ সম্ভব হইবে না, উপাদানের মালিক উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং, উপাদানের বিনির্দিষ্টতার দরুনই খাজনার উদ্ভব হইয়া থাকে, কেবলমাত্র যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুন নহে।

নানা স্থানের খাজনা (Rent of various Places)

খনি ও মৎস্যাশয়ের খাজনা (Rent of Mines and Fisheries)

খনি ও মৎস্যাশয়ের খাজনা নির্ধারণ বহু পরিমাণে জমির খাজনা নির্ধারণের ন্যায়। উহারা প্রকৃতির দান এবং উহাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইয়া থাকে। সকল খনি ও মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের সম্পদ সমান নহে, কাহারও মজুত-সম্ভার বেশি ; কাহারও বা কম। প্রান্তিক খনি অপেক্ষা, বা কম সম্পদযুক্ত খনির তুলনায় অধিক সম্পদযুক্ত খনি হইতে উৎপাদনে যে পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে খাজনা বলা চলে। সেইভাবে ইহাদের খাজনা স্থির হয়।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, খনির ক্ষেত্রে চিরকাল ধরিয়া অবিরাম আয়ের স্রোত ভোগ করা যায় না, জমিতে সঠিক সার দিয়া, প্রায় চিরদিন আয় সৃষ্টি করা চলে, কিন্তু খনির অভ্যন্তরে খনিজ সম্পদের মজুত সীমাবদ্ধ, আজ বা কাল উহা শেষ হইবেই। মজুত সম্পদ ফুরাইয়া আসিবে, খনির জীবনও শেষ হইবে, উহা সম্পদশূন্য অকেজো জমিতে পরিণত হইবে। ক্লাসিকাল মতে ভূমির শক্তি যেরূপ অক্ষয়, খনির শক্তি সেরূপ অক্ষয় নহে। সুতরাং এই মজুত-সম্পদের ক্ষয়ের দরুন, উহা ফুরাইয়া আসার ক্ষতিপূরণ হিসাবে, জমির অন্য খাজনা ছাড়াও প্রতি-টন দ্রব্য পিছু আরও কিছু দাম খনিজ মালিককে দিতে হয়। তাহাকে সেলামী (Royalty) বলে। সুতরাং, খনির মালিক যাহা পায় তাহার মধ্যে খাজনা ও সেলামী উভয়ই মিশ্রিত থাকে।

শহরে জায়গায় খাজনা (Urban Site Rent)

শহুরে জায়গার খাজনা নির্ভর করে, প্রধানত, অবস্থানজনিত সুবিধার (Situational Advantage) উপর। শহরের কোন্ অঞ্চলের অবস্থানজনিত সুবিধা কিরূপ তাহা স্থির হয় ঐ অঞ্চল প্রধানত কোন্ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইতেছে তাহার দ্বারা। যদি বসবাসের উদ্দেশ্যে উক্ত অঞ্চল অধিকতর সুবিধাজনক হয় (যেমন বালিগঞ্জে

1. ব্যবসায়ের সুবিধা

স্কুল, কলেজ, ট্রাম ডিপো, রেল স্টেশন, বড় চওড়া রাস্তা, বাজার ও পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া প্রভৃতি সকল কিছুর সুবিধা), সে-ক্ষেত্রে বসবাসের ব্যবহারে নিযুক্ত হইলে জমির খাজনা অধিক হইবে। অন্য ব্যবহারে সেই স্থানকে নিয়োগ করিতে হইলেও অন্তত বসবাসের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইলে সেই জায়গা হইতে যে-খাজনা পাওয়া সম্ভব হইত, তাহা দিতেই হইবে।

2. ব্যবসায় সুবিধা (ক) বেশি দামে বিক্রয় (খ) বেশি পরিমাণে বিক্রয়

প্রধানত, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সেই অঞ্চল ব্যবহৃত হইলে উহার খাজনা নির্ভর করে সেখানে ব্যবসায়ের সুবিধা আছে তাহার উপর। যে-অঞ্চলে কেনা-কাটা করা একটু শৌখিনতা বা বিলাসের ব্যাপার অথবা লোকচক্ষে অধিকতর সম্মানজনক, সেই অঞ্চলের দোকানদারগণ একটু বেশি দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং, সেই অঞ্চলে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে জায়গার খাজনা একটু বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া, যদি কম দামে কিন্তু অধিক পরিমাণে বিক্রয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে, তাহা হইলেও সেই অঞ্চলের খাজনা অধিক হইবে।

গ্রাম ও শহরের খাজনা

গ্রামের তুলনায় শহরের জমির খাজনা অধিক হইবার কারণ হইল, শহরে, সকল ব্যবহারের জন্যই স্থানের চাহিদা বেশি এবং উহার তুলনায় যোগান কম। বাসগৃহ, দোকানঘর, অফিস পার্ক, রাস্তা, সকল উদ্দেশ্যেই জমি ব্যবহারের জন্য চাহিদা তীব্র থাকে। সুতরাং শহরের কোন জায়গার খাজনা নির্ভর করে অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার-কারিগণ উহার জন্য কি পরিবর্ত-দাম দিতে প্রস্তুত আছে তাহার উপর।

বাড়ির ভাড়া (Rent of Buildings)

বাড়ি ভাড়া নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর : (ক) যে-জমির উপর বাড়ি অবস্থিত তাহার খাজনা, ও (খ) নির্মিত গৃহের দরুন প্রদত্ত কিছু অর্থ বা সুদ।

বাড়ি তৈয়ারীর উপযোগী জমির খাজনা নির্ভর করে, প্রধানত, অবস্থানজনিত সুবিধার উপর। আর নির্মিত গৃহের জন্য মালিককে কি-পরিমাণ টাকা দিতে হইবে তাহা স্বল্পকালে প্রধানত বাড়ির চাহিদার উপর নির্ভরশীল, কারণ বাড়ির যোগান স্বল্পকালে বাড়ানো বা কমানো যায় না। দীর্ঘকালে অবশ্য ভাড়া এমনই হইবে যাহাতে বাড়ির জীবদ্দশায় উহার মোট উৎপাদন-ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা উঠিয়া আসিতে পারে।

খাজনার আধুনিক তত্ত্ব (The Modern Theory of Rent)

খাজনা কি ও উহা দেখা দেয় কেন (What is rent and why it arises)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিদের মতে, বিশেষত রিকার্ডোর মতে, খাজনা হইল জমি ব্যবহারের পারিশ্রমিক, উপাদান হিসাবে উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়ার দরুণ একমাত্র জমির মালিকই খাজনা পাইয়া থাকে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণের মতে শুধুমাত্র জমির ক্ষেত্রে নহে, অন্যান্য সকল উপাদানের পারিশ্রমিকের মধ্যেও খাজনার অংশ থাকিতে পারে। কোনো উপাদান যে-উদ্বৃত্ত আয় করে, তাহাকেই খাজনা বলা হয়।

প্রত্যেক উপাদানেরই যোগান দাম আছে। কোনো দামে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপাদানের যোগান হয়, সেই দামই ওই উপাদানের নিম্নতম যোগান-দাম, ওই দাম দিলে তবেই একমাত্র সেই পরিমাণ যোগান হইবে, দাম উহা হইতে কম দিলে সেই পরিমাণ যোগান আসিবে না।

যেমন, উদাহরণস্বরূপ, মজুরির হার 1 টাকা থাকিলে 50 জন শ্রমিকের যোগান হইতেছে, ইহা এই 50 জন শ্রমিকের যোগান-দাম। উহার কম হইলে কেহ কাজ করিবে না, উহা তাহাদের নিম্নতম দাবি। শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের মজুরি হইল 1·50 টাকা এবং এই দেড় টাকায় আরও 60 জন মজুর কাজ করিতে রাজি হইল, অর্থাৎ 1·50 টাকায় মজুরের মোট যোগান হইল 110 জন। প্রতিযোগিতার দরুণ সকল মজুরকে সমান হারে মজুরি দিতে হইবে, সকলেই 1·50 হারে মজুরি পাইবে। এই 101 জনের মধ্যে পূর্বের 50 জন 1 টাকাতেই কাজ করিতে রাজি ছিল, শ্রমিকের চাহিদা বাড়িবার ফলে তাহারা প্রত্যেকে পূর্বাপেক্ষা 50 পঃ করিয়া বেশি পাইতেছে। নিম্নতম যোগান-দাম হইতে তাহারা বাজারে দাম বেশি পাইতেছে ; সুতরাং পূর্বের 50 জনের মজুরির মধ্যে প্রত্যেকে যে 50পঃ করিয়া উদ্বৃত্ত লাভ করিতেছে—ইহাই খাজনা। যে নিম্নতম দাম দিলে তাহাদের কাজে নিযুক্ত রাখিতে পারা যায় উহা হইতে যে উদ্বৃত্ত আয় তাহারা পাইতেছে, তাহাকেই খাজনারূপে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ প্রকৃত আয়—নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়=খাজনা।

উপাদানের নিম্নতম যোগান-দামের তুলনায় প্রকৃত আয় যতটুকু বেশি সেই উদ্বৃত্তই খাজনা

যদি 1 টাকাতে শ্রমিকের যোগান সীমাবদ্ধ না হইত তাহা হইলে কিন্তু অধিক মজুরি দিবার প্রশ্ন উঠিত না। যেহেতু 1 টাকাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ (উপরোক্ত উদাহরণে 50 জন) শ্রমিকের যোগান হয় সেইজন্যই অধিক যোগান টানিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে দাম বাড়াইতে হয় এবং উদ্বৃত্ত আয়ের সৃষ্টি হয়। যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুনই এইরূপ খাজনার উদ্ভব হয়।

কোনো দামে উপাদানটির যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক নয় বলিয়াই খাজনার উদ্ভব হয়

নিম্নতম যোগান দামকে নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয় (Minimum necessary earnings) বলা চলে। যে আয় না হইতে উপাদানটির যোগান হইবে না তাহাকে নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয় বলা চলে। কোনো উপাদানকে বহু ব্যবহারে নিয়োগ করা যাইতে পারে। কোনো এক দিকে উহাকে নিয়োগ করিতে হইলে অন্যান্য দিকে সে যাহা পাইতে পারে অর্থাৎ অন্যান্য দিক হইতে তাহার যে সম্ভাব্য আয়, অন্তত সেইটুকু তাহাকে দিতে হইবে। তাহা না দিলে তাহাকে সেই দিকে নিয়োগ করা সম্ভব হইবে না, যে-দিকে অধিক আয় সেই দিকে নিয়োজিত হইবার জন্য চলিয়া যাইবে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়োগের ইহাই তাহার নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়। এই নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়কে পরিবর্ত-আয় (Transfer-earning) বা সুযোগ-আয় (Opportunity-earnings) বলা হয়। এই সুযোগ-আয়ের তুলনায় প্রকৃত-আয় (actual-earnings) যদি বেশি হয়, তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্তাংশকে খাজনা বলা চলে।

সুযোগ-আয় বা পরিবর্ত-আয়ের তুলনায় যতটুকু অধিক

কেবলমাত্র যোগানের সীমাবদ্ধতার ফলেই খাজনার উদ্ভব হয় তাহা নহে। যদি উপাদানটির যোগান সীমাবদ্ধ হয় তাহা হইলে অধিক ব্যবহার করিতে হইলে উহার দাম বাড়াইতে হইবে ; তাই প্রথম দিকে উহার দাম না বাড়াইয়া উহার পরিবর্তে অন্য উপাদান (যাহার যোগান তখনও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই) ব্যবহারের চেষ্টা চলিবে। দাম বাড়িবার উপক্রম হইলেই এইরূপে সেই উপাদানের পরিমাণ কমাইয়া অথবা স্থির রাখিয়া অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইবে। এইরূপে উপাদান-পরিবর্ততা (Factorial Substitution) শুরু হইবে। কিন্তু যদি এরূপ কোনো উপাদান থাকে যাহার যোগান সী[redacted] কাজ চলে না এবং উৎপাদন-কার্যে ওই উপাদান অবশ্য প্রয়োজনীয়, তখন বেশি দাম দিয়াও তাহাকে উৎপাদন-

উপাদানের বিশেষ-নির্দিষ্টতাই খাজনার উদ্ভবের কারণ, তাহা না হইলে "উদ্বৃত্ত" আয়ের সৃষ্টি হয় না

ক্ষেত্রে রাখিতে হইবে। এই সকল উপাদানকে বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদান (specific Factor) বলে; কোনো উৎপাদন-ক্ষেত্রে কোনো উপাদানের এই বিনির্দিষ্টতা (Specificity) বেশি, কোনো উৎপাদন-ক্ষেত্রে উহার বিনির্দিষ্টতা কম। যদি কোনো ফার্ম ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশি করে, তাহা হইলে সেই ফার্মের উদ্বৃত্ত আয়টুকু এই বিনির্দিষ্ট উপাদানের মালিক চাপ দিয়া আদায় করিয়া লইতে পারে। কৃষি ক্ষেত্রে তাই আমরা, বিশুদ্ধ খাজনার রূপ দেখিতে পাই। কৃষি উৎপাদনে জমি হইল বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদান; ইহাকে বাদ দিয়া বা ইহার পরিবর্তে অন্য উপাদানের দ্বারা শস্যোৎপাদন হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং জমির মালিক চাষীর নিকট হইতে সকল উদ্বৃত্তটুকুই খাজনা হিসাবে আদায় করিয়া লইতে পারে।

সকল উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা-ভাব: জমির খাজনাই ইহাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট রূপ (Rent-element in other factor-incomes: Rent of land is the leading species of a large genus)

রিকার্ডোর মতে "Rent is that portion of the product which is given to the landlord for the original and indestructible powers of the soil." তাঁহার মতে জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া এবং বিভিন্ন খণ্ড হইতে উর্বরতার পার্থক্য আছে বলিয়া খাজনার উদ্ভব হয়। এই খাজনা হইল উদ্বৃত্ত (surplus), জমির মালিকেরা উৎপাদনের কোনো কাজ না করিয়া এই উদ্বৃত্ত পাইয়া থাকেন।

মার্শাল এই খাজনা-তত্ত্বকে আর একটু অগ্রসর করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যে-সকল বৃহৎ মূলধনী যন্ত্রপাতির যোগান স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ, তাহাদের মালিকেরাও ওই দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলে বেশি আয় করিতে পারে। ওই যন্ত্রটি ব্যবহার না করিলে উৎপাদন হইবে না, স্বল্পকালে উহার যোগানও বাড়ান যাইতেছে না। এই অবস্থায় ওই মূলধনের মালিক চাপ দিয়া দামবৃদ্ধিজনিত বর্ধিত আয়ের সবটুকু আদায় করিয়া লইতে পারে। অবশ্য দীর্ঘকালে যন্ত্রটির যোগান বাড়ে, দ্রব্যের দাম কমে, বর্ধিত আয় আর থাকে না, এইরূপ প্রায়-খাজনা বা Quasi-Rent তাই একান্ত স্বল্পকালীন ব্যাপার। জমির যোগান দীর্ঘকালেও সীমাবদ্ধ, তাই উহার উদ্বৃত্ত আয় "প্রায়" নয় উহা পূর্ণ খাজনা।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে কেবল মাত্র জমির ক্ষেত্রে নয়, অথবা মূলধনের ক্ষেত্রে নয়, সকল উপাদানের আয়ের মধ্যেই এইরূপ উদ্বৃত্তাংশ বা খাজনা-ভাব (Rent element) থাকিতে পারে। যোগানের সীমাবদ্ধতা এবং পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত সকল উপাদানের ক্ষেত্রেই সম্ভব, সুতরাং তাহাদের আয়ের মধ্যে অনুরূপ উদ্বৃত্তকে খাজনা বলা চলে।

মজুরি, সুদ ও মুনাফার মধ্যে খাজনা-ভাব

মজুরির মধ্যে খাজনা-ভাব দেখা যায় কারণ সকল শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদন-ক্ষমতা সমান নহে। যাহারা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন, দক্ষ বা উৎপাদনক্ষম, তাহাদের মজুরি অধিক। প্রান্তিক শ্রমিকের মজুরির তুলনায় তাহারা যে অধিক মজুরি পাইয়া থাকেন তাহা পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত বলিয়া উহাকে খাজনা বলা চলে। এইরূপ উদ্বৃত্ত আয়কে অনেক সময় যোগ্যতার (খাজনা Rent of ability) বলা হয়।

সুদের মধ্যেও এইরূপ উদ্বৃত্তাংশ থাকিতে পারে। কোনো ব্যক্তির সঞ্চয় অধিক বলিয়া, মনে করা যাউক, সে শতকরা 2 টাকা হারে ধার দিতে রাজি আছে। ইহাই তাহার নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়, যাহা পাইলে সে অর্থ বিনিয়োগ করিবে। কিন্তু সমাজে 2 টাকা হারে ঋণে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ টাকার যোগান হইতেছে তাহা হইতে টাকার চাহিদা বেশি হওয়ায় সুদের হার বেশি থাকিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ধরা যাউক, বাজারে টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সুদের হার 5% হইল। যে ব্যক্তি 2% হারে ধার দিতে রাজি ছিল সেও 5% পাইবে; সুতরাং তাহার আয়ে 3% হারে উদ্বৃত্ত দেখা দিবে। নিম্নতম যোগান-দাম হইতে বাজার-দাম বেশি বলিয়া এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইতেছে। এইরূপে, সুদের মধ্যেও তাই খাজনা-ভাব থাকিতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উৎপাদনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে পরিচালন-যোগ্যতার তারতম্য আছে। কোনো উদ্যোক্তার পরিচালন-শক্তি এমনই যে সে কোনক্রমে স্বাভাবিক মুনাফাটুকু আয় (Normal Profit) করিতে পারিতেছে। তাহাকে প্রান্তিক উদ্যোক্তা বলে (Marginal enterpreneur.) এবং সেইরূপ যোগ্যতাকে প্রান্তিক যোগ্যতা (Marginal ability) বলা হয়। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ তাহার তুলনায় যে অধিকতর মুনাফা করিতে পারিতেছে তাহাদের সেই উদ্বৃত্তকে খাজনারূপে দেখা চলে। স্বাভাবিক পরিমাণ মুনাফা (Normal Profit) না পাইলে উদ্যোক্তাগণ সেই ব্যবসায়ে

থাকিবে না, সুতরাং সেই স্বাভাবিক পরিমাণ মুনাফাই তাহাদের নিম্নতম যোগান-দাম; ওই ব্যবসায় করিবার পক্ষে তাহাদের নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়। উহা হইতে যতটুকু অধিক মুনাফা তাহারা করিতে পারে (যোগ্যতা, হঠাৎ কোনো সুযোগ বা একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বারা), সেই উদ্বৃত্তকে খাজনা বলা চলে।

খাজনা ও দাম (Rent and Price)

রিকার্ডোর মতে প্রান্তিক জমিতে উৎপন্নের তুলনায় অন্যান্য জমিতে যে অধিক উৎপাদন হয় তাহাই খাজনা। শস্যের দাম উহার প্রান্তিক ব্যয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। এই প্রান্তিক জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম উহার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়, কোনো উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট থাকে না, সুতরাং কোনো খাজনার উদ্ভব হয় না। ব্যয় হইতে অধিক উৎপাদন হইলেই তাহাকে খাজনা বলে, সুতরাং এই খাজনা কখনই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। ব্যয় অনুযায়ী দাম ঠিক হয়, তাই খাজনা দামেরও অন্তর্ভুক্ত নহে। খাজনা বাড়িলে দাম বাড়ে বা খাজনা কমিলে দাম কমে, রিকার্ডোর তত্ত্বানুযায়ী একথা বলা চলে না।

রিকার্ডীয় মত : খাজনা দাম বহির্ভূত : দাম খাজনা-নির্ধারণকারী

বরং বলা যায় যে-শস্যের দাম বাড়িলে উদ্বৃত্ত শস্য বেশি মূল্যে বিক্রয় করা যায় সুতরাং উদ্বৃত্তের মোট মূল্য বৃদ্ধি পায়। শস্যের দাম কমিলে উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করিয়া মোট মূল্য কম পাওয়া যায়, তাই খাজনাও কমিয়া যায়। খাজনা দামকে স্থির করে না, দামই খাজনাকে স্থির করিয়া ফেলে। দাম যত বাড়িবে ততই অনুর্বর জমির চাষ শুরু হইবে, প্রান্তনিম্ন জমি প্রান্তোর্ধ্ব জমিতে পরিণত হইবে, চাষের প্রান্ত (Margin of cultivation) নীচে নামিয়া যাইবে। এইরূপ উর্বরতর জমিগুলির সহিত প্রান্তিক জমির উৎপাদনের পার্থক্য আরও প্রশস্ত হইতে থাকিবে; উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইবে এবং খাজনাও বাড়িবে।*

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের এই ধারণার কারণ হইল, তাঁহারা সমগ্র সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে খাজনাকে বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের বিচারে জমির কোনো নিম্নতম যোগান দাম থাকিতে পারে না। যদি কোনো খাজনা কাহাকেও দেওয়া না হয় তাহা হইলে জমির যোগান একেবারে থাকিবে না,

* উর্বরতর জমির গড় ব্যয় কম, দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অনুর্বর জমি চাষ হওয়ায় উহাদের প্রান্তিক ব্যয় ক্রমেই বাড়িতে থাকে। উর্বরতর জমির গড় ব্যয় যত বাড়িবে খাজনা তত বৃদ্ধি পাইবে।

তাহা নহে। সুতরাং জমির জন্য কোনো আসল ব্যয় নাই। শ্রমিকের মজুরি না দিলে শ্রমের যোগান বন্ধ হইয়া যাইবে; সুদ না দিলে মূলধনের যোগান বন্ধ হইবে, মুনাফা না দিলে কেহ ব্যবসায়ে নামিবে না। কিন্তু খাজনা ব্যয়ের উর্ধ্বে, উহা না দিলেও জমির যোগান থাকিবে। উহা তাই উৎপাদকের উদ্বৃত্ত, শস্যের দামকে ইহা প্রভাবিত করিতে পারে না।

ক্লাসিকাল ধারণা

এই সমস্যাটিকে দুই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ক্লাসিকাল এই ধারণা ঠিক নহে। খাজনা ব্যয়েরই অংশ তাই ইহা দামকে প্রভাবিত করে। প্রথমত, কোনো ব্যবসায়ী বা কোনো ফার্মের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, সে তাহার মোট ব্যয়ের মধ্যে খাজনাকে হিসাব করিয়া লয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারণের সময়ে মোট ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে খাজনাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। দ্রব্যটি তৈয়ার হইতে হইলে কাঁচামালের জন্য ব্যয়ের ন্যায় ঐ খাজনার দরকার না-ও হইতে পারে বটে, কিন্তু দাম-নির্ধারণের সময়ে উৎপাদক ঐ খাজনাকে মোট ব্যয়ের মধ্যে হিসাব করিয়াই দাম স্থির করে। খাজনা বেশি হইলে অধিক দাম স্থির করিতে হয়, খাজনা কম হইলে সে কম দামে বেচিতে পারে। তাহার মোট রেভিনিউ যদি মোট ব্যয়ের (অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয়+খাজনা) সমান না হয়, তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া সে ব্যবসায় চালাইতে পারিবে না, অন্য ব্যবসায়ে চলিয়া যাইবে।

রিকার্ডীয় মতের সমালোচনা—১। ফার্মের দিক হইতে বিচার করিলে

দ্বিতীয়ত, কোনো বিশেষ শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলেও খাজনাকে ব্যয় হিসাবে গণ্য করা উচিত। জমির বিভিন্ন ব্যবহার আছে, বিভিন্ন দ্রব্যোৎপাদনে ইহাকে নিয়োগ করা চলে। চা-উৎপাদনে নিয়োগ করিলে সেই জমিতে গম উৎপাদন হয় না, ধান্যোৎপাদনে নিয়োগ করিলে সেখানে মাছের চাষ বাদ দিতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন দ্রব্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যে জমির চাহিদা হয়। কোনো এক ব্যবহারে নিযুক্ত হইতে হইলে উহাকে কি দাম দিতে হইবে তাহা নির্ভর করে ওই জমি অন্য ব্যবহারে নিযুক্ত হইলে কি দাম দিতে হইত, তাহার উপর। চা উৎপাদনে জমি খাটাইলে কি-খাজনা হইবে, তাহা নির্ভর করে ওই জমির জন্য গম, ধান, ইক্ষু প্রভৃতি অপরাপর উৎপাদনকারিগণ কি খাজনা দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার উপর। জমির এই পরিবর্ত-দাম বা সুযোগ-দাম (Transfer-Price or Opportunity-Price) সমগ্র শিল্পের দিক হইতে বিচার করিলে

২। শিল্পের দিক হইতে বিচার করিলে

নিশ্চয় ব্যয়ের মধ্যে গণ্য হয়। যদি সুযোগ-দাম বৃদ্ধি পায় (অপর কোনো ব্যবহারকারী বেশি দাম দিতে রাজি হয়) তাহা হইলে, সকল দিকে নিয়োগের ক্ষেত্রেই উহার খাজনা বৃদ্ধি পাইবে, কারণ জমির মালিক সেই বর্ধিত খাজনার কমে কাহাকেও জমি ব্যবহারের সুবিধা দিবে না। এইরূপ খাজনা বৃদ্ধি পাইলে জমি হইতে উৎপন্ন সকল দ্রব্যের দামই বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং খাজনা দামের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

অর্থ নৈতিক প্রগতি ও খাজনা (Economic Progress and Rent)

রিকার্ডোর মতে ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের দরুন জমির মালিককে যাহা দেওয়া হয় তাহাই খাজনা। সুতরাং, চাষী যদি নিজে মূলধন খরচ করিয়া ভূমির উর্বরতা বা উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইয়া তোলে তাহা হইলে ইহার দরুণ বর্ধিত উৎপাদন খাজনার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কারণ, সেই বৃদ্ধি ভূমির আদি শক্তির দরুন নহে। সেই বর্ধিত উৎপন্নকে ভূমিতে নিযুক্ত মূলধনের সুদ হিসাবে দেখা উচিত, উহাকে খাজনা বলা চলে না।

কিন্তু যদি কোন অর্থনৈতিক উন্নতি সাধারণভাবে সকল জমির উপর এরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করে, যাহার উদ্বৃত্তের মূল্য বা মোট ব্যয় প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে সেই অর্থ নৈতিক উন্নতি নিশ্চয়ই খাজনার পরিমাণে পরিবর্তন আনিবে। অর্থ নৈতিক প্রগতি বলিলে আমরা বহুপ্রকার উন্নতি বুঝিতে পারি ; বিভিন্ন ধরনের উন্নতি খাজনার উপরে বিভিন্ন উপায়ে ও পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে।

যদি নূতন যন্ত্রপাতি, নূতন সার বা নূতন উপাদান-কৌশলের (Technique of Production) প্রবর্তন হয়, তাহা হইলে খাজনার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব।

1. চাষের উন্নত পদ্ধতি, নূতন যন্ত্রপাতি, সার, বা নূতন কৌশল

(ক) যদি সকল স্তরের জমির উপর ইহার প্রভাব সমান হয়, তাহা হইলে সকল জমির উৎপাদন-ক্ষমতাই বাড়িয়া যাইবে, মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। শস্যের চাহিদা সমান থাকায় উহার দাম কমিবে। ফলে প্রান্তিক জমিতে উৎপন্ন শস্যের মোট দাম উহার মোট ব্যয় হইতে কম হইবে, সুতরাং উহারা প্রান্তনিম্ন জমিতে পরিণত হইবে। চাষের প্রান্ত উপরে উঠিবে, প্রান্তোর্ধ্ব জমিগুলির খাজনার পরিমাণ কমিয়া যাইবে, কেহ কেহ প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে, কোন উদ্বৃত্ত থাকিবে না। (খ) যদি এই উন্নতি কেবলমাত্র উন্নত স্তরের জমিকে আরও উন্নত করিয়া তোলে, তাহা হইলে শস্যের চাহিদা সমান

থাকিলে, তাহাদের উদ্বৃত্ত অধিকতর হইয়া খাজনা বৃদ্ধি পাইবে। (গ) যদি এই উন্নতি কেবলমাত্র অনুর্বর জমিকে আরও উন্নত করিয়া তোলে তাহা হইলে চাষের প্রান্ত উপরে উঠিবে, উন্নত স্তরের জমির খাজনা কমিয়া যাইবে।

অর্থনৈতিক উন্নতি যদি উন্নত ধরনের পরিবহন-ব্যবস্থার রূপ ধারণ করিয়া আসে অর্থাৎ যদি পরিবহন-ব্যয় কমিয়া যায়, তাহা হইলে দূরে অবস্থিত জমির তুলনায় বাজারের নিকটে উপস্থিত জমিগুলির পার্থক্য-জনিত সুবিধা কমিয়া যাইবে। যদি আন্তর্জাতিক পরিবহন-ব্যয় কমিয়া যায়, তাহা হইলে বিদেশ হইতে শস্য আমদানি হইতে পারে। এমতাবস্থায় আমদানিকারী দেশে চাষের প্রান্ত উঠিবে এবং খাজনার হার কমিয়া যাইবে। রপ্তানিকারী দেশে চাষের প্রান্ত নামিয়া যাইবে, অনুর্বর জমিগুলিতে চাষ শুরু হইবে, খাজনার হার বাড়িয়া যাইবে।

2. আভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যয় বা আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যয় হ্রাসের ফল

দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শস্যের দাম বাড়িবে এবং খাজনা বাড়িয়া যাইবে। প্রান্তিক জমিগুলি প্রান্তোর্ধ্ব জমিতে পরিণত হইবে, অনুর্বর জমিগুলিতে চাষ করা শুরু হইবে, চাষের প্রান্ত নামিয়া যাইবে। প্রগাঢ়-চাষের ফলে আরও দ্রুত ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের কার্যকারিতা দেখা দিবে। কৃষি উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় বাড়িয়া যাইবে।

3. জনসংখ্যা বৃদ্ধি

দেশে আয়ের স্তর ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইলে খাজনার উপর উহার কিরূপ প্রভাব বাড়িবে? আয় বৃদ্ধি হইলে লোকে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য ক্রয় করে না; বিলাসদ্রব্য বা শৌখিন দ্রব্যের ক্রয় সাধারণত বাড়িয়া যায়। সুতরাং, শস্যের চাহিদা খুব বাড়ে না, দামও খুব বৃদ্ধি হয় না, খাজনাও বিশেষ বাড়ে না। এইজন্যই মজুরি, সুদ ও মুনাফার ন্যায় জমিদারের খাজনার হার খুব বেশি বৃদ্ধি পায় না।

4. আয়স্তর ও জীবনযাত্রার মানে বৃদ্ধির ফল

দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক প্রগতি খাজনাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। একটি প্রভাব অপরটিকে খণ্ডন করিতে পারে। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন দেশে খাজনা বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিল, কিন্তু পরিবর্তন ব্যবস্থায় উন্নতির ফলে খাজনা কমিবার ঝোঁক আসিয়া পড়িল। উভয়ের মিলিত ফলে খাজনাতে কোনরূপ পরিবর্তন আসিল না, এইরূপও ঘটিতে পারে। খাজনার উপর অর্থনৈতিক প্রগতির

মোট প্রভাব

দীর্ঘকালীন প্রভাবের ফল তাই পূর্ব হইতে সম্পূর্ণ সঠিক পরিমাণে পরিমাপ করা যায় না।

অনুশীলনী

1, Explain fully the factors which lead to the emergence of rent in the case of agricultural land. (C. U. B. Com. 1951)

2. How does the rent of land arise ? Will there be any rent if all plots of land were equally fertile and equally favourably situated ? (C. U. B. Com. '55)

3. What is rent ? Explain the relation between Rent and Economic progress. (C.U. B. A. '55)

4. Examine the validity of the statement that the rent of land dces not enter into price, but is itself governed by price. (C. U. B. Com 1953)

5. Explain how the economic rent of land is determined. Discuss the relation between rent and the price of agricultural products. (C. U. B. Com. 1956, B. A. '59)

(C. U. B. Com. , 1957

6. State the theory of rent and discuss whether there is any 'rent element' in Wages, Interest and Profits. (C. U. B. Com. 1957)

7. What is the difference between Rent & Quasi-rent ? How are Rent & Quasi-rent related to the inelasticity of supply of a factor ? (C. U. B. Com. 1957)

8. "The rent of land is seen not as a thing by itself but as a leading species of a large genus." Amplify. (C. U. B. Com. '42, '44, '58, '59)

9. Analyse the effects of increase of population on (a) Wages and (b) Rent.

10. Discuss the Social implications of the theory of Rent. (C. U. B. Com. '41, '45, '50)

11. Explain. giving reasons. the effect on the rent of (i) an improvement in transport : (ii) an increase in Population , (iii) Improvements in methods of cultivation : (iv) economic progress in general. (C. U. B. A. 1957)

12. State the theory of rent and discuss where there is and 'rent element' is Wages, Interest and Profit. (C. U. B. Com. , 1957)

13. Do you agree with the view with that the rent of land does not enter into the price of crops ?

14. Comment on the statement that the rent of land does not enter into the price of the produce.

15. Define "rent". Is it correct to say that rent does not enter into price ?

16. Explain how the economic rent of land is determined. Would rent exist; if all lands were equally fertile ?
enter into cost of production ?

17. Examine the view that rent does not enter into price but is itself governed by price.

15

মজুরি

Wages

আসল মজুরি ও আর্থিক মজুরি (Real wages and Money wages)

উৎপাদন কার্যে সহায়তার দরুণ পারিশ্রমিক হিসাবে শ্রমিক যাহা পাইয়া থাকে, তাহাকে মজুরি বলে। মজুরিকে দুইভাবে দেখা চলে। নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের দরুন উদ্যোক্তা শ্রমিককে পারিশ্রমিক হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ দেয় তাহাকে আর্থিক মজুরি বলা হয়। ঐ কার্যের ফলে শ্রমিক যে-পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী, সুযোগ-সুবিধা ও আরাম পাইয়া থাকে, তাহাকে আসল মজুরি বলে।

আসল মজুরি কিসের উপর নির্ভর করে

আসল মজুরি নির্ভর করে বহু বিষয়ের উপর। প্রথমত, আর্থিক মজুরি বেশি হইলে দ্রব্যসামগ্রী অধিক ক্রয় করা সম্ভব এবং আর্থিক মজুরি কম হইলে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের সামর্থ্যও কম। সুতরাং আসল মজুরি প্রধানত আর্থিক মজুরির উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, মজুরি হিসাবে যে অর্থ শ্রমিক লাভ করে, তাহার বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী সে ক্রয় করিতে পারিবে, তাহা স্থির হয় অর্থের ক্রয়ক্ষমতার দ্বারা। যদি অর্থের ক্রয়ক্ষমতা (Purchasing Power of Money) অধিক হয় (অর্থাৎ দামস্তর কম হইলে) তাহা হইলে তাহার আসল মজুরি বেশি। যদি অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কম হয় (অর্থাৎ দামস্তর বেশি থাকিলে), মজুরি ছাড়া তাহার আসল মজুরি কম। তৃতীয়ত, উহা নির্ভর করে মজুরি ছাড়াও কিছু বহুপ্রকার সুবিধা ও অসুবিধার উপর। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি ছাড়াও কিছু দ্রব্য-সামগ্রী শ্রমিককে দেওয়া হয় (প্রধানত, কৃষি মজুরির ক্ষেত্রে), ইহাকে আসল মজুরি হিসাবে গণ্য করা হইবে। অনেকক্ষেত্রে কার্যকালের শেষে অবসর-বৃত্তি পাইবার সুবিধা আছে, অনেক ক্ষেত্রে তাহা নাই। অনেক চাকরিতে বেশিক্ষণ কাজ করিতে হয়, অন্য ক্ষেত্রে অল্পক্ষণ কাজ করিবার সুবিধা আছে। বহুকার্যে জীবনীশক্তির দ্রুত হ্রাস হয়, সমাজের চক্ষে বহু কার্য হেয় বলিয়া পরিচিত থাকে, এই সকল অসুবিধাও আসল-মজুরির

হিসাবের মধ্যে ধরিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয়ের সুবিধা থাকে (যেমন হোটেলের পরিচারক বক্‌শিস্ পায়), অনেক ক্ষেত্রে চাকরি বজায় রাখিবার জন্য মনিবকে নিয়মিত নজরাণা দিতে হয়। অনেক চাকরিতে সারা বৎসর কাজ থাকে না, কয়েক মাস কর্মবিহীন অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হয় (যেমন চিনির কল), আবার অনেক চাকরিতে সারা বৎসরই কাজ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মধ্যে উপরি-সময় (overtime) হইতে অধিক আয় হয়। কোন চাকরিতে মাহিনা কম, কিন্তু ঘুষের সম্ভাবন বেশি। এই সকল সুযোগ ও সুবিধা-অসুবিধা সকল বিচার করিয়া শ্রমিক আসল মজুরি বিচার করিতে হয়। মনে রাখা দরকার যে, শ্রমিকের প্রকৃত জীবনযাত্রার মান কেবলমাত্র তাহার আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না, এই সকল আনুষঙ্গিক সুবিধা অসুবিধা মিলিয়া তাহার আসল আয় স্থির হয়। উহারই উপর জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে।

শ্রমিকের চাহিদা ও যোগান (The demand and supply of Labour)

জাতীয় আয়ের সর্বাধিক অংশ মজুরি, মাহিনা বা বেতনের রূপ অসংখ্য ব্যক্তির হাতে পৌছায়। উপাদান-সম্মিলনে শ্রমশক্তি যে-কাজ করে তাহার মূল্যস্বরূপ ফার্মেরা এই মজুরি দেয়। ব্যক্তির দিক হইতে তাকাইলে মজুরি হইল আয়, আর ফার্মের দিক হইতে তাকাইলে ইহা হইল ব্যয়। দেশ যত শিল্পোন্নত থাকে ততই জাতীয় আয়ের মধ্যে মজুরির অংশ বেশি, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আয়ের মধ্যে 65% অংশই মজুরি হইতে আসে। উপরন্তু, স্বাধীন ব্যবসায়, যেমন ছোট দোকানদার, ছোট চাষী প্রভৃতির আয়কেও অপ্রকাশ্য মজুরি (implicit wages) মনে করা চলে, কারণ তাহারা অন্য কোনো কর্মচারী না রাখিয়া নিজেরা শ্রমিকের ন্যায় পরিশ্রম করিয়াই ঐ মুনাফা আয় করে, প্রকৃতপক্ষে উহা মজুরি।

মজুরির হার কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা আসলে উপাদানের দাম নিরূপণের সাধারণ তত্ত্বকে শ্রমিকের বাজারে প্রয়োগ করা মাত্র। অবশ্য শ্রমিকের বাজারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ এই শ্রম বিক্রয় করে এবং উহার বিনিময়ে সে যে টাকা পায় তাহাই তাহার আয়, তাহার ভোগ ও সঞ্চয়, জীবনযাত্রার মান সকল কিছু নির্ধারণ করে। শ্রমিক নিজেকে বিক্রয় করে না, সে তাহার শ্রমশক্তিকে কয়েক ঘণ্টা মালিকের অধীনে

ব্যবহৃত হইতে দিয়া উহার বিনিময়ে মজুরি পায়। কোনো ফার্মও শ্রমিককে কিনিতে পারে না, তাহার শ্রমশক্তিকে কয়েকঘণ্টার জন্য কিনিয়া লয়। এই উপাদানের যোগান দেয় ব্যক্তি বা মানুষ, তাই তাহার পছন্দ অপছন্দ শ্রম-শক্তির যোগান রেখার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। যাহারা শ্রম-শক্তির যোগান দেয়, তাহারা চিন্তাশক্তিসম্পন্ন বা স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ বলিয়া শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে মজুরি আরও অনেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, শ্রমিকের মনে কত ঘণ্টা কাজ করার ইচ্ছা, কত ঘণ্টা বিশ্রামের ইচ্ছা তাহার আয়ের স্থায়িত্ব (security) কতটা, কলকারখানার পরিবেশ কিরূপ, ছুটি, বার্ধক্য ভাতা, বীমা ব্যবস্থা কি ধরনের—এই সমস্ত কিছু শ্রমিকের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। সর্বশেষে মনে রাখা দরকার যে শ্রমশক্তির যোগান দেয় শ্রমজীবী জনসাধারণ, ইহা নির্ভর করে দেশের জনসংখ্যার উপর। এই জনসংখ্যা কোনো অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্টি হয় না, পরিবারেরা ভবিষ্যতে টাকা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বালক-বালিকাদের লালন-পালন করে না। জনসংখ্যা ও শ্রমিকের যোগানের ধরন প্রধানত নির্ভর করে মজুরি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের উপর ; মজুরির হার এবং জনসংখ্যার যোগান—এই দুই-এর মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শ্রমিকের জন্য চাহিদা (The Demand for Labour)

কোনো ফার্মে এক বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদা নির্ভর করে সেই ধরণের শ্রমিকের MRP রেখার উপরে। ফার্মের তত্ত্বে আমরা ধরিয়া লই উহা মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করিতেছে। মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে, নির্দিষ্ট মজুরের স্তরে, কোনো ফার্ম এমন পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিবে যাহাতে শ্রমিকের MRP উহার জন্য ফার্মের প্রান্তিক খরচার সমান হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শ্রমিকের যে মজুরির হার চালু থাকে ফার্ম তাহা মানিয়া লইয়া শ্রমিক ক্রয় করে, অর্থাৎ সে বেশি বা কম শ্রমিক ক্রয় করিলে মজুরির হার প্রভাবিত হয় না, তাই ফার্মটি শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ক্রয় করে যেখানে সর্বশেষ শ্রমিকের MRP চল্‌তি মজুরির হারের সমান হয়। এইরূপ সকল ফার্মের চাহিদা যোগ করিয়া আমরা একটি বাজার চাহিদা রেখা পাই। এই রেখার স্থিতিস্থাপকতা, অর্থাৎ কোনো বিশেষ ধরণের শ্রমিকের জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োজিত হওয়ার সময়ে MRP কমিয়া আসার হারের

একটি ফার্মের চাহিদ নির্ভর করে শ্রমিকের MRP-র উপরে

উপর। MRP কত দ্রুত হ্রাস পাইবে অর্থাৎ উহা হ্রাস পাইবার হার প্রধানত নির্ভর করে: (i) উৎপাদনের টেক্‌নিকাল অবস্থার উপরে. (ii) অন্যান্য উপাদানের পরিবর্তে শ্রমের ব্যবহারের সম্ভাবনার উপরে, এবং, (iii) উৎপন্ন দ্রব্যটির জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপরে। উৎপাদনের টেক্‌নিকাল অবস্থা যদি এমন থাকে যে সর্বোত্তম উপাদান-সম্মিলন বজায় আছে তাহা হইলে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করায় মোট উৎপন্ন খুব কমই বাড়ে, ফলে MRP দ্রুতবেগে নামিয়া আসে এবং শ্রমিকের জন্য চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক হয়। সাধারণত এইরূপ সম্ভাবনা স্বল্পকালে খুব বেশি থাকে। স্বল্পকালে মূলধনী যন্ত্রপাতি এমন মাত্রায় সংগঠিত থাকে যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক লইয়া উহার দ্বারা দক্ষতম উৎপাদন সম্ভবপর, সেই সংখ্যার বেশি শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপন্ন ততটা বাড়ে না।

শ্রমের জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে MRP-র গতির উপর

কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিলে দেখা যায় যে MRP অত্যন্ত দ্রুত নামিতেছে, অর্থাৎ আর শ্রমিক নিয়োগের দরকার নাই। ইহার একটি কারণ হইল ফার্মের উৎপন্নের চাহিদা রেখাটি কোথাও দোমড়ানো বা মোচ্‌ড়ানো থাকিতে (kinked) পারে। অর্থাৎ উৎপাদনের অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম অনেক কমাইবার প্রয়োজন হইতে পারে। অনেক সময়ে ফার্ম শ্রমিকের MRP সম্বন্ধে সচেতন থাকে না, অর্থাৎ আর একজন শ্রমিক নিয়োগ করা চলে কি চলে না সে বিষয়ে চিন্তা করে না। তখনও শ্রমিকের জন্য চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা কম হইবে। এই সকল অবস্থার গুরুত্ব মানিয়া লইলে, অর্থাৎ (i) অল্পকাল বা কিছুদূর উৎপাদনের পরে MRP কমিয়া যাওয়া, (ii) স্বল্পকালে অন্যান্য উৎপাদনের পরিবর্তে শ্রমের অধিক ব্যবহার সম্ভব না হওয়া, (iii) দ্রব্যের চাহিদা রেখা মোচ্‌ড়ানো থাকা, (iv) শ্রমের MRP সম্বন্ধে মালিকের জ্ঞান না থাকা—বলা যায় যে স্বল্পকালে কোনো বিশেষ ধরণের শ্রমিকের জন্য চাহিদা রেখা সাধারণভাবে অস্থিতিস্থাপক।

স্বল্পকালে MRP-র গতি

দীর্ঘকালে অবশ্য শ্রমিকের জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হইবে, কারণ উপাদানের পরিবর্তা অনেক বেশি. মূলধনের বদলে শ্রমিক এবং শ্রমিকের বদলে মূলধন সহজেই নিয়োগ করা চলে। ব্যবহৃত মূলধনী

দ্রব্যের ধারণ ও পরিমাণ উভয়ই বদলানো সম্ভব। মূলধনের পরিমাণ বাড়ানো যায় না বলিয়া স্বল্পকালে MRP দ্রুত কমে। কিন্তু দীর্ঘকালে মূলধনের পরিমাণ বাড়ানো যায় বলিয়া MRP দ্রুত হ্রাস পায় না।

দীর্ঘকালে MRP-র গতি

শ্রমিকের যোগান (The supply of Labour)

অন্যান্য সকল দ্রব্য এবং উৎপাদনের যোগানের তুলনায় শ্রমিকের যোগান অনেক পৃথক। ইহার কারণ শ্রমিক আর এক ঘণ্টা বেশি তাহার শ্রমশক্তি বিক্রয় করিবে কি করিবে না তাহা নির্ভর করে তাহার ব্যক্তিগত পছন্দের উপর, কাজ ও বিশ্রামের মধ্যে তাহার নির্বাচন ও বাছাইয়ের উপর। চিরাচরিত প্রথা, সংস্কার, অভ্যাস, পারিবারিক রীতিনীতি প্রভৃতি শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্য দ্রব্যের যোগানের ক্ষেত্রে নহে। উপরন্তু, ভবিষ্যতে শ্রমের সম্ভাব্য যোগান নির্ভর করে জনসংখ্যার পরিমাণ, সেই জনসংখ্যার বয়স অনুযায়ী বণ্টন প্রভৃতির উপর। আর ওই সকল বিষয় নির্ধারিত হয় প্রধানত অর্থনীতির বাহিরে অবস্থিত নানা শক্তির উপর।

শ্রমিকের যোগান বিশ্লেষণের নানা সমস্যা

শ্রমিকের যোগান বিশ্লেষণে আরও নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। শ্রমিকের কাজ আমরা কোন্ ইউনিট ধরিয়া হিসাব করিব? শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, অথবা সংখ্যা সমান রহিল, কিন্তু প্রত্যেকে পূর্বাপেক্ষা বেশি ঘণ্টা কাজ করিলে, অথবা একই সময়ের মধ্যে অনেকটা কাজের বেগ বাড়াইয়া দিল অথবা শ্রমিকদের দক্ষতা ও নৈপুণ্য বাড়িয়া গেল—ইহাদের যে কোনো একটির ফলে শ্রমের যোগান বাড়িয়া গেল এইরূপ বলা চলে। আলোচনার সুবিধার জন্য শ্রমের যোগান বলিলে শ্রমের ঘণ্টা ধরিয়া লইব।

স্বল্পকালে কোনো বিশেষ ধরণের শ্রমের যোগান তালিকা নির্ভর করে সমাজে ঐ কাজের জন্য দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের সংখ্যা, পরিবত অন্যান্য চাকুরিতে কিরূপ মজুরি বা আনুষঙ্গিক সুবিধা পাওয়া যায়, পরিবর্ত চাকুরির সম্ভাবনা, শ্রমিকেরা কত ঘণ্টা কাজ করিতে চায় এবং বিভিন্ন মজুরির স্তরে কি পরিমাণ শ্রমিক শ্রমের বাজারে প্রবেশ করে বা পরিত্যাগ করে, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের উপর। যদি বেকার শ্রমিক না থাকে তাহা হইলে শ্রমিকের যোগান অধিক পাইতে হইলে তাহাকে বিকল্প জীবিকা হইতে

দুইটি প্রধান শক্তি : 1. জীবিকার পরিবর্তন বা চলনশীলতা

আকৃষ্ট করিয়া টানিয়া আনিতে হয়। বর্তমানের অলস ব্যক্তিদের শ্রমের বাজারে টানিয়া আনিতে হয়, অথবা বর্তমান শ্রমিকদের বেশি ঘণ্টা কাজ করিতে প্ররোচিত করিতে হয়। একে একে ইহাদের আলোচনা করা যাউক।

বিকল্প জীবিকা হইতে শ্রমিকদের আকৃষ্ট করার একমাত্র উপায় হইল বেশি মজুরি দেওয়া। অর্থাৎ যাহারা বিকল্প জীবিকাতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক এইরূপ শ্রমিকের যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী ঢালু। বেশি মজুরিতে এই শিল্পে বেশি শ্রমিকের যোগান হইতেছে। শ্রমিকের যোগান রেখার ঢাল কিরূপ হইবে, অর্থাৎ উহার স্থিতিস্থাপকতা তিনটি প্রাথমিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (i) এই শিল্পে যে দক্ষতা বা নৈপুণ্যের প্রয়োজন তাহা কত তাড়াতাড়ি বিকল্প জীবিকাতে নিয়োজিত শ্রমিকেরা অর্জন করিতে পারে ; (ii) মাহিনা বহির্ভূত চাকুরির নানা সুবিধার উপরে, যেমন সম্মান, চাকুরির স্থায়িত্ব, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতি। বিশেষ করিয়া বার্ধক্য ভাতার জন্য শ্রমিকেরা সাধারণ একটি চাকুরি ছাড়িয়া অপর চাকুরিতে যাইতে পারে না। (iii) এই চাকুরি হইতে অন্য চাকুরিতে সরিয়া আসার আনুষঙ্গিক ব্যয়ের দরুণ শ্রমিকেরা অনেক সময়ে বিকল্প জীবিকাতে যাইতে চাহে না। কোনো কাজে বিশেষ ধরণের ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে এইরূপ শ্রমিকের যোগান অনেক সময়ে খুবই অস্থিতিস্থাপক, কারণ সেই ধরণের দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি অন্য কোনো জীবিকাতে আছে তাহা মনে করা চলে না। আবার বিপরীতপক্ষে, কম নৈপুণ্যধারী শ্রমিকের যোগান সাধারণ ভাবে খুবই স্থিতিস্থাপক।

স্বল্পকালের তুলনায় কোনো একটি বিশেষ জীবিকাতে শ্রমিকের যোগান দীর্ঘকালে অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক, কারণ বিভিন্ন চাকুরির মধ্যে যাতায়াতের সম্ভাবনা দীর্ঘকালে প্রবলতর। কোনো বিশেষ জীবিকাতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া উচ্চ মজুরি চলিতে থাকিলে অধিক সংখ্যক লোক সেই শিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিতে সচেষ্ট হইবে।

শিক্ষানবিশীর কাল স্বল্প হইলে এই যোগান রেখা স্থিতিস্থাপক। ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ হইল যোগান রেখা অস্থিতিস্থাপক। কোনো বিশেষ ধরণের শ্রমিকের যোগান রেখা কেবলমাত্র বিকল্প জীবিকার শ্রমিকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে তাহা নহে। মজুরি বাড়িলে সেই শিল্পে নিযুক্ত বর্তমান শ্রমিকের সংখ্যা এবং তাহারা কত ঘণ্টা কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাহার উপরও নির্ভর করে। মজুরি বাড়িলে শ্রমিক যোগান বাড়াইবে কি না তাহা বলা খুব শক্ত, কারণ ব্যক্তির মনে শ্রম ও বিশ্রাম সম্পর্কে কতরকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহা বর্ণনা খুব দুষ্কর।

2. শ্রম ও বিশ্রামের অনুপাত

প্রথমে মনে হইতে পারে মজুরি বাড়িলে শ্রমের যোগান বাড়িবে। কারণ মজুরি বেশি দিলে অতিরিক্ত কাজের অনুপযোগিতা দূর হইবে এবং প্রান্তিক শ্রমিকদের শ্রমের বাজারে টানিয়া আনা সম্ভব হইবে। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের যোগান হইতে শ্রমের যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। শ্রম ও বিশ্রাম—শ্রমিক ইহাদের মধ্যে বাছাই করিবে ঠিকই. কিন্তু বিশ্রাম উপযোগ করা নির্ভর করে শ্রম করিয়া সে কি আয় করিতে পারিল তাহার উপর। মজুরি বৃদ্ধির দুইটি বিপরীত প্রভাব, শ্রমের যোগানের উপর তাহার দুইটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া —পরিবর্ত-প্রভাব এবং আয়-প্রভাব। একদিকে মজুরি বাড়িলে কাজ না করায় তাহার ক্ষতি বেশি, ফলে সে কাজের পরিমাণ বাড়াইয়া আয় বাড়াইতে চেষ্টা করে। ইহাই পরিবর্ত-প্রভাব। কিন্তু আবার অপর দিকে বর্ধিত মজুরির দরুণ সে কম সময়ে সমান পরিমাণ আয় পাইয়া বিশ্রামের সময় বাড়াইতে পারে। ইহাই আয়-প্রভাব। এই দুই প্রভাবের মিলিত ফল কি হইবে তাহা বলা শক্ত। যদি ব্যক্তির টাকার জন্য চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় অর্থাৎ তাহার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার খুব বেশি ইচ্ছা থাকে, তবে আয়প্রভাব ছাপাইয়া পরিবর্ত-প্রভাব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং ফলে মজুরি বাড়িলে সে বেশি ঘণ্টা কাজ করিবে। আবার আয়ের জন্য চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, অর্থাৎ শ্রমিক যদি প্রধানত একটি নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মান রক্ষা করিয়া চলিতে ইচ্ছুক থাকে এবং জীবনযাত্রার মানকে উন্নততর করিতে ততটা উৎসুক না থাকে তাহা হইলে মজুরি বাড়িলে বেশি কাজ না করিয়া সে কম কাজ করিবে। ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গী চিরাচরিত প্রথা রীতিনীতি সবকিছু মিলিয়া মোট ফলাফল দেখা দিবে। যে সমাজের জীবনযাত্রার চলতি স্তর কোনো মতে বজায় রাখাই প্রধান লক্ষ্য এবং জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করার ব্যাপারে লোকে ততটা গুরুত্ব দেয় না সেখানে মজুরি বাড়াইলে শ্রমের ঘণ্টা কমিয়া যাইতে পারে। আবার যে সমাজের লক্ষ্য হইল জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত বাড়ানো, সেখানে মজুরি বাড়াইলে শ্রমের যোগান বাড়িতে পারে।

শ্রম-বিশ্রামের অনুপাতে বিপরীত ফল দেখা দিতে পারে

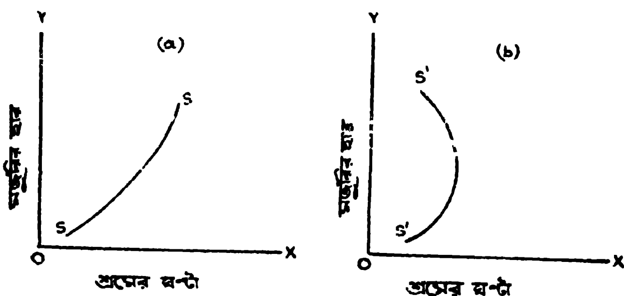
উপরের এই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে ব্যক্তির আচরণের হিসাবে, কোনো একজন শ্রমিক কত ঘণ্টা শ্রম যোগদান দিতে ইচ্ছুক সেই ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের উপর। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় সমাজে কি সংখ্যক প্রান্তিক শ্রমিক থাকেন। চলতি মজুরির হার একটু বাড়াইলেই শ্রমের যোগান বাড়ে। মজুরি বাড়াইলে

এই সকল প্রান্তিক শ্রমিকেরা শ্রমের বাজারে প্রবেশ করিবে। আবার বিপরীতপক্ষে পরিবারের প্রধান জীবিকা অর্জনকারী ব্যক্তি মজুরি বাড়িলে ঘরে বেশি টাকা আনিতে পারে। তখন তাহার স্ত্রী বা সন্তানদের হয়ত শ্রমের বাজারে প্রবেশ করিতে হইবে না, এইরূপও ঘটিতে পারে।

এই দুইটি পরস্পরবিরোধী চিন্তা ও ঘটনার মিলিত ফলে শ্রমের যোগান কিরূপ হইতে পারে তাহা নীচের চিত্রে দেওয়া গেল। নীচের (a) চিত্রে দেখা যাইতেছে শ্রমের যোগান ধনাত্মক কিন্তু অস্থিতিস্থাপক। মজুরি বাড়িলে শ্রমের যোগান বাড়িতেছে।

মিলিত ফল অনির্দিষ্ট

আবার (b) চিত্রে শ্রমের যোগান রেখা উপরে উঠিয়া বামদিকে ঘুরিয়া যাইতেছে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে মজুরি বাড়াইলে শ্রমের যোগান হ্রাস পাইতেছে।



উপরের দীর্ঘ আলোচনাকে এখন আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি। কোনো বিশেষ ধরণের শ্রমের যোগান রেখার গড় নির্ভর করে দুইটি প্রধান বিবেচনার উপর: (i) বিভিন্ন জীবিকার মধ্যে শ্রমের চলনশীলতা (mobility), এবং (ii) মজুরির স্তর কতটা ব্যক্তির কাজের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে এবং কি সংখ্যক ব্যক্তিকে শ্রমের বাজারে আকৃষ্ট করে। প্রথম প্রভাবের দরুণ শ্রমের যোগান রেখা উপরে উঠার সময়ে ডানদিকে সরিতে থাকে, আবার দ্বিতীয় প্রভাবের দরুণ শ্রমের যোগান রেখা বামদিকে ঘুরিয়া যায়। বিভিন্ন জীবিকার মধ্যে চলনশীলতা বেশি থাকিলে উভয়ের মিলিত ফলে শ্রমের যোগান রেখা উপরের (b) চিত্রের ন্যায় হইতে পারে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও মজুরি (Perfect Competition and wages)

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য : কোনো এক বিশেষ ধরণের শ্রমের মজুরি (Equilibrium of Demand and Supply : Wage determination for a particular type of labour)

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের মতে মজুরি হইল শ্রমের দাম এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকিলে অপরাপর সকল দামের ন্যায় ইহা কোনো এক বিশেষ ধরণের শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে উহাদের ভারসাম্যের বিন্দুতে স্থির হয়।

শ্রমিকের চাহিদা

শ্রমিকের জন্য চাহিদার কারণ তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা আছে। একজন শ্রমিক অধিক নিয়োগ করিলে ফার্মের মোট উৎপাদন যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে তাহাই হইল শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা। যত অধিক শ্রমিক নিযুক্ত হইতে থাকিবে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা তত কমিয়া যাইবে। মজুরির হার শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হইবে, ইহা কখনই প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের অধিক হইবে না। বিভিন্ন মজুরিতে বিভিন্ন ফার্মে কি-পরিমাণ শ্রমিকের চাহিদা আছে তাহা যোগ দিয়া বিভিন্ন মজুরিতে সমাজে মোট শ্রমিকের জন্য চাহিদা-তালিকা প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

শ্রমিকের যোগান

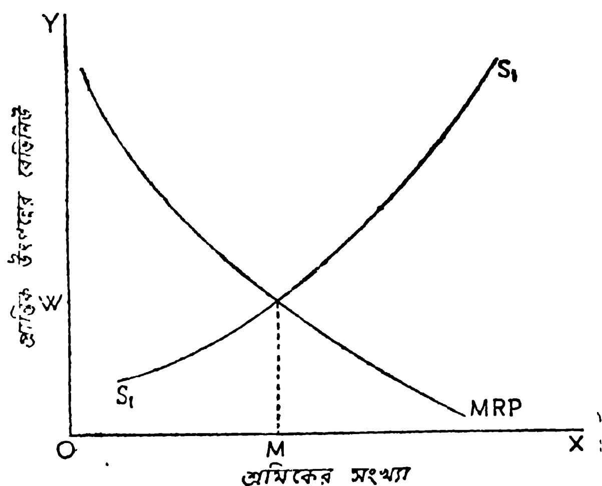
শ্রমিকের যোগান নিভর করে উহার যোগান-দামের উপর। মজুরি বেশি হইলে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি হয়, মজুরি কম হইলে শ্রমিকের যোগান কমিয়া যায়। কোন্ দামে অর্থাৎ কোন্ মজুরিতে কি-পরিমাণ শ্রমিকের যোগান হইবে তাহা নিভর করে শ্রমিকের জীবনধারণের মানের উপর। অনেক শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান নিচু বলিয়া তাহারা কম মজুরিতে শ্রম যোগান দিতে অর্থাৎ কাজ করিতে রাজি হয়; অনেক শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উঁচু বলিয়া তাহারা বেশি মজুরিতে শ্রম যোগান দিতে অর্থাৎ কাজ করিতে রাজি হইবে। ইহা সাধারণভাবে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য।*

* কিন্তু কোনো বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে কি-পরিমাণ শ্রমিকের যোগান হইবে তাহা নির্ভর করে নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর : প্রথমত, শ্রমিকের সমান পরিবর্ত ব্যবহারে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা কিরূপ, অর্থাৎ বিকল্প ব্যবহারে মজুরির হার কিরূপ, দ্বিতীয়ত, বিকল্প চাকুরিতে যাইবার ব্যয় কিরূপ; তৃতীয়ত, অন্য চাকুরিতে যাইবার প্রতিবন্ধক সমূহের শক্তি কিরূপ (যেমন আলস্য, কুসংস্কার, মোট শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বৃদ্ধ ও বয়স্ক শ্রমিকের অনুপাত প্রভৃতি)।

এইরূপে সমাজে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের তালিকা পাশাপাশি রাখিলে এমন একটি মজুরির হার পাওয়া যায়, যে-বিন্দুতে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগান সমান। সেই মজুরিকে মজুরির ভারসাম্য-হার (Equilibrium rate of wages) বলা হয়। সেই মজুরিতে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান। যদি বাজারে মজুরি ইহা হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে অধিক শ্রমিক সেই মজুরিতে কাজ করিতে চাহিবে, কিন্তু বেশি মজুরির দরুণ শ্রমিকের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় তাহারা সকলে কাজ পাইবে না। এই অবস্থায় কেহ কেহ নিজেদের দাম কমাইয়া দিবে, ফলে চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা কাজে নিযুক্ত হইবে। যদি মজুরির ভারসাম্য হার হইতে বাজারে মজুরি কম হয় তাহা হইলে ফার্ম-সমূহ অধিক শ্রমিকের চাহিদা করিবে, শ্রমিক দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিবে এবং মজুরি বাড়িয়া পুনরায় ভারসাম্যের বিন্দুতে স্থির হইবে।

ভারসাম্যের বিন্দু

কোনো একটি বিশেষ শিল্পের দিক হইতে দেখিতে গেলে মজুরির হার নির্ভর করে সমগ্র শিল্পে মজুরের চাহিদা ও যোগান-এর উপর। শিল্পের অন্তর্গত প্রতিটি ফার্মের প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ রেখাগুলিকে পাশাপাশি যোগ করিলে সেই শিল্পের চাহিদা-রেখা বা শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ-রেখা পাওয়া যায়। যেহেতু সকল ফার্মের রেখাগুলিকে যোগ করা হইয়াছে, তাই শিল্পের ক্ষেত্রে এই রেখা নিচের দিকে ডাহিনে নামিতে থাকে।



ফার্মের ক্ষেত্রে শ্রমিকের যোগান-রেখা (S S) ছিল ভূসমান্তরাল সরল-রেখা;

কিন্তু শিল্পের দিক হইতে দেখিতে গেলে উহা উপরে ডানদিকে উঠিতে থাকিবে, পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রের S_1S_1 রেখা হইতে ইহা দেখা যাইতেছে।

OW মজুরির হারে শিল্পে শ্রমিকের যোগান ও চাহিদা সমান। ফার্ম ও শিল্প, উভয়ের ক্ষেত্রেই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ হইল OW সকল ফার্ম মিলিয়া ঐ শিল্পে OM পরিমাণ শ্রমিকের চাহিদা ও নিয়োগ করিতেছে।

শ্রমের বাজারের চাহিদা ও যোগান উভয় দিকেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে মজুরি এইরূপে নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকারই সম্ভাবনা। এমতাবস্থায় দেশে সাধারণ মজুরির হার নির্ভর করে মালিক সংঘ ও শ্রমিক সংঘের মধ্যে দরকষাকষির (collective bargaining) উপর। মজুরির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হয় শ্রমিকের মোটামুটি জীবনযাত্রার মানের দ্বারা। যদি শ্রমিক সংঘ তুলনায় শক্তিশালী হয়, তবে মজুরির হার নিম্নতম সীমায় বা উহার কাছাকাছি থাকে, যদি শ্রমিক-সংঘ শক্তিশালী হয় তবে মজুরি সর্বোচ্চ সীমায় বা উহার কাছাকাছি থাকে।

কিন্তু বাস্তবজীবনে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই

মজুরির হারে পার্থক্য (Difference in wages)

কোনো দেশের মজুরির কাঠামোর (wages-structure) দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহা বিভিন্ন মজুরির স্তর (various levels of wages) লইয়া গঠিত। শ্রম বলিলে আমরা একেবারে সমজাতীয় ইউনিটের অসংখ্য যোগান এইরূপ মনে করিতে পারি না, ইহা সমজাতীয় উপাদান (homogeneous factor) নয়। নানা শ্রেণীতে শ্রমজীবি জনসাধারণ বিভক্ত থাকে এবং মজুরির স্তর এক এক শ্রেণীতে এক একরূপ। বাসের ড্রাইভার, কলেজের অধ্যাপক, রাসায়নিক, ইঞ্জিনীয়ার ও দক্ষ চিকিৎসক প্রত্যেকের শ্রমের রূপ পৃথক, তাহাদের মজুরিও পৃথক। আমরা তাই বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট ধরনের কাজে নিযুক্ত একদল লোক, এবং তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট মজুরির স্তর কি হইবে এইভাবে চিন্তা করিতে পারি। বিভিন্ন ধরনের কার্যে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক গোষ্ঠী বিভিন্ন মজুরির স্তরে কাজ করিতেছে। এই সকল বিভিন্ন স্তরকে একত্র বিচার করিয়া আমরা সামগ্রিকভাবে দেশে একটি মজুরির কাঠামো দেখিতে পারি। আলোচনার সময়ে আমরা তাই ধরিয়া লইব যে সংকীর্ণ একটি নির্দিষ্ট মজুরির স্তরে মজুরির হার কিরূপ তাহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সমাজের বিভিন্ন শ্রমিক শ্রেণী এবং নানা ধরণের কাজকর্ম মোটামুটিভাবে মজুরি বা বেতনের পার্থক্য দ্বারা চিহ্নিত। কোনো দেশে মজুরির হারে এইরূপ তিন ধরণের পার্থক্য থাকে : (1) অপ্রতি-যোগী শ্রমিক মণ্ডলীর মধ্যে মজুরির বিভিন্ন স্তরগতপার্থক্য, (2) এইরূপ কোনো অপ্রতিযোগী শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যে এক শ্রমিকের সহিত অপর শ্রমিকের মজুরির হারে পার্থক্য, এবং (3) দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা বা অঞ্চলের মধ্যে মজুরির হারে পার্থক্য।

অপ্রতিযোগী শ্রমিকমণ্ডলী : মজুরির স্তরগত পার্থক্য বা প্রকৃত পার্থক্য (Non-competing Groups of labour : difference in wage levels or Non-equalizing wage difference)

সমগ্র সমাজের দিকে একযোগে তাকাইলে আমরা বিভিন্ন পেশাতে বিভিন্ন মজুরির স্তরে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিক শ্রেণী দেখিতে পাই। এই একটি বিভাগের শ্রমিকেরা অনেকটা সমজাতীয় এবং ইহাদের মধ্যে এক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে যাওয়া সহজ ঘটিতেছে। কিন্তু একটি বিভাগের গণ্ডী পার হইয়া অন্য একটি বিভাগে যাওয়া বিশেষ দেখা যায় না। সমাজে এইরূপ বহু শ্রেণী ও বিভাগ আছে, এইরূপ সকল শ্রেণীবিভাগ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এইরূপ এক একটি শ্রেণীর লোকেরা অপর শ্রেণীর চাকুরি খুঁজিতে যায় না, এবং ইহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায় না। কোনো ডাক্তার বেশি আয় করিতেছে দেখিয়া কোনো ইন্জিনিয়ার ডাক্তারি করিতে সুরু করে না, কোনো কেরাণী বেশি মাহিনা পাইলেও কোনো ঝাড়ুদার কেরাণীর সহিত চাকুরির প্রতিযোগিতায় নামে না। ইহাদের তাই বলে অপ্রতিযোগী শ্রমিক-মণ্ডলী। এক মণ্ডলী হইতে অন্য মণ্ডলীতে শ্রমিকদের যাওয়া আসা খুবই কম। দীর্ঘদিন ধরিয়া এক ব্যয়বহুল শিক্ষা লাভ করিয়া একটি মণ্ডলীতে প্রবেশ করার পর অন্য কোনো মণ্ডলীতে বেশি মজুরি পাওয়া গেলেও ব্যক্তির পক্ষে সেই নূতন কাজে যাওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ ধরণের দক্ষতা অর্জনে, প্রচুর মূলধন ব্যয় করিয়া সে একটি বিনির্দিষ্ট (specific) উপাদানের ন্যায় হইয়া পড়ে তাহার এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে চলিয়া যাওয়ার ক্ষমতা ও ইচ্ছা, অর্থাৎ চলনশীলতা (mobility) কমিয়া যায়। যে মণ্ডলীতে সে প্রবেশ করিল সেখানে মজুরি হার সেই বিশেষ ধরণের শ্রমিকের যোগান ও চাহিদা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে, সেই মণ্ডলীর মধ্যে মজুরির হার মোটামুটি সমান

হইয়া আসে। কিন্তু এই বিভিন্ন ধরণের জীবিকাতে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণী বা মণ্ডলীর মধ্যে মজুরির স্তর পৃথক এবং উহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। এই তারতম্য মুছিয়া ফেলা যায় না, যোগান-চাহিদার ঘাত প্রতিঘাতে বিভিন্ন মজুরির স্তরের মধ্যে পার্থক্য দূর হয় না। তাই ইহাকে আমরা বলি non-equalising differences in wages. স্বল্পকালে ইহারা প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রতিযোগী, দীর্ঘকালে অল্প কিছু প্রতিযোগিতা থাকিলেও থাকিতে পারে। স্বল্পকালে ডাক্তার ও লরীর ড্রাইভার নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে না, দীর্ঘকালে অবশ্য লরী ড্রাইভারের পুত্র ডাক্তার হইতে পারে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে স্বল্পকালের তুলনায় দীর্ঘকালে শ্রমিকদের মধ্যে সমজাতীয়তা (homogeneity) এবং চলনশীলতা (mobility) বেশি।

কোনো একটি বিশেষ অপ্রতিযোগী শ্রমিকমণ্ডলীর মধ্যেও আবার অপ্রতিযোগী শ্রমিক দল দেখিতে পাওয়া যায় (groups within groups)। সকল ডাক্তার ভাল চাকুরি পায় না, সকল এন্‌জিনিয়ারের সম্মুখে সুযোগ সমান উন্মুক্ত থাকে না। বর্ণ বা জাতিবিচার, রাজনৈতিক মতামত প্রভৃতি নানা কারণে বিশেষ বিশেষ চাকুরির দুয়ার কাহারও কাহারও সম্মুখে রুদ্ধ থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোরা সহজে চাকুরি পায় না, সবদেশেই স্ত্রী-শ্রমিকের সম্মুখে কোনো কোনো চাকুরির পথ। বংশমর্যাদা, পারিবারিক প্রতিষ্ঠা, সঠিক স্থানে যোগাযোগ রাখার ক্ষমতা সকলের নিশ্চয় সমান নয়, ফলে অপ্রতিযোগী মণ্ডলীর মধ্যে অপ্রতিযোগী মণ্ডলী দেখা দেয় (non-competing group with non-competing groups)।

কোনো প্রতিযোগী শ্রমিকমণ্ডলীর মধ্যেও নানা কারণে আর্থিক মজুরির পার্থক্য থাকে। ডাক্তার বা শিক্ষকেরা গ্রামে যাইতে চাহে না, অধিক ভাতা দিয়া এই অনিচ্ছা দূর করিতে হয়। চিনি কলের ডাক্তারদের বৎসরের সকল সময়ে কাজ থাকে না, তাহাদের একটু বেশি মাহিনা দিতে হয়। কোন কাজ ক্লান্তিমূলক, সেখানে একটু বেশি মজুরি দিতে হয়। মজুরির এই ধরনের পার্থক্য, যে-পার্থক্য বিভিন্ন চাকুরির অন্যান্য সুবিধা ও অসুবিধার মধ্যে সমতা আনার উদ্দেশ্যে রক্ষিত হয়, অর্থাৎ আর্থিক ক্ষতি পূরণের মাধ্যমে বিভিন্ন চাকুরির আকর্ষণযোগ্যতা সমান করিয়া তোলা হয় সেইরূপ পার্থক্যকে বলা হয় সমতাসাধনকারী মজুরির পার্থক্য (Equalizing wage differences)। যে সকল চাকুরিতে নোংরা ঘাঁটিতে হয়, স্নায়ুর উপর চাপ বেশি পড়ে, অতিরিক্ত ক্লান্তিকর বা একঘেয়ে ধরণের

যাহাতে সামাজিক সম্মান হ্রাস পায়, অনিয়মিত আয় থাকে বা আয়ু কমাইয়া দেয়—এই সকল কাজের আকর্ষণ কম। এই নিরানন্দ কাটাইয়া দিবার জন্য ইহাদের ক্ষেত্রে মজুরির হার অনেক সময় তুলনামূলকভাবে একটু বেশি থাকে। কোনো উকিল স্বাধীন ব্যবসায় হইতে যাহা আয় করে, তাহা অপেক্ষা তাহার সহপাঠী আইন কলেজের অধ্যাপক কম আয় করে। অধ্যাপনার শান্ত, নিশ্চিন্ত পরিবেশ তাহাকে এক ধরনের মানসিক আয় (psychic income) দেয়, উহা কম আর্থিক আয়ের ক্ষতি পূরণ করিয়া উভয়ের তৃপ্তি মোটামুটি সমান করিয়া তোলে।

কোনো বিশেষ শিল্পে মজুরির হার কিসের উপর নির্ভর করে (What factors determine the rate of wages in a particular industry ?)

কোনো এক বিশেষ ধরণের শ্রমিকের মজুরির সাধারণ স্তর (general level of wages) সকল শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নিভর করে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের উপর। উহা হইল দেশের মধ্যে সেই ধরণের শ্রমিকের সাধারণ মজুরির স্তর। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমিকের মজুরি কি হইবে তাহা আরও তিনটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

প্রথমত, কোনো একটি শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের অর্থাৎ সেই শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের যোগান এবং তাহাদের মজুরি নির্ভর করিবে অন্যান্য শিল্প সেই শ্রমিকদের জন্য কি দাম দিতে প্রস্তুত আছে তাহার উপর। সেই শিল্পে শ্রমিককে পাইতে হইলে কি মজুরি দিতে হইবে তাহা মোটামুটিভাবে এইরূপ প্রতিযোগিতামূলক টানাটানির দ্বারা (Competitive pulls) স্থির হইবে। অন্য শিল্প হইতে মজুর লইয়া আসার সম্ভাবনা বা তাহার শিল্প হইতে অন্য শিল্পে মজুর চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া সে মজুরির হার স্থির করিবে। অর্থাৎ শ্রমিকের পচনশীলতার উপরও এই প্রতিযোগিতামূলক দাম-টানাটানি নির্ভর করিবে। এক কথায় বলিতে গেলে কোনো শিল্পের তরফ হইতে শ্রমিকের জন্য একটি নির্দিষ্ট যোগান-দাম (Supply Price of labour to the industry) আছে।

প্রতিযোগিতামূলক আকর্ষণ

দ্বিতীয়ত, মালিকের চাহিদা-দামও (demand price) সেই শিল্পের

মজুরি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করিবে। মালিকের এই চাহিদা-দাম প্রধানত নির্ভর করে ঐ শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্যের দামের উপরি। স্বল্পকালে দামের উঠানামার সহিত মজুরি পরিবর্তিত হইবে, দ্রব্যের দাম বাড়িলে মজুরি বাড়িবে, দাম কমিলে মজুরি কমিবে। দীর্ঘকালে শ্রমিকেরা বিভিন্ন শিল্পের সুবিধা-অসুবিধা জানিয়া সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় শিল্পে চলিয়া যাইতে চাহিবে, সুতরাং শ্রমিকদের যোগান-দাম (Supply Price of Labour) এক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাবশীল হইয়া উঠিবে।

উৎপন্ন দ্রব্যের দাম

তৃতীয়ত, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের পারস্পরিক দর কষাকষির প্রভাব (Bargaining influence) কোনো কোনো শিল্পে মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শক্তি পরীক্ষায় উর্ধ্বতম ও নিম্নতম সীমার অনির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে মজুরির হার স্থির হয়, শ্রমিক সংঘ মালিকের তালা-বন্ধকে ভয় করে, এবং মালিক সংঘও শ্রমিকের ধর্মঘটকে ভয় করে।

পারস্পরিক দরকষাকষি

দুই পক্ষের যুদ্ধ কৌশল (Tactics) অনেকখানি নির্ভর করে ব্যবসায় অবস্থার উপর। দেশে বেকারির পরিমাণ বেশি থাকিলে শ্রমিক সংঘ একটু দুর্বল হয়; কারণ তাহাদের অর্থ সম্পদ সেই সময় কম, শ্রমিকদের আনুগত্য একটু-শিথিল। কারণ, এই শিল্পে কোনো কোনো ফার্ম বন্ধ হইবার আশঙ্কা থাকায় তাহাদের হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা তখন বেশি।

ব্যবসায় অবস্থার উপর পারস্পরিক শক্তি নির্ভরশীল

যখন মোটামুটি পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা বজায় থাকে, তখন শ্রমের বাজার হইল বিক্রেতাদের পক্ষে (Seller's Market), মালিকেরাও শ্রমিকদের দাবি সহজে মানিয়া লইতে রাজি থাকে। কারণ এই সময়ে ধর্মঘট হইলে উৎপাদন বন্ধ হইবে, ব্যবসা-সমৃদ্ধির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা অসম্ভব হইবে। এই সময়ে শ্রমিক সংঘ অধিকতর শক্তিশালী; সংঘের প্রতি শ্রমিকদের আনুগত্য দৃঢ়।

সাধারণভাবে, পূর্ণ কর্মনিয়োগের সময় ব্যতীত মালিকসংঘই অধিকতর শক্তিশালী থাকে, কারণ তাহারা সংখ্যায় অল্প, পরস্পরের সহিত একমত হওয়া সম্ভবপর এবং আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতার বলে তাহারা দর কষাকষিতে অগ্রসর হইতে পারে। তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা, প্রতিপত্তি, সহায়-সম্পদ এবং প্রচার যন্ত্রের কৌশলী ব্যবহারের সম্মুখে শ্রমিকদের সংগঠন স্বভাবতই দুর্বল, কারণ শ্রম না বিক্রয় হইলে শ্রমিকদের জীবনধারণ চলিবে না।

কোনো বিশেষ কার্মের দিক হইতে শ্রমিকের জন্য চাহিদা ও মজুরি হার: প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার তত্ত্ব (Demand for Labour and Wage rate from the standpoint of a single firm: The Marginal Productivity theory)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (1826 সালে) লংফিল্ড ও থুনেন (Longfield and Thunen) মজুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা তত্ত্বের সূত্রপাত করেন। ঐ শতাব্দীর শেষদিক হইতে (1880 হইতে) নয়া ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে গ্রহণ করেন এবং ইহাকে উন্নত করিয়া তোলেন।

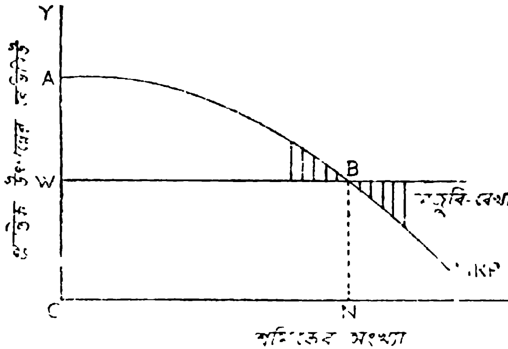
এই তত্ত্ব অনুযায়ী দেশে মজুরির হার, ভারসাম্যের বিন্দুতে, এমন স্তরে নির্ধারিত হয় যাহা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান। অন্যান্য সকল উপাদান স্থির রাখিয়া এক ইউনিট শ্রমিক বাড়াইলে যে-পরিমাণ অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রমিকের প্রান্তিক দ্রব্যোৎপন্ন (Marginal physical product of labour), ইহাকে বাজারে বিক্রয় করিয়া যে-দাম পাওয়া যায় তাহা প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (value of the marginal product) এবং সেই শ্রমিকটি নিয়োগের ফলে ফার্মের মোট রেভিনিউ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ (Marginal revenue product)। দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে শ্রমিকের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে চলতি দামেই বিক্রয় করা চলে, সুতরাং শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ = প্রান্তিক দ্রব্যোৎপন্ন × দ্রব্যের ইউনিট-প্রতি দাম। আর দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া থাকিলে বেশি দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দ্রব্যটির দাম কমাইতে হয়, তাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ = প্রান্তিক দ্রব্যোৎপন্ন × প্রান্তিক রেভিনিউ। বলা হয় যে, ভারসাম্যের বিন্দুতে, শ্রমিকের মজুরি তাহার প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউর সমান।

মজুরি প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউর সমান

শ্রমিকের মজুরি কিরূপে তাহার প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউর সমান হয়, তাহার আলোচনা ফার্ম ও শিল্প উভয় দিক হইতে করা প্রয়োজন। শ্রমিকের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ধরিয়া লইলে বাজারের প্রচলিত মজুরির হারে ফার্মটি মজুর ক্রয় করিতে পারে। কোনো ফার্ম সর্বাধিক মুনাফার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া

এই অবস্থায় সেই পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিবে যখন প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ তাহার মজুরির সমান। নিচের ছবিতে ইহা দেখা যাইতেছে।

OY অক্ষে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ এবং OX অক্ষে শ্রমিকের সংখ্যা পরিমাপ করা হইতেছে। MRP রেখা নিম্নাভিমুখী, কারণ যত অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, উহার প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা ততটা হ্রাস পায় (অসমানুপাতিক প্রতিদানের নিয়মের দরুন)। MRP রেখাই শ্রমিকের জন্য ফার্মের চাহিদা-রেখা। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকার দরুন OW মজুরির হারে ফার্ম যত খুশি শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারে।



এই অবস্থায় ফার্মটি ON পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিবে। কারণ এই বিন্দুতে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ অর্থাৎ BN তাহার মজুরির হার, অর্থাৎ OW-র সমান। ON-এর কম সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিলে ফার্মটি ভারসাম্যে আসে নাই, কারণ আরও অধিক শ্রমিক নিয়োগের ফলে তাহার লাভ হইবে। ON-এর বেশিও সে নিয়োগ করিবে না, কারণ তাহা হইলে তাহার লোকসান থাকিবে। ফার্মটি মোট যে-পরিমাণ মজুরি দেয় তাহা হইল $OW \times ON = OWBN$. ফার্মটির মোট রেভিনিউ হইল OABN. সুতরাং অন্যান্য উপাদানের পাওনা হইল AWB.

সমালোচনা (Criticism)

মার্শাল ও হিকস্ দেখাইয়াছেন যে, এই নয়া ক্লাসিকাল তত্ত্ব কেবলমাত্র চাহিদার দিক লইয়া আলোচনা করে। মজুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কে পূর্ণ কোনো তত্ত্ব মজুরির যোগান সম্পর্কেও নিশ্চয় আলোচনা করিবে। এই তত্ত্ব তাহা করে না। তাহা ছাড়া, আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার।

চাহিদা ও যোগান উভয় শক্তি লইয়া আলোচনা করিলেও এই তত্ত্ব আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ করে, কারণ মজুরের চাহিদা ও যোগান নির্ধারণকারী শক্তিগুলি স্বাধীন এই কথা মানিয়া আমাদের আলোচনা করিতে হয়। সমগ্র সমাজের সকল গ্রন্থিতে শ্রমিকের অস্তিত্ব বর্তমান এবং সমাজে আয়, কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান অনেক কিছুই এই মজুরির হারের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আংশিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণ রীতি এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে।

কেবল চাহিদার দিক এবং আংশিক ভারসাম্য

অধ্যাপক হিক্স তাঁহার 'মজুরি তত্ত্ব' (Theory of wages) গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, শ্রমিকের উৎপন্নের প্রান্তিক রেভিনিউ অনুযায়ী মজুরি স্থির হইলে উহা এক প্রকার অনির্দিষ্টতার পরিধির (range of indeterminacy) মধ্যে থাকে। শ্রমিকের n সংখ্যক ইউনিটটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা নিশ্চয় $n-1$ ইউনিটটির তুলনায় কম হইবে এবং $n+1$ ইউনিটটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হইতে বেশি হইবে। এই দুই পরিধির মধ্যে নিশ্চয় ভারসাম্যের মজুরি অবস্থান করিবে। উপরন্তু, শ্রমিকের সকল ইউনিট সমদক্ষতাসম্পন্ন নয়, কোনো এক বিশেষ দক্ষতাস্তরের শ্রমিকদের মজুরি অধিক দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকদের তুলনায় কম হইবে এবং উহা অপেক্ষা কম দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের তুলনায় বেশি হইবে। তাই এই অনির্দিষ্টতার পরিধি মানিয়া লইতে হইবে।

অনির্দিষ্টতার পরিধি

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও মজুরি (Imperfect Competition and wages)

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার নানা রূপ ও মজুরির হার (Various forms of market imperfection and wages)

দেশে শিল্প-সম্মিলন বা একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন প্রসারের ফলে শ্রমের বাজারে আর বহুসংখ্যক ক্রেতা থাকে না। সমগ্র বাজারের মধ্যে বহু উপ-বাজারের (Sub-market) সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক ছোট ছোট উপবাজারে শ্রমের ক্রেতা হিসাবে একটি ফার্ম বা কয়েকটি মাত্র শ্রমের চাহিদা করে। দেখ যায় যে, শ্রমের যোগানের দিকে বহুসংখ্যক শ্রমিক কাজ পাইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে না; শক্তিশালী শ্রমিক সংঘের মারফত শ্রমের বিক্রয় ও যোগান চলে।

আজকাল শ্রমের বাজারে সাধারণত তিন রকম অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত, একদিকে মালিক সংঘ, অপরদিকে শ্রমিক সংঘ—দুই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘবদ্ধ দরকষাকষি (Collective bargaining) দ্বারা শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমিকের মজুরি স্থির হয়। শ্রমের বাজারে এইরূপ দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া (Bilateral Monopoly) থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, অসংখ্য শ্রমিক নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা শ্রম বিক্রয় করিতেছে, অথচ একটি মাত্র ফার্ম বা একটি মাত্র শিল্পসংঘ শ্রমের ক্রেতা, এইরূপ একচেটিয়া ক্রেতা (Monopsony) থাকা সম্ভব। তৃতীয়ত, শ্রমের ক্রেতা হিসাবে কয়েকটি ফার্ম বা কয়েকটি শিল্পসংঘ আছে এবং শ্রমিক সংঘের সহিত তাহাদের দর কষাকষি হইতেছে, এমনও ঘটিতে পারে।

দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া

প্রথম ক্ষেত্রে, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া অবস্থায় উভয়ের পারস্পরিক শক্তির দ্বারা মজুরির হার স্থির হইবে। একচেটিয়া বিক্রেতার দ্বারা স্থিরীকৃত সর্বোচ্চ মজুরি এবং একচেটিয়া ক্রেতার দ্বারা স্থিরীকৃত সর্বনিম্ন মজুরি—এই দুই বিন্দুর মধ্যে যে কোনো স্থানে মজুরি নির্ধারিত হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে মজুরির নির্ধারণে একপ্রকার অনিশ্চয়তা আসিয়া পড়ে।

একচেটিয়া ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যদি একচেটিয়া ক্রেতা (Monopsony) এবং পরস্পরের প্রতিযোগী বহু বিক্রেতা অর্থাৎ শ্রমিক থাকে, তাহা হইলে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় শ্রমিক যে মজুরি পাইতে পারিত তাহা হইতে কম পাইবে। যদি শ্রমিকদের চলনশীলতা (Mobility) কম থাকে, তবে তাহারা কম দামেই ঐ ফার্মে কাজ করিতে বাধ্য হইবে, কিন্তু যদি তাহারা বিকল্প চাকুরিতে বা পরিবর্ত-শিল্পে চলিয়া যাইতে থাকে তখন একচেটিয়া ক্রেতা বাধ্য হইয়া দাম বাড়াইবে। অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি পাইবে।

তৃতীয় ক্ষেত্রে, যদি কয়েকটি ক্রেতা ও কয়েকটি বিক্রেতা (অর্থাৎ কয়েকটি মালিক সংঘ ও কয়েকটি শ্রমিক সংঘ) থাকে, তাহা হইলে উভয়দিকেই তাহাদের পারস্পরিক বোঝাবুঝি বা ঐক্যবদ্ধভাবে নীতি নির্ধারণের শক্তির দ্বারা মজুরি স্থির হইবে। যদি কয়েকটি ক্রেতা শ্রমিক-ক্রয়ের ব্যাপারে

* অর্থাৎ এক ক্রেতা + এক বিক্রেতা, এক ক্রেতা + অনেক বিক্রেতা, কয়েকটি ক্রেতা + কয়েকটি বিক্রেতা।

পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া সমান নীতি অনুসরণ করে, তবে তাহারা একচেটিয়া ক্রেতার মত সুবিধা পাইবে, মজুরি কম রাখা সম্ভব হইবে। যদি ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে একচেটিয়ার সুবিধা সম্পূর্ণরূপে পাইবে না, মজুরির হার একটু বাড়াইতে হইতে পারে। কয়েকটি শ্রমিক সংঘ যদি একযোগে একই নীতি অনুসরণ করে তাহা হইলে মজুরির হার বাড়িবার সম্ভাবনা, যদি পৃথক নীতি অনুসরণ করে তবে মজুরির হার কমিবার সম্ভাবনা।

কয়েকটি ক্রেতা ও কয়েকটি বিক্রেতা

অন্যান্য সকল কিছু সমান থাকিলে, (অর্থাৎ দ্রব্যের চাহিদা ও দাম, অন্যান্য উপাদানের দাম, উৎপাদন-পদ্ধতি প্রভৃতি) অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে মজুরি উপরোক্তভাবে প্রভাবিত হইবে।

সংঘবদ্ধ দরকষাকষি ও মজুরি: দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া অবস্থা (Collective bargaining and wages : the situation of Bilateral Monopoly)

আজকাল শ্রমের বাজারে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একদিকে মালিক সংঘ অপরদিকে শ্রমিক সংঘ, এই দুই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সংঘবদ্ধ দরকষাকষির মধ্য দিয়া শ্রমিকের মজুরি ও তাহার নিয়োগ স্থির হয়। দ্রব্যের বাজারে যেমন দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া—একক ক্রেতা ও একক বিক্রেতা—এক্ষেত্রেও অবস্থা একই ধরনের। মালিক সংঘের লক্ষ্য সর্বনিম্ন দামে শ্রম ক্রয় করা, আবার শ্রমিক সংঘের লক্ষ্য সর্বোচ্চ মজুরিতে শ্রম বিক্রয় করা। দ্রব্যের বাজারের ন্যায় শ্রমের বাজারের দাম (মজুরি) কোথায় স্থির হইবে সে-বিষয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা আসিয়া পড়ে।

আমরা জানি এইরূপ দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া অবস্থায় মজুরি হার স্থির হয় পারস্পরিক শক্তির দ্বারা। এই ব্যাপারে আমরা তিনটি অবস্থা ধরিতে পারি : (i) তুলনামূলকভাবে মালিক সংঘ অধিকতর শক্তিশালী, তখন মজুরির হার খুবই কম। (ii) তুলনামূলকভাবে মালিক সংঘ অধিকতর শক্তিশালী, তখন মজুরির হার অনেকটা বেশি। যদি বেকারির ভয় কম থাকে তখন মজুরির হার খুব বেশি। আবার যদি বেকারির ভয় বেশি থাকে, তখন মজুরির হার ততটা বেশি নয়। (iii) দ্রব্যের বাজারের মতই, উভয়ে কেবলমাত্র মজুরির হার নয়, কর্মসংস্থানের কথাও চিন্তা করিয়া প্রত্যেকে যতদূর সম্ভব নিজ নিজ সুবিধার স্তরে সন্ধি করে। দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বা সংঘবদ্ধ দরকষাকষির

ক্ষেত্রে এইরূপ অনির্দিষ্টতার পরিধি দেখাইবার জন্য আমরা এক নূতন ধরণের চিত্র ব্যবহার করিতে পারি। মালিক সংঘ এবং শ্রমিক সংঘ উভয়ে নিজ নিজ নিরপেক্ষ রেখার উপরে অবস্থান করিয়া কেমন করিয়া দরকষাকষির পথ (bargaining path) বা চুক্তিরেখা (contract curve) খুঁজিয়া পায় তাহা আমরা নীচের চিত্রে দেখাইতেছি।

মজুরি ও কর্মসংস্থানের মধ্যে মালিক পক্ষের নিরপেক্ষ রেখা মোটা দাগে অঙ্কন করা হইয়াছে, O উৎস বিন্দু হইতে মালিক সংঘের চিত্রটি আঁকা হইয়াছে। আবার উহাদের জন্য শ্রমিক পক্ষের নিরপেক্ষ রেখা ভাঙা দাগে অঙ্কন করা হইয়াছে, O বিন্দু হইতে উহারা অঙ্কিত। উভয়ের নিরপেক্ষ মানচিত্রকে একটি চিত্রে প্রকাশ করার জন্য একটির উপরে আর একটিকে স্থাপন করা হইল। দুইটি উৎস বিন্দু O এবং O′ দুই কোণে অবস্থিত হইল। চিত্রে দেখা যায় একের নিরপেক্ষ রেখা অপরের নিরপেক্ষ রেখাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে।

চুক্তিরেখা কাহাকে বলে

মালিক সংঘের নিরপেক্ষ মানচিত্র (মোটা দাগে প্রকাশিত) হইতে আমরা দেখিতে পাই মজুরির হার ও কর্মসংস্থানের নানা পরিমাণ, উদ্যোক্তা যাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত। সে মজুরি কম দিয়া বেশি লোক খাটাইতে রাজি, বা মজুরি বেশি দিয়া কম লোক খাটাইতে প্রস্তুত। তাহার নিরপেক্ষ রেখার গড়ন হইতে ইহাদের মধ্যে তাহার পছন্দ-অপছন্দের চিত্র ফুটিয়া বাহির হয়। আবার O′ কে উৎসবিন্দু ধরিয়া যে ভাঙা লাইনের ছবিগুলি পাওয়া যায় উহারা শ্রমিক সংঘের নিরপেক্ষ মানচিত্র। তাহারা জানে যে মজুরির

চুক্তিরেখার উপর কোনো এক বিন্দুতে, পারস্পরিক শক্তির ফলে

হার কম থাকিলে কর্মসংস্থান বাড়ে। CC´ হইল উভয়ের চুক্তি বা contract curve। উভয়ের নিরপেক্ষ রেখাগুলির স্পর্শবিন্দুসমূহের মধ্য দিয়া এই চুক্তি রেখা প্রবাহিত। এই রেখার উপর কোনো এক বিন্দুতে দর কষাকষির পরে মজুরি ও কর্মসংস্থান নির্ধারিত হইবে।

এই অনির্দিষ্ট পরিধির ঠিক কোন্ বিন্দুতে মজুরি স্থির হইবে ইহা নির্ভর করে উহাদের তুলনামূলক ক্ষমতার উপর। শ্রমিক সংঘ মালিকের তালা-বন্ধকে (lockout) ভয় করে এবং মালিক সংঘও শ্রমিকের ধর্মঘটকে (strike) ভয় করে। দুইপক্ষের যুদ্ধ কৌশল (Tactics) অনেকটা নির্ভর করে ব্যবসায়ের অবস্থার উপর। দেশে বেকারির পরিমাণ বেশি থাকিলে শ্রমিক সংঘ একটু দুর্বল হয়, কারণ তাহাদের অর্থসম্পদ সেই সময়ে কম, শ্রমিকদের আনুগত্য একটু শিথিল। কারণ এই শিল্পে কোনো কোনো ফার্ম বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকায় তাহাদের চাকুরি হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা তখন বেশি। যদি পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা থাকে তখন বাজার বিক্রেতার পক্ষে (seller's market); মালিকেরাও শ্রমিকদের দাবি সহজে মানিয়া লইতে রাজি থাকে। এই সময়ে ধর্মঘট হইয়া উৎপাদন বন্ধ থাকিলে মালিকেরা ব্যবসায় সমৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ লইতে পারিবে না। এই সময়ে শ্রমিক সংঘ অধিকতর শক্তিশালী; সংঘের প্রতি শ্রমিকদের আনুগত্যও দৃঢ়। সাধারণভাবে দেখা যায় পূর্ণ কর্মনিয়োগের সময় ছাড়া মালিক সংঘই বেশি শক্তিশালী, কারণ মালিকেরা সংখ্যায় অল্প, পরস্পরের সহিত একমত হওয়া সম্ভবপর, এবং আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে তাহারা দর কষাকষিতে অগ্রসর হয়। তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা প্রতিপত্তি, সহায়সম্পদ এবং প্রচার-যন্ত্রের কৌশলী ব্যবহারের সম্মুখে শ্রমিক সংঘ স্বভাবতই দুর্বল থাকে।

উহাদের পারস্পরিক শক্তি নির্ভর করে

ব্যবসায়ের অবস্থার উপর

মজুরির হারের উপর দর কষাকষির ফলাফল কি দাঁড়াইবে তাহা উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতার দরের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের গঠন সম্পর্কে চারি প্রকার সম্ভাবনার কথা আমরা চিন্তা করিতে পারি। যেমন, (1) উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্য উভয় বাজারেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা (perfect competition in both the markets), (2) দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া বিক্রেতা কিন্তু উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা

বাজারের গঠনের উপরও ইহা নির্ভর করে

(monopoly in the product market but competition in the factor market); (3) দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা কিন্তু উপাদানের বাজারে একক ক্রেতা (competition in the product market but monopsony in the factor market), (4) দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া বিক্রেতা এবং উপাদানের বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা (monopoly in the product market and monopsony in the factor market)।

(i) প্রথম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্য উভয় বাজারেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে, কোনো একটি ফার্মের নিকটে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক দ্রব্যোৎপন্নের সমান থাকিবে ; দর কষাকষির পূর্বেও এবং পরেও এইরূপ বাজারে প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ বা MRP রেখা নীচের দিকে নামে, ফলে দর কষাকষি করিয়া মজুরি বাড়াইলে কর্মসংস্থান কমে। সমগ্র শিল্পের দিকে একত্রে তাকাইলে দেখা যায় যে, উচ্চ মজুরির হারে শ্রমিকের মোট চাহিদা কম, ফলে কর্মসংস্থানের স্তর নীচে। এই জন্যই বলা হয় যে উভয় বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকা ভাল কারণ শ্রমিক ও মালিকেরা সংঘবদ্ধ হইলে কর্মসংস্থান হ্রাস পায়। (ii) দ্বিতীয় ক্ষেত্রে; অর্থাৎ দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া কিন্তু উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা, এই অবস্থায় দরকষাকষির দ্বারা মজুরি বাড়াইলে কর্মসংস্থান কমিবে, কারণ MRP রেখা নিম্নাভিমুখী। (iii) তৃতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা কিন্তু উপাদানের বাজারে একক ক্রেতা বা মনোপ্‌সনি থাকিলে দরকষাকষি করিয়া মজুরি বাড়িলে কর্মসংস্থান বাড়িবে। (iv) চতুর্থ ক্ষেত্রে, দ্রব্যের বাজারে মনোপলি এবং উপাদানের বাজারে মনোপ্‌সনি থাকায় দরকষাকষি করিয়া মজুরির হার বাড়িলে কর্মসংস্থান বাড়িবারই সম্ভাবনা।

চারিটি সম্ভাব্য অবস্থা

শ্রমিক সংঘ কি মজুরি বাড়াইতে পারে ? কি-অবস্থায় তাহা সম্ভব ?

(Can Trade Unions raise wages ? Under what circumstances this is possible ?)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে শ্রমিক সংঘের পক্ষে মজুরি বাড়ানো কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ তাহাদের বিশ্লেষণে, মজুরি সর্বদা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান থাকে। দেশে মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যের দাম বাড়িবে এবং বিক্রয় কমিয়া যাইবে। ফলে মোট উৎপাদন কম

হইবে, এবং শ্রমিক ছাঁটাই হইবে। অথবা জোর করিয়া মজুরি বাড়াইয়া দিলে মালিকের মুনাফা আর 'স্বাভাবিক' স্তরে থাকিবে না, সে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে, যে-শিল্পে স্বাভাবিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব মালিক সেই শিল্পে নূতন ফার্ম স্থাপনের চেষ্টা করিবে। যদি দেশের সকল মজুরি একই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সকল দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়িবে, ফলে দেশের দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে—অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় সকল শ্রমিকেরই প্রকৃত মজুরি (Real wages) হ্রাস পাইবে। সুতরাং শ্রমিক সংঘ কিছুতেই অন্তত দীর্ঘকালে, মজুরির হার বাড়াইতে পারে না।

ক্লাসিকাল যুক্তি কেন পারে না

কিন্তু মনে রাখা দরকার, বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই কিন্তু যন্ত্রপাতি ও তদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে প্রায় সবদাই শ্রমিকেব উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। মজুরি সম্বন্ধে পূর্ব হইতে চুক্তিতে আবদ্ধ থাকায় উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও শ্রমিক সেই অনুযায়ী বর্ধিত মজুরি হইতে বঞ্চিত হইতেছে, এরূপ ঘটিতে পারে। সুতরাং যে-সকল শিল্পে মজুরির হার শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হইতে কম, সেই সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরি বাড়িবার সুযোগ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, শ্রমিককল্যাণমূলক কার্যের দরুন শিল্প সম্পর্কে শ্রমিকদের শিক্ষা-দীক্ষা ও মনোভাব উন্নত হয়। তাহাদের বাসগৃহ, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং ইহার দরুন উৎপাদন-ক্ষমতাও বাড়ে। কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িলেও মজুরি বাড়াইবার জন্য শ্রমিক সংঘের সংগ্রামী কার্যের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কারণ মালিকেরা স্বেচ্ছায় মজুরির হার বাড়াইয়াছে, ইহার উদাহরণ বিরল।

আধুনিক যুক্তি কেন পারে

কোনো বিশেষ একদল শ্রমিক কি অবস্থায় মজুরি বাড়াইতে পারে? যেমন কারখানায় একদল বিদ্যুৎবিশারদ শ্রমিক আছে, তাহারা মজুরি বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করিতে প্রস্তুত হইতেছে। অন্যান্য শ্রমিকদল, যেমন মালবহনকারী শ্রমিক, যন্ত্র-চালক শ্রমিক, কেরাণী শ্রমিক, ইহারা মজুরি বৃদ্ধির দাবী করিতেছে না। কি অবস্থায় বৈদ্যুতিক শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো সম্ভব? মনে রাখা দরকার, মালিক কিছুতেই নিজের মুনাফা কাটিয়া শ্রমিকদের মজুরি দিতে রাজি হইবে না। প্রথমে ধর্মঘটী বৈদ্যুতিক শ্রমিকদের মনোবল ভাঙিবার জন্য বাহির হইতে শ্রমিক আমদানির চেষ্টা করিবে, অথবা সংঘের নেতাদের ক্রয় করিয়া শ্রমিক সংহতি ভাঙিবার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য শ্রমিকদলের

মজুরি কমাইয়া বা কাঁচামালের বিক্রেতাকে দাম কম দিয়া ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবি পূরণের চেষ্টা করিবে। তৃতীয়ত, উহা সম্ভব না হইলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের পরিবর্তে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিবে। যদি অবশ্য সেই বিশেষ শ্রমিকদল নির্দিষ্ট উপাদান (Specific Factor) হয়, তাহা হইলে এই পরিবর্তন সম্ভবপর হইবে না। অর্থাৎ ধর্মঘটী শ্রমিকদলের সাফল্য নির্ভর করিবে যন্ত্রের সহিত তাহাদের নিজেদের পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতার উপর (Elasticity of Substitution)।

কি অবস্থায় পারে

দ্বিতীয়ত, তাহাদের পরিবর্তে যে-সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে মালিক কাজ চালাইতে চেষ্টা করিবে সেই সকল উপাদান সহজে পাওয়া যায় কি না অর্থাৎ পরিবর্ত উপাদানসমূহের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ (Elasticity of Supply of Substitutable Factors), তাহা বিচার করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা কিরূপ তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি মজুরি বৃদ্ধির দরুন দাম বাড়িলে মালিকের মোট রেভিনিউ কমিয়া যায় (অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়), তাহা হইলে মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির দরুন দাম বাড়িলে যদি মালিকের মোট রেভিনিউ বাড়িয়া যায় (অর্থাৎ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক থাকে) তাহা হইলে মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং শ্রমিক দল মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে কি না, তাহা নির্ভর করে দ্রব্যটির জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (Elasticity of Demand) উপর।

সর্বশেষে, ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ধর্মঘটী শ্রমিক দলের মোট মজুরির পরিমাণ যদি দ্রব্যোৎপাদনের মোট ব্যয়ের কম অংশ হয় তাহা হইলে মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, কারণ তাহা হইলে দাম কম বাড়িবে, দ্রব্যের চাহিদা ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইবার সম্ভাবনা বেশি।

বাস্তবক্ষেত্রে এই সকল কারণের দ্বারা শ্রমিক সংঘের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের সাফল্য সীমাবদ্ধ থাকে। অতিরিক্ত মজুরি দাবি করিলে পরিবর্ততা ঘটিবেই, শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্র নিয়োগ হইবে বা সেই দ্রব্যের পরিবর্তে কম দামী অন্য দ্রব্য বাজারে বিক্রয় শুরু হইবে। মার্শাল তাই বলিয়াছেন, "কোনো উৎপাদনের জুলুম বা উৎপীড়ন পরিবর্তনীতির প্রভাবে সংযত থাকে" The tyranny of a factor of production is tempered by the principle of substitution).

মজুরির উপরে নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রচলনের প্রভাব (Effects of inventions on wage.)

কোনো বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্গত একটি বিশেষ উৎপাদন সূত্র বা উপাদান সম্মিলন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় উহার মধ্যে শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগের একটি বিশেষ অনুপাত আছে। সকল উৎপাদন-সূত্রে শ্রমিক-প্রতি কিছু পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত থাকে। সাধারণভাবে বলা হয়, শ্রমিক-প্রতি মূলধন নিয়োগের পরিমাণ যত বাড়িবে, উৎপাদন তত বৃদ্ধি পাইবে।

কোনো যন্ত্রের প্রচলন হইলে তাহার দুইটি প্রভাব হইতে পারে। প্রথমত, শ্রমিক-পিছু মূলধন বাড়িয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ (উৎপাদন একই থাকিলে) শ্রমিক ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়া যাইবে অথবা, দ্বিতীয়ত, শ্রমিক-পিছু মূলধন কমিয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ (উৎপাদন একই থাকিলে) মূলধন ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সাধারণত নূতন যন্ত্র হয় শ্রম-সঞ্চয়ী (Labour-Saving) অথবা মূলধন-সঞ্চয়ী (Capital-Saving) হইয়া থাকে।

শ্রম-সঞ্চয়ী আবিষ্কার ও মূলধন-সঞ্চয়ী আবিষ্কার

প্রথম ক্ষেত্রে, সেই শিল্প শ্রমিকদের কাজের সুযোগ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা, সুতরাং মজুরিও কমিতে পারে। কিন্তু ইহা স্বল্পকালীন সত্য; দীর্ঘকালে ওই যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে সমগ্র শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মেরামত কেন্দ্র স্থাপনের ফলে, বিভিন্ন দিকে মোট শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মজুরির হার না কমিয়া বাড়িয়া যাইতে পারে। তবে শ্রম-সঞ্চয়ী নূতন কোনো যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে সাময়িকভাবে, কোনো বিশেষ শিল্পে এবং সেই শিল্পে নিযুক্ত বিশেষ কোনো শ্রমিকদলের চাহিদা ও মজুর কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এই শিল্পে মূলধনের চাহিদা কমিলে দেশের সুদের হার কমিতে পারে; জাতীয় বিভাজ্য আয়ের (National Dividend) অধিক অংশ শ্রমিকেরা পাইতে পারে।

তবে সাধারণত দেখা যায় যে, শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে পারিলে শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সেইজন্য এমন যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রচলন হয় যাহাতে উৎপাদনে কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

16

সুদ

Interest

সুদ কাহাকে বলে (What is Interest ?)

ঋণদানকারী তাহার ঋণ-পুঁজি (loan capital) অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পরে যে অতিরিক্ত অর্থ পায় তাহাকে সুদ বলে। সুদ হইল ঋণ-পুঁজির দাম, যে ঋণ করে সে ঋণদানকারীকে সুদ দিলে (অর্থাৎ দাম দিলে) ঋণ-পুঁজি ব্যবহার করিতে পারে। সুদকে শতকরা ও বাৎসরিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

এই ঋণ-পুঁজির ব্যবহার দুই প্রকারে সম্ভব : উৎপাদন-কার্য এবং ভোগকার্য। ভোগকার্যে ঋণের পরিমাণ সমাজে মোট ঋণের অল্প অংশ, উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত ঋণ-পুঁজিই প্রধান অংশ, এবং সুদের হারের উঠানামার উপর অধিক প্রভাবশীল।

বাজারে যে-সুদের হার প্রচলিত থাকে তাহাকে সাধারণত মোট সুদের হার (Gross rate of Interest) বলে। ইহার মধ্যে নীট সুদ ছাড়াও অনেক কিছু জড়িত থাকে। (ক) ঋণ-পুঁজি ব্যবহারের জন্য যাহা দিতে হয়, তাহাই প্রকৃত সুদ বা নীট সুদ। মোট সুদের মধ্যে ইহা ছাড়া (খ) ঋণের ঝুঁকি থাকার দরুন ঋণদানকারীকে যে-অর্থ দিতে হয়, তাহা সুদের মধ্যে নিহিত থাকে। ঝুঁকি বেশি হইলে সুদের হার অধিক হইবে, ঝুঁকি কম হইলে সুদের হারও কম হইবে। মার্শালের মতে এই ঝুঁকি দুই ধরনের হইতে পারে : ব্যবসায়গত ঝুঁকি ও ব্যক্তিগত ঝুঁকি (Trade risk & Personal risk)। কোন ব্যবসায় ঝুঁকি কম, কোন ব্যবসায় ঝুঁকি বেশি। তাহা ছাড়া, ঋণ-গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত দোষ বা অসৎ ইচ্ছা থাকিলে ঋণদাতা তাহার ঋণ-পুঁজি ফেরৎ না পাইতেও পারে। (গ) তাহা ছাড়া, ওই ঋণ ফেরৎ পাইবার দরুণ বহু হাঙ্গামা পোয়ানো এবং হিসাব রাখা, লোক পাঠানো প্রভৃতি কার্যে ব্যয়ের জন্য ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে কিছু বেশি আদায় করিতে পারে।

মোট সুদ, ও নীট সুদ এবং ঝুঁকি ও শ্রমের দরুন প্রদেয় সুদ

সুদের হারের বিভিন্নতা (Different rates of Interest)

বিভিন্ন কার্যে ঋণ-পুঁজি নিয়োগ করিতে হইলে বিভিন্ন সুদ দিতে হইতে পারে, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও সুদের হারে পার্থক্য দেখা যায়; বিভিন্ন দেশের মধ্যেও সুদের হারে তারতম্য থাকে।

এই সকল পার্থক্যের কারণ হইল, প্রধানত, মূলধনের অপূর্ণ চলনশীলতা (Imperfect Mobility of Capital)। বিভিন্ন ঋণদাতা দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ-পুঁজির লগ্নী করিয়া থাকে। কেহ কেবল কৃষিকার্যে ঋণ দেয়, কেহ বা শিল্পে ঋণ দেয়; কেহ ব্যবসায় ঋণ দেয়, কেহ বা ভোগকার্যে ঋণদান করে; ঋণ-পুঁজি সাধারণত, এক ব্যবহার হইতে আর এক ব্যবহারে নিয়োজিত হয় না। সুতরাং বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে ঋণের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে, সুদের হারেও পার্থক্য বজায় থাকে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূলধনের চলনশীলতা খুবই বেশি। উন্নত দেশসমূহে মূলধনের পরিমাণ বেশি থাকায় এবং মূলধন-নিয়োগের সুযোগ কম থাকায় সুদের হার কম থাকে; অনুন্নত দেশসমূহে মূলধনের পরিমাণ কম থাকায় এবং বিনিয়োগের সুযোগ বেশি থাকায় সুদের হার বেশি থাকে। এক দেশ হইতে অপর দেশে মূলধনের অবাধ যাতায়াত না থাকায় বিভিন্ন দেশে সুদের হারে সমতা সাধন হয় না।

বিভিন্ন কার্যে ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূলধনের অচলনশীলতা।

কোন ঋণ অধিক সময় যাবৎ ব্যবহারের জন্য গৃহীত হয়; কোন ঋণ কম সময় ধরিয়া ব্যবহৃত হইবার জন্য লওয়া হয়। দীর্ঘকালীন ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার বেশি হইতে পারে, কারণ ঋণদাতার অর্থ দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার আয়ত্তের বাহিরে থাকে। সময় যত বেশি হইবে ঋণদাতার পক্ষে সেই ঋণ ততই তারল্যহীন (Illiquid), সুদের হারও তত বেশি হইবে। ঋণ যত কম সময়ের জন্য হইবে সুদের হারও তত কম হইতে পারে। স্বল্পকালীন সুদের হার দীর্ঘকালীন সুদের হারের তুলনায় অনেক বেশি চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল। দীর্ঘকালীন সুদের হার মোটামুটিভাবে স্থির থাকে। স্বল্পকালীন সুদের হার ব্যবসায়ের অবস্থায় পরিবর্তনের দরুন হঠাৎ বেশি উঠানামা করিয়া থাকে।

ঋণের প্রকৃতি

বিভিন্ন সুদের হারের মধ্যে তারতম্যের আর একটি কারণ হইল, সকল ঋণগ্রহীতা সমান ধরনের বন্ধক দিতে পারে না। বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য যেখানে বেশি, সুদ সেখানে কম; বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য যেক্ষেত্রে কম, সুদের হার সেখানে

বেশি। বন্ধকী দ্রব্যের প্রকৃতির উপরেও সুদের হার নির্ভর করে। যদি বন্ধকী দ্রব্য এরূপ হয় যে, ইহাকে সহজেই কম সময়ের মধ্যে অর্থে রূপান্তরিত করা চলে (অর্থাৎ যদি তরল বা Liquid ধরনের হয়) তাহা হইলে সুদের হার কম থাকিবে। কিন্তু যদি কম সময়ের মধ্যে বন্ধকী দ্রব্যকে অর্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব না হয় (অর্থাৎ যদি বন্ধকী দ্রব্যের তারল্য বা liquidity কম থাকে) তাহা হইলে সুদের হার বেশি থাকিবে। এই কারণে জমি বন্ধক দিয়া ঋণ পাইতে হইলে অধিক সুদ দিতে হয়, এবং সোনারূপা ইত্যাদি বন্ধক দিয়া কম সুদে ঋণ পাওয়া যায়।

বন্ধকের পরিমাণ ও প্রকৃতি

সুদ সম্পর্কীয় তত্ত্বসমূহ (Theories of Interest)

সুদের প্রকৃতি এবং ইহা কিভাবে নির্ধারিত হয় সেই সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকল তত্ত্বই সুদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছে; সুদের হার নির্ধারণকারী প্রকৃত বিষয়সমূহের কোন না কোন একটির উপর জোর দিয়াছে। এই সকল তত্ত্ব কোনটি ভুল, কোনটি বা অর্ধ-সত্য। এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিয়া পৃথক পৃথক তত্ত্ব হইতে প্রকৃত বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহার পরে সঠিক তত্ত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হইবে।

১। উৎপাদন-ক্ষমতা তত্ত্ব (Theory of Productivity)

প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের একদল (Physiocrats) মনে করিতেন যে, জমির যেরূপ শস্য-উৎপাদনী শক্তি আছে, মূলধনেরও সেই রকম দ্রব্যোৎপাদনী শক্তি আছে। যেহেতু মূলধনের ফলে অধিক উৎপাদন হয়, অর্থাৎ মূলধন অধিক উৎপাদনক্ষম, সেইজন্য মূলধন ব্যবহারের দরুন সুদ দিতে হয়। উৎপাদন-পদ্ধতিতে যত বেশি মূলধন নিয়োগ করা হইবে, উহার উৎপাদন-ক্ষমতা ততই বৃদ্ধি পাইবে। ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তি মূলধনকে উৎপাদনে নিযুক্ত করে, ফলে দ্রব্যোৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। সুতরাং বর্ধিত উৎপাদনের কিছু অংশ ঋণদাতাকে সুদ হিসাবে দিতে হয়।

উৎপাদন ক্ষমত

আধুনিককালে অনেক ধনবিজ্ঞানী এই তত্ত্বকে আরও অগ্রসর করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ক্রমাগত মূলধন নিয়োগ করিলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়া আসে। ক্রমশ অধিক মূলধন নিয়োগে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিতে থাকে। উদ্যোক্তা ততক্ষণ

পর্যন্ত মূলধন নিয়োগ করিতে থাকে, যতক্ষণ না এই মূলধন নিয়োগের ফলে বর্ধিত উৎপন্নের মূল্য সেই মূলধনের দরুন সুদের সমান হয়। এইভাবে সুদের হার, সমাজে সকল উদ্যোক্তার ক্ষেত্রেই, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার সমান হইবে।

প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা

এই তত্ত্বকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা জানা যায় ঋণগ্রহীতা কেন সুদ দেয়, কিন্তু সুদের হার নির্ধারণ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না; কারণ বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতা পৃথক, অথচ বাজারে সুদের হার (নীট) সকল মূলধন ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সমান। তাহা ছাড়া, ভোগকার্যের জন্য ঋণ করিতেও সুদ দিতে হয়, অথবা রাষ্ট্র যদি যুদ্ধ চালাইবার উদ্দেশ্যে ঋণ করে তাহা হইলেও সুদ দিতে হয়। ইহাদের কোনো ক্ষেত্রেই মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতার দরুন সুদের হার নির্ধারিত হইতেছে না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রধান সমালোচনা হইল, এই তত্ত্বের বৃত্তাকৃতি যুক্তি প্রদর্শন (circular reasoning), এবং তাহা বিজ্ঞানসম্মত নহে। মূলধনের মূল্য জানিতে পারিলে তাহা হইতে উহার উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করা সম্ভব এবং অধিক মূলধনের মূল্য ও তাহার জন্য বর্ধিত উৎপাদন উভয়ের অনুপাতে সুদের হার নির্ণয় করা সম্ভব। যেমন 200 টাকার যন্ত্র নিয়োগ করিয়া 10 টাকা উৎপাদন হইলে আমরা বলিতে পারি যে, 100 টাকার মূলধন হইতে 5 টাকা উৎপন্ন হইতেছে; সুতরাং সুদের হার 5% হওয়া উচিত। কিন্তু মূলধনের দাম 200 টাকা স্থির হইল কি করিয়া? যন্ত্রটির বাৎসরিক উৎপন্নের মূল্যকে চলিত সুদের হারে মূলধনে রূপান্তরণের দ্বারাই মূলধনের দাম নির্ধারণ হয়। অর্থাৎ যদি এই যন্ত্রদ্বারা উৎপন্নের মূল্য হয় 10 টাকা এবং 5% যদি চল্‌তি সুদের হার হয়, তাহা হইলে ওই যন্ত্রের মূলধনীকৃত মূল্য (capitalised value) হইল 200 টাকা। অর্থাৎ, যদি মূলধনের মূল্য নির্ধারণের সময়েই আমরা সুদের হার ধরিয়া লইয়া হিসাব করিয়া ফেলি, তবে উহার দ্বারাই পুনরায় সুদের হার নির্ণয় কিরূপে সম্ভব? সর্বোপরি বলা যায়, এই তত্ত্ব কেবলমাত্র মূলধনের চাহিদার দিকটি আলোচনা করে, কিন্তু মূলধনের যোগানের দিক সম্বন্ধে ইহা কোন আলোচনা করে না।

সমালোচনা

২। সংযম তত্ত্ব (Abstinence Theory) বা অপেক্ষা তত্ত্ব (Theory of waiting)

সুদ সম্পর্কে প্রাচীন তত্ত্বের মধ্যে সিনিয়র-এর (Senior) সংযম তত্ত্ব এক সময়ে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার মতে, মূলধন সৃষ্টি হয় সঞ্চয়

হইতে এবং এই সঞ্চয়ের কারণ হইল ভোগ হইতে বিরত থাকা। লোকে তাহাদের আয়ের সম্পূর্ণ পরিমাণই ভোগে ব্যয় করিতে চায়, ভোগ হইতে বিরত থাকিতে চাহে না। যদি সে সঞ্চয় করিতে চায়, তবে তাহাকে ভোগ হইতে বিরত হইতে হয়। কিন্তু এই ভোগ-সংযম মনের দিক হইতে বেদনাদায়ক, কষ্টকর। তাহার নিকট হইতে ঋণ পাইতে হইলে তাহাকে এই কষ্টের পুরস্কারস্বরূপ কিছু বেশি অর্থ না দিলে চলিবে না। সমাজে যদি সঞ্চয় ও মূলধনের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে সঞ্চয়ীকে সুদ-রূপ পুরস্কার দিতেই হইবে। ভোগ হইতে বিরত থাকার পুরস্কার বা ক্ষতিপূরণই হইল সুদ।*

ভোগ-সংযমের পুরস্কার

এই তত্ত্বকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। ধনী ব্যক্তিরা সঞ্চয় না করিয়া পারেন না এবং তাঁহাদের সঞ্চয় কষ্টদায়ক বা বেদনাদায়ক, ইহা মোটেই বলা চলে না। মার্কস্ পরিহাস করিয়া ইহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অদ্ভুত সাধু, শোকার্ত মুখচ্ছবি সম্পন্ন মধ্যযুগীয় বীর, সংযমী পুঁজির মালিক"।†

এইরূপ সমালোচনার ফলে মার্শাল সংযমের পরিবর্তে 'অপেক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। যে সঞ্চয় করে সে ভবিষ্যতে ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে ভোগ করিয়া অপেক্ষা করে। ভবিষ্যতে অধিক ভোগের আশাতেই বর্তমানের এই অপেক্ষা, সুতরাং সুদ না দিলে এই অপেক্ষা সে করিবে না, ফলে সমাজে প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের যোগান হইবে না। কৃষি, শিল্প বা ব্যবসায়, সকল কার্যেই অপেক্ষা না করিলে ফল লাভ হয় না। মূলধনের সাহায্যেই ফল লাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব। সুতরাং সমাজে উৎপাদন চালাইয়া গেলে যে-প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন হয়, সেই অপেক্ষা করিবার উপযুক্ত মূলধনের যোগান পাইতে হইলে সুদ দেওয়া প্রয়োজন। সুদের হার সেই পরিমাণ হইবে যাহাতে সমাজে সকল উৎপাদনের কার্যে অপেক্ষা করার উপযোগী মূলধনের যোগান হইতে পারে।

অপেক্ষার পুরস্কার

এই তত্ত্ব কেন মূলধনের যোগান হয়, কেবলমাত্র তাহাই বর্ণনা করে, অবশ্য এই বর্ণনাও অসম্পূর্ণ। মূলধনের চাহিদা সম্বন্ধে ইহা কিছু বলে না। মূলধনের যোগানের পিছনে অর্থাৎ সঞ্চয়ের পিছনে কেবলমাত্র অপেক্ষা আছে, আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ তাহাও স্বীকার করেন না।*

---

* খৃষ্টীয় মতে সকল প্রকার সংযমই পুণ্য কার্য আর পুণ্যের পুরস্কার তো দেবতারাই দিয়া থাকেন।

† ....'kinght of woeful countenance, the capitalist abstainer'.

৩। সুদের অস্ট্রীয় তত্ত্ব (Austrian Theory of Interest)

অস্ট্রীয় ধনবিজ্ঞানিগণ বিশেষ করিয়া বম্‌বোয়ার্ক সুদের প্রকৃতি ও সুদের হার নির্ণয় সম্বন্ধে নিজস্ব তত্ত্ব প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সুদের উদ্ভব হয় এইজন্য যে, মানুষ বর্তমান দ্রব্যাদি ভবিষ্যৎ দ্রব্যাদির তুলনায় অধিক পছন্দ করে। যেহেতু মানুষ ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণভাবে দেখিতে পায় না, সেইজন্য ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানের অভাব তাহার নিকট অধিকতর বেদনাদায়ক, এবং বর্তমানের অভাব সম্বন্ধে তাহার অনুভূতি তীব্রতর।

বম্‌বোয়ার

তাই মানুষ বর্তমানের অভাব-মোচনের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। বর্তমান অভাব-মোচন হইতে বিরত থাকিলে ভবিষ্যতের বেশি অভাব মিটাইতে পারিবে, এইরূপ অধিক অর্থ বা সুদ তাহাকে দিলেই সে সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে, নচেৎ নহে।

অস্ট্রীয় মতবাদী ধনবিজ্ঞানী ফিশারের মতে সুদ নির্ভর করে মানুষের সময়-পছন্দের উপর। বর্তমান-দ্রব্য ও ভবিষ্যৎ-দ্রব্যের বিনিময়ের দামই হইল সুদ। একই পরিমাণ অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভবিষ্যৎ-ভোগের তুলনায়, মানুষ সেই ভোগ বর্তমানেই বেশি পছন্দ করে। সুতরাং তাহাদের আয় তাহারা বর্তমানে ব্যয় করিবার জন্য অধীর। যদি আয় হইতে সঞ্চয় করাইতে হয়, তবে বর্তমানে ব্যয় করার এই অধীরতা জয় করিতে হইবে। সুদ দিলেই ব্যয়ের অধীরতা কমিবে, বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া তাহারা সঞ্চয় করিবে। অধীরতার মাত্রা (Degree of impatience) নির্ভর করে ব্যক্তির আয়, বিভিন্ন সময়ে আয় কেমন হইবে, ভবিষ্যতে আয় ভোগ করিবার সম্ভাবনা কিরূপ এবং ব্যক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর। বর্তমানে যাহাদের আয় বেশি, সকল অভাব মিটিতেছে, সে সুদ কম লইবে। বিভিন্ন সময়ের মধ্যে

ফিশার

আয়কে বণ্টন করিলে তিন প্রকার অবস্থা হইতে পারে: (ক) সারা জীবনে আয় সমান থাকিতে পারে, (খ) ভবিষ্যতে আয় বাড়িতে পারে, (গ) ভবিষ্যতে আয় কমিতে পারে। সারা জীবনে আয় সমান থাকিলে বর্তমান ভোগের অধীরতা সে কত সুদের হারে জয় করিবে তাহা নির্ভর করে আয়ের পরিমাণ এবং তাহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর। বয়সের সহিত ভবিষ্যতের আয় কমিবে, এইরূপ হইলে সে কম সুদেই বর্তমানে সঞ্চয় করিবে। সঞ্চয় ও সুদের হারের উপর ব্যক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভূত

* কি কি বিষয়ের উপর সঞ্চয় ও মূলধনের যোগান নির্ভর করে তাহা চতুর্থ পরিচ্ছেদে (মূলধন-গঠন সংক্রান্ত আলোচনার সময়ে) বলা হইয়াছে।

প্রভাব আছে, যেমন কোন বিবেচক ব্যক্তি কম সুদেই বর্তমানে সঞ্চয় করিয়া থাকে।

অষ্ট্রীয় তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে বলা চলে যে ইহারা সুদের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি সঠিক ধারণা দিতে পারিলেও কেন মূলধনের চাহিদা সৃষ্টি হয় তাহা মোটেই আলোচনা না করায় সুদ নির্ধারণের সঠিক তত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না।

৪। সুদ-নির্ধারণের নয়া ক্লাসিকাল তত্ত্ব বা চাহিদা-যোগান-তত্ত্ব (Neo-Classical theory of Interest or the Demand & Supply theory)

নয়া ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিদের মতে সুদ হইল ঋণ পুঁজির দাম এবং অন্যান্য সকল দামের ন্যায় ইহাও ঋণ-পুঁজির চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে উহাদের ভারসাম্যের বিন্দুতে নির্ধারিত হয়। ভারসাম্যাবস্থায় নির্ধারিত সুদের হারে মোট মূলধন-বিনিয়োগের পরিমাণ এবং মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ সমান।

ইহা ঋণ-পুঁজির দাম : যোগান ও চাহিদার ভারসাম্যের বিন্দুতে স্থির হয়

মূলধনের যোগান ও চাহিদা উভয়ই সুদের হারের দ্বারা স্থির হয়। ঋণ পুঁজির যোগান নির্ভর করে সুদের হারের উপর। যদি সমাজে কোন সুদ না থাকে তাহা হইলেও কিছু সঞ্চয় হইবে। এমন কি ঋণাত্মক সুদ (Negative interest) থাকিলেও অল্প কিছু সঞ্চয় হইবে। কিন্তু সমাজের প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ তাহাতে যোগান হইবে না; সুতরাং ব্যক্তিদের নিকট হইতে অধিক সঞ্চয় টানিয়া আনিতে হইলে সুদের হার বাড়াইতে হইবে। এইরূপে, দেখা যায়, সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়িবে।

মূলধনের চাহিদা হয়: (ক) যেহেতু ইহা উৎপাদন বাড়াইতে পারে। যত অধিক মূলধন নিযুক্ত হইবে, উৎপাদন-পদ্ধতি ততই চক্রাকৃতি হইবে, উৎপাদনের শক্তিও তত বাড়িয়া যাইবে। (খ) উৎপাদন করিতে সময় প্রয়োজন হয়, উৎপাদন ও বিক্রয়ের মধ্যবর্তী সময়ে ফার্মটি মূলধনের দ্বারাই উৎপাদন চালাইতে পারে। (গ) কোন দ্রব্যকে এক সময় হইতে অন্য সময়ে

কেন ঋণ-পুঁজির চাহিদা হয়

পাঠাইতে হইলে মূলধনের প্রয়োজন খুবই বেশি। যেমন কোন শস্য যখন উৎপন্ন হইল, তাহার পরবর্তী কয়েকমাস যাবৎ উহাকে মজুত করিয়া বিক্রয় করা প্রয়োজন, (যতদিন না আবার সেই শস্য উৎপন্ন হয়), মূলধনের সাহায্যে ইহা সম্ভব। (ঘ) ভোগ-

কারী ব্যক্তি বা রাষ্ট্র বর্তমানের অভাবকে ভবিষ্যতের অভাবের তুলনায় তীব্রতর ভাবিলে ঋণ করিয়াও বর্তমানের অভাব মিটাইয়া থাকে। এই সকল কারণে ঋণ-পুঁজির চাহিদা হইয়া থাকে। সুদের হার বাড়িলে ঋণ-পুঁজির চাহিদা কমে, সুদের হার কমিলে ঋণ-পুঁজির চাহিদা বাড়ে। ঋণ-পুঁজির চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের বিন্দুতে সুদের হার নির্ধারিত হইবে।

কেইন্‌স্ এই নয়া ক্লাসিকাল তত্ত্বকে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়িবে বা সুদের হার কমিলে সঞ্চয় কমিবে —ইহাদের মধ্যে এরূপ কোন সরাসরি ও সমহার (proportionate) সম্পর্ক নাই। বাজারে কোনরূপ সুদ না থাকিলেও কিছু পরিমাণ সঞ্চয় সমাজে হইতেই থাকিবে। বহুলোক আছেন যাঁহারা বর্তমান সুদের হারের কথা চিন্তা না করিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকেন, বিশেষত, ধনীদের সঞ্চয় কখনই সুদের হারের উপর নির্ভর করে না, উপরন্তু সমাজে মোট সঞ্চয়ের বৃহৎ অংশ যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে আসে, যাহারা সুদের হারের কথা চিন্তা না করিয়া অন্যান্য সঞ্চয় করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, কেইন্‌স্ দেখাইতেছেন যে, সুদের হারের সহিত মোট সঞ্চয়ের সম্পর্ক নয়া ক্লাসিকাল তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুদের হার বাড়িলে সমাজের মোট বিনিয়োগ কমিবে ফলে সঞ্চয়ও কমিবে (নয়া-ক্লাসিকাল তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে)।

কেইন্‌স্ কর্তৃক সমালোচনা

কেইন্‌সীয় তারল্য-পছন্দ তত্ত্ব (Keynesian theory of Liquidity-Preference)

কেইন্‌সের অভিমতে, সুদ হইল সম্পূর্ণভাবে অর্থ সংক্রান্ত ঘটনা—অর্থ ব্যবহারের দরুন উহার মালিককে যাহা দিতে হয় তাহাকেই সুদ বলা হয়। অর্থ হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি (general purchasing power), ইহাকে যখন খুশি যে কোন সম্পদে বা সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা চলে ; অর্থের এই প্রকৃতির নাম ইহার তারল্য (Liquidity)। সকল সম্পত্তির মধ্যে অর্থই সবাপেক্ষা তরল।

তারল্য কাহাকে বলে

যে ঋণ-দাতা ঋণ দেয় সে সাময়িকভাবে সাধারণ ক্রয়শক্তির উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারল্যের উপর অধিকার পরিত্যাগ করে। লোকে এই তরল নগদ অর্থ হস্তান্তর করিতে চাহে না বা অনিচ্ছুক

থাকে, তাই ইহার জন্য কিছু দাম চায়। সুদ হইল, 'একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারল্যের উপর অধিকার ছাড়িয়া দিবার জন্য পুরস্কার'।

সুদ ও তারল্য

সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে, লোকের মনে নগদ অর্থ তরল অবস্থায় ধরিয়া রাখিবার বাসনা কম হইবে, তাঁহারা অধিক পরিমাণে ঋণ দান করিতে চাহিবে। অপর পক্ষে যদি সুদের হার কম থাকে তাহা হইলে লোকে অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে; অর্থ খাটাইয়া আয়ের সম্ভাবনা কম থাকায় তাহারা কম ঋণ দান করিতে চাহিবে। সুতরাং, বিভিন্ন সুদের হারে সমাজের সকল ব্যক্তি একত্রে মিলিয়া মোট যে বিভিন্ন পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চাহে, তাহার একটি তালিকা আমরা প্রস্তুত করিতে পারি। নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চাওয়াকে নগদ পছন্দ (Liquidity-preference) বলা হয় এবং তালিকাকে নগদ-পছন্দের তালিকা বা অর্থের চাহিদা তালিকা বলা চলে। নগদ-পছন্দের দরুন যে-পরিমাণ অর্থ লোকে হাতে রাখিতে চায় তাহাকে কেইন্‌স অর্থের চাহিদা বলিয়াছেন।

তিনটি অভিপ্রায়ে লোকের এই তারল্য-পছন্দ বা নগদ-অর্থের জন্য চাহিদা হয়; লেনদেনের অভিপ্রায় (Transactions motive), সতর্কতামূলক অভিপ্রায় (Precautionary motive) এবং ফাট্‌কাদারী অভিপ্রায় (Speculative motive)। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীরা নগদ অর্থ ধরিয়া রাখে আয়-প্রাপ্তির বিভিন্ন সময়ের মধ্যে লেনদেনের কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে। যেমন, জানুয়ারীর 1লা মাহিনা পাইলে ফেব্রুয়ারির 1লা আবার মাহিনা না পাওয়া পর্যন্ত সমগ্র জানুয়ারী মাসের লেনদেনের জন্য কিছু নগদ অর্থ হাতে রাখিতে হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আকস্মিক লেনদেনের বা অচিন্ত্যপূর্ব (unforeseen) ব্যয়সমূহ নির্বাহের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে হয়। তৃতীয় ক্ষেত্রে, অধিক মুনাফার অর্থ খাটাইবার সম্ভাবনা ও সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীরা প্রচুর নগদ অর্থ হাতে রাখে। প্রথম দুইটি অভিপ্রায়ে রক্ষিত অর্থ সুদের হারের উপর খুব বেশি নির্ভর করে না, কিন্তু ফাট্‌কা ব্যবসায়ের নিয়োগের অভিপ্রায়ে রক্ষিত নগদ অর্থ সুদের হারের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল; সুদের হার বাড়িলে এই অভিপ্রায়ে অর্থ হাতে রাখার ইচ্ছা কমিয়া যায়। সুদের হার কমিলে ভবিষ্যতে বেশি সুদে ফাট্‌কাদারীতে নিয়োগের আশায় বর্তমানে বেশি অর্থ হাতে ধরিয়া রাখে।

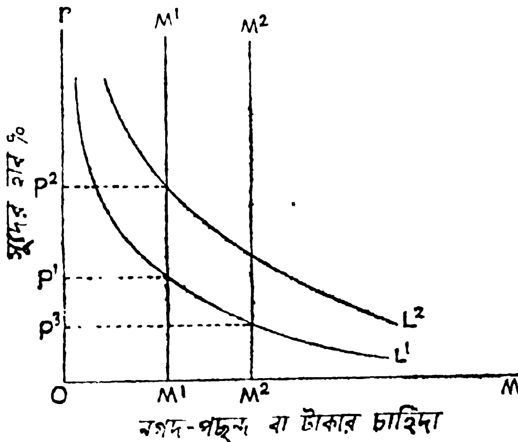
তারল্য-পছন্দের বিভিন্ন অভিপ্রায়সমূহ অর্থের চাহিদার কারণ

সমাজে মোট অর্থের যোগান নিভর ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপর। অর্থের চাহিদা-তালিকাকে অর্থের যোগানের সহিত একত্র বিচার করিলে সুদের হার নির্ণয় করা যায়। সমাজে মোট অর্থের যোগান সমবেতভাবে সমাজের সকল লোকের হাতে রহিয়াছে। সুদের হার যদি এইরূপ হয় যে. অর্থের যোগানের তুলনায় অর্থের চাহিদা কম (অর্থাৎ, সকলে কম পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চায়), তাহা হইলে ঋণদান-যোগ্য অর্থের যোগান বেশি হইবে, ফলে সুদের হার কমিয়া আসিবে। অপরপক্ষে লোকের তারল্যপছন্দ বাড়িয়া গেলে, অর্থাৎ তাঁহারা যদি অর্থের যোগানের তুলনায় সকলে মিলিয়া অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে সমাজে ঋণদান-যোগ্য অর্থের যোগান কম পড়িবে, ফলে সুদের হার বাড়িয়া যাইবে। ভারসাম্যের অবস্থায় সুদের হার এইরূপ হইবে যাহাতে অর্থের জন্য চাহিদা এবং অর্থের যোগান সমান হয়।

অর্থের যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য

সুদের হারের সহিত নগদ-পছন্দের কার্য-কারণগত সম্পর্ক (Functional relationship) চিত্রের সাহায্যে দেখানো সম্ভব।

OR রেখা সুদের হারের ও OM রেখা নগদ-পছন্দের পরিমাণ বুঝাইতেছে। সুদের হার বাড়িলে নগদ পছন্দ কমে এবং সুদের হার কমিলে নগদ-পছন্দ বাড়ে। L_1 হইলে নগদ-পছন্দ বা তারল্য-পছন্দ রেখা। M^1M^1 রেখা অর্থের



পরিমাণ নির্দেশক। অর্থের যোগান আর্থিক কর্তৃপক্ষ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির কার্যের দ্বারা স্থির হয়, সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। তাই উহা সুদের হার

নির্দেশক রেখার (OR রেখার) সমান্তরাল। OP^1 সুদের হারে অর্থের চাহিদা ও যোগান সমান, ইহাই ভারসাম্যাবস্থার সুদের হার। যদি নগদ-পছন্দ বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ নূতন রেখা L^2 সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সুদের হার বাড়িয়া OP^2 হইবে , অপরপক্ষে যদি L^1 রেখা বা নগদ পছন্দ স্থির থাকে, কিন্তু অর্থের যোগান বাড়িয়া যায়, নূতন M^2M^2 রেখাটি সৃষ্টি করে, তাহা হইতে দেশের হার কমিয়া যাইবে, OP^3 সুদ হইবে।

সমালোচনা

কেইন্‌সীয় তত্ত্বের সমালোচনায় বলা হয় যে, ইহা সুদ ব্যাখ্যা করিবার ব্যাপারে কেবলমাত্র অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলিব উপর জোর দেয় কিন্তু সমাজের প্রকৃত অর্থ নৈতিক শক্তিসমূহ, .যেমন, মূলধনের যোগান ও চাহিদা সামগ্রিকভাবে বিচার করে না। অর্থ বলিতে তিনি কি বুঝিতেছেন, তাহাও ততটা স্পষ্ট নহে।

বিনিয়োগেব উদ্দেশ্যে মূলধনের চাহিদা হয় এবং সেই চাহিদা সুদকে প্রভাবিত করে, কেইন্‌সীয় সুদের তত্ত্বে এই সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা উদ্যোক্তাদের মূলধনের জন্য চাহিদাকে কিছুটা অন্তত প্রভাবিত করে তাহাও স্বীকার করা হয় নাই।

সুদের হারে পরিবর্তনের কারণ (Causes of changes in the Rate of Interest)

চাহিদা ও যোগান পবিবর্তন নয়া ক্লাসিকাল তত্ত্ব

নয়া ক্লাসিকাল তত্ত্ব অনুযায়ী, সুদের হার পরিবর্তিত হয় যদি ঋণ-পুঁজির চাহিদা বা যোগানে পরিবর্তন আসে। মূলধনর প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতাতে বা লোকেব সঞ্চয়ের ক্ষমতাতে পরিবর্তন হইলেই সুদের হার পরিবর্তিত হয়। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে উৎপাদনের নিযুক্ত মূলধনেব পরিমাণের উপর, উৎপাদন-কৌশল, নূতন যন্ত্রের পরিবর্তন এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উপর।

নূতন যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অধিক মূলধন প্রয়োজন হয়। ইহাতে মূলধনের চাহিদা ও সুদের হার বাড়িয়া যায়। অবশ্য যদি আবিষ্কারটি এমন ধরনের হয় যে, তাহা উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধন নিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে অর্থাৎ তাহা মূলধনী-সঞ্চয়ী (Capital-Saving), তাহা হইলে বাজারে মূলধনের যোগান বাড়ে বলিয়া সুদের হার কমে।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সুদের হার ক্রমে কমিয়া আসে, কারণ সমাজে মোট সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ে। অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে স্বল্পকালে হঠাৎ মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সুদের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে দেশে মূলধনের যোগান এত বাড়ে যে, সাধারণত সুদের হার কমিয়া যায়।

মূলধনের যোগানে পরিবর্তন হয় যদি সঞ্চয়ের অভ্যাস, দূরদৃষ্টি এবং যে-সমস্ত শক্তির উপর মূলধনের বৃদ্ধি নির্ভর করে তাহাতে পরিবর্তন দেখা দেয়। মূলধনের যোগানে পরিবর্তন আসিলে সুদের হারেও পরিবর্তন আসে।

কেইন্‌সের মতে, সুদের হার নিভর করে নগদ পছন্দ এবং অর্থের যোগানের উপর; ইহার কোন একটিতে পরিবর্তন আসিলে সুদের হারও পরিবর্তিত হইয়া থাকে, নয়া-ক্লাসিকালদের ন্যায় কেইন্‌সও বিশ্বাস করেন যে, ভবিষ্যতে মূলধনের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং মূলধন-বিনিয়োগের সুযোগ কমিয়া আসিবার ফলে (vanishing investment opportunities) সুদের হার কমিয়া যাইবে। ইহাকে মূলধনের অতি-দীর্ঘকালীন জড়ত্ব (Secular stagnation of capital) বলা চলে।

কেইনসীয় তত্ত্ব

অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে কখনই এরূপ অবস্থা আসিতে পারে না যে, সুদের হার শূন্যে পৌঁছিবে, বিনা সুদে ঋণ পাওয়া যাইবে। কারণ সমাজে ঋণ-পুঁজির প্রয়োজন সর্বদাই থাকিবে, বরং নূতন আবিষ্কার, যন্ত্র-প্রচলন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিত্য অভিনব দ্রব্য উৎপাদনের দরুণ ঋণপুঁজির চাহিদা থাকিবেই। কেইন্‌সের মতে, একমাত্র আদিম অর্থনৈতিক কাঠামোতেই সুদ না-থাকার কথা, কারণ সেই সমাজে নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন হয় না, লোকের সমগ্র আয় ভোগকার্যেই ব্যয়িত হয়। বর্তমান সমাজে সেইরূপ অবস্থা আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সুদ শূন্যে বিলীন হইবার সম্ভাবনা বাস্তবে দেখা যায় না।

সুদ কখনও শূন্যে পৌঁছিবে কি না

সুদের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা (Necessity and Justification of Interest)

ধনবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হইবার বহু পূর্বে সুদের সাহায্যে সমাজে লেনদেন হইয়াছে এবং প্রাচীন দার্শনিকগণ ইহার তীব্র বিরোধিতা করিতেন।

গ্রীক্-দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে ইহা ছিল 'অস্বাভাবিক' (unnatural) এবং প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে। বন্ধ্যা নারীর সন্তান যেরূপ স্বাভাবিক নহে, সেইরূপ কিছু ধাতু-মুদ্রা ঋণ দিয়া উহার অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা তাঁহার নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, ইহাকে তিনি ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে করিতেন।*

সুদের যৌক্তিকতা

মধ্যযুগের রোমান ক্যাথলিক বা মুসলমান ধর্মমতও ইহার বিরুদ্ধে প্রচার করিত। তাহার কারণ ছিল যে, সেই সময় প্রায় সকল ঋণই ভোগকার্যের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইত এবং মহাজনগণ দেনাদারের উপর ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ অত্যাচার করিত। কিন্তু যখন হইতে ঋণ-পুঁজি উৎপাদনের কার্যে, এবং মুনাফা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা শুরু হইল তখন হইতে ইহার প্রতি বিরোধিতা ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। সপ্তদশ শতকে সাল্‌মাসিয়াস্ এবং লক্ বলিলেন যে, ঋণের উপর সুদ গ্রহণ করা চলে যদি ঋণগ্রহীতা ওই ঋণ হইতে অন্তত সুদের সমান আয় করিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিজিয়োক্রাটগণ মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতার কথা বলেন (যে-অর্থে জমি উৎপাদন-ক্ষম), এবং সুদকে অর্থ নৈতিক যুক্তির দ্বারা সমর্থনের চেষ্টা করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্কস্ প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক ধনবিজ্ঞানিগণ দেখাইয়া দেন কিভাবে সমাজ পুঁজির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, পুঁজিভিত্তিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে, সকল উপাদানের তুলনায় পুঁজি ও পুঁজির মালিক উৎপাদন-ক্ষেত্রের ও সমাজের নিয়ন্ত্রণকারীর স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার মতে, যে ব্যক্তি পুঁজি ঋণ হিসাবে লইয়া থাকে সে উহার ব্যবহারের জন্য দাম দিতেছে সুদের এইরূপ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যাখ্যা নিতান্তই নাবালকসুলভ এবং সুদ উদ্ভবের আসল কারণ ও ইহার প্রকৃত রূপ ঢাকা দেওয়ার অপচেষ্টা। ঋণগ্রহীতা ঐ ঋণ লইয়া অতিরিক্ত অর্থসৃষ্টি করে না, সে উহার দ্বারা শ্রমশক্তি ক্রয় করিয়া শ্রমিকের উদ্‌বৃত্ত মূল্য (পুঁজির উপর মালিকানা থাকার দরুণ) আত্মসাৎ করে, এবং উদ্‌বৃত্ত মূল্যের কিছু অংশই ঋণ-পুঁজির মালিককে লুঠের ভাগ হিসাবে সুদরূপে দেয়।

* মনুসংহিতার কুসীদীজীবীদের বিশেষ নিন্দা করা হইয়াছে। বাদ্ধুষিক অর্থাৎ বৃদ্ধির দ্বারা (সুদ) যাহারা জীবনযাপন করে তাহারা নিন্দনীয়। ইহা অবশ্য ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। 'কুসীদজীবি' শব্দের অর্থ, যে কুৎসিতভাবে জীবন যাপন করে।